ভারতের শেষ ভূখণ্ড

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আলোকচিত্র রঘু রাই

ভারতের শেষ ভূখণ্ড

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আলোকচিত্র রঘু রাই

বিশ্বপাঠ্য কেন্দ্র
স্থাপিত
১৩০৮
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ মুদ্রণসংখ্যা ৩৩০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট
লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি.
স্কীম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

১৫'০০

শ্রীমতী ছায়া গোডবোলে
প্রীতিভাজনেষু

১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে আমরা কয়েকজন সরকারী আমন্ত্রণে আন্দামান গিয়েছিলাম নিছক প্রমোদ ভ্রমণে নয়, আন্দামানের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে। আন্দামানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই। আন্দামানের সমস্যারও শেষ নেই। এক কালের এই বন্দিনিবাস এখন বহু মানুষের আশ্রয়স্থল। দেশ বিভাগের পর শরণার্থীরা সেখানে নয়া বসতি স্থাপন করে প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, নীতির সঙ্গে, দুর্নীতির সঙ্গে সংগ্রাম করে একটি নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এই দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন একটি ইতিহাস আছে, নতুন আর একটি ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে। উপেক্ষা আছে, উদাসীনতা আছে, ভ্রষ্টাচারে মঙ্গল কর্মসূচী সময় সময় বিপর্যস্ত। আশার স্রোতের পাশাপাশি নিরাশার স্রোতও বইছে। জীবন তবু থেমে থাকতে শেখেনি। একদিকে দুর্জয় প্রকৃতি অন্য দিকে অপরাজেয় মানুষ যেখানে নতুন অর্থনীতির জাল বুনে চলেছেন সেখানে ভ্রমণ শুধু আনন্দের নয়, ভিন্নতর এক অভিজ্ঞতা।

লেখক যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁরা হলেন, আন্দামান ও নিকোবর প্রশাসনের অসংখ্য কর্মী, চিফ কমিশনার শ্রীএস. এম কৃষ্ণার্তি, ভারত সরকারের পি. আই. বি-র কর্তৃপক্ষ, শ্রীপদ্মোত্তি দে, শ্রীরথু রাই, শ্রীবিপুল গুহ, শ্রীবাদল বসু, সেল্যুলার জেলের জেলার শ্রীচয়ে, সহযাত্রীগণ, দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত মানুষ এবং আন্দামান নিকোবরের মহামিতুলা বিশাল প্রকৃতি।

চিত্রসূচী

১. ছেলে কোলে ওঙ্গি মাতা। অপত্য স্নেহ সর্বত্র সমান।
২. সেল্যুলার জেল, চত্বরে সেই কুখ্যাত দুটি ঘর।
৩. কার নিকোবরের পরিচ্ছন্ন একটি গ্রাম, সুন্দর বাড়ি, সুন্দরী মহিলা।
৪. গর্জনগাছ, কত মহান, কত বিশাল! হাজার হাজার বছরের প্রাচীন জঙ্গল মানুষের হাতে পড়ে প্রায় তছনছ।
৫. সরকারী বাড়িতে থাকতে ভাল লাগে না, আমরা আমাদের মত থাকতে ভালবাসি—ওঙ্গিদের স্বগতোক্তি।
৬. ঘন জঙ্গলের একপাশে সরকারী আবাসনে ওঙ্গি দম্পতি।
৭. ওঙ্গি মহিলাদের অঙ্গবাস ঘাসের ঝুমকো। সরকার সুন্দর বাড়ি করে দিয়েছেন। অবলুপ্তির হাত থেকে এদের বাঁচাতে হবে।
৮. বন কেটে বসতি। আদিম জাতির সেবায় সরকারী প্রকল্পের নানা ব্যবস্থা।
৯. কৃশকায় কুকুর, দীর্ঘকায় মানব?
১০. জাপানী বাঙ্কার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি।
১১. ওঙ্গিরা মৎস্য শিকারে ভারি ওস্তাদ।
১২. সমুদ্রবেলায় ওঙ্গি দুহিতা, ঘাসের পোশাকের ওপর সভ্যতার স্কার্ট।
১৩. ওঙ্গি মাতা কেন এত অবাক! সভ্যতা কি বড় জ্বালাচ্ছে!
১৪. অলস দ্বিপ্রহর, ধূধূপ্রান্তর, বিশাল বনভূমি সব মিলেমিশে আকর্ষণীয় আন্দামান
১৫. সরকারের করে দেওয়া আধুনিক ওঙ্গি-বাড়ির বারান্দায় মা ও ছেলে।
১৬. দুই ওঙ্গি যুবক, হাতে আধুনিক সিগারেট, চোখেমুখে সন্দেহ আমাদের নিয়ে এরা কি করতে চায়!

প্রচ্ছদ ॥ প্রথম

সূর্য এখানেও ওঠে ওখানেও উঠেছে। জানালায় প্রভাত কিরণ। এ যেন আদিম সূর্য! আদিম প্রভাতের প্রেক্ষাপটে আদিম জননী! পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে সময় স্থির। যাত্রা শুরু হয়েছে শেষ হয় নি। ওঙ্গিদের অন্তঃপুর। কুকুরটিও অবাক হয়ে প্রভাত দেখছে। মাঝখানে রহস্যময় অগ্নিকুণ্ড।

প্রচ্ছদ ॥ দ্বিতীয়

নিকোবর? প্রাচুর্যের দ্বীপপুঞ্জ। ফসল ফলেছে মানুষের শ্রমে। সেই উৎপাদন বহন করাও কত আনন্দের।

আন্দামানের বাঙালী মহল্লায় অনেকটা প্রবাদের মতই চার লাইনের একটি কবিতা প্রচলিত আছে : হোয়াট হ্যাভ ইউ সিন অ্যাট আণ্ডামান ! অল মাইটি গর্জন। অলমাইটি সি, অ্যাণ্ড অলমাইটি সি সি। সি সি হলেন এই দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসক, চিফ কমিশনার। আমার নাতিদীর্ঘ ভ্রমণে এই সবই দেখেছি, তার আগে যা দেখেছি, এক কথায়, রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। সুসভ্য প্যাণ্ট জামাপরা গরু, সরকারী রাখালের তত্ত্বাবধানে বিমানে চলেছে আন্দামান প্রশাসনের অতিথি হতে। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা। কলকাতার প্রায় বিকল টেলিফোনে (যাকে বকযন্ত্র বললে মনটা বেশ হালকা হয়) টেলিফোনে পি আই বি এবং দেশ পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের বাতচিত। দিন সময় নির্দিষ্ট। চলো ইয়ার আন্দামান। সরকারের প্রশাসন যন্ত্র ভুলেই গেলেন, আন্দামানের লবণাক্ত প্রস্তর যুগে সভ্য মানুষকে ঢুকতে হলে দশদিন আগে যাবতীয় টিকাটিপ্পনি অঙ্গে ধারণ করে একটি স্বাস্থ্য তকমা সংগ্রহ করতে হয়। ভাগ্য ভাল কয়েকদিন আগেই গ্রীষ্মের কলকাতার বিবিধ মহামারীর সঙ্গে সুখে-দুঃখে আর এক বছর ঘর করার সৎ অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছায় নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলাম বলেই সামান্য একটু নতজানু হতেই হেলথ সার্টিফিকেটটি যাবার একদিন আগেই বুকপকেটে লেপটে গেল।

ইতিমধ্যে দিল্লি-কলকাতায় একটি সূক্ষ্ম ল্যাং মারামারি হয়ে গেছে। কলকাতা থেকে যে সরকারী প্রতিনিধির আমাদের তাড়না করে নিয়ে যাবার প্রায় পাকাপাকি ব্যবস্থা ছিল তিনি ওপরের প্যাঁচে বোলড আউট। আমরা আদার ব্যাপারি সরকারী জাহাজের খবর রাখতে চাই না। তবে কিনা, সরকারী দপ্তরে হাওয়া কোন্‌দিকে যে বয় ! সুবাতাসে পাল তুলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের আরো পাঁচজন সাংবাদিককে নিয়ে যে ভদ্রলোক যাবার আগের দিন কলকাতার সরকারী অতিথিশালায় এসে উঠলেন, কলকাতার রকের ভাষায় তাঁকে যা বলতে ইচ্ছে করে ভদ্রতার খাতিরে না বলাই ভাল। রাত নটার সময় ওই সরকারী প্রাসাদে তাঁকে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেলুম। মার্লোন ব্র্যাণ্ডোর মত চেহারা, প্রিনস অফ ওয়েলসের মত হাবভাব। উপায় থাকলে সহবত শেখার একটা বই ওই বিশাল মানুষটিকে উপহার দেবার ইচ্ছে ছিল। পাদটীকা হিসেবে লিখে দিতাম—মহোদয় এই বিশাল পৃথিবীতে নিজেকে অতটা বিশাল ভাববেন না। দুনিয়ার সমস্ত মানুষই আপনার দপ্তরের অধস্তন কর্মচারী নয় গো

মানিক। সুকুমার রায়ের নাম শুনেছেন! তিনি তখন ছোটো। কি একটা সভায় এক মাল খুব কেতা দেখাচ্ছিল। কতই যেন ভারি আদমি। সভামণ্ডপের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন কিশোর সুকুমার। লোকটি ভারিক্কি চালে যেই আর একবার প্রবেশ করছেন, সুকুমার রায় তাঁর মুখের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে একটি মাত্র শব্দ করলেন—ফুঃ। ফুস করে ভদ্রলোকের অহং-এর হাওয়া নিমেষে বেরিয়ে গেল। তিনি একটু ধাতস্থ হলেন। ফুঃ করার সুযোগ সে রাতে পাইনি। প্রথম রাত দর্শনের রাত। রাতটা অতিথিশালায় কাটাতে এসেছি কারণ আন্দামানে যাবার বিমান সপ্তাহে দুদিন ছাড়ে, বিদঘুটে সময়ে, কাকডাকা ভোরে। সূর্য এবং বিমান দুটোই একসঙ্গে আকাশে ওঠে। সময়টা খারাপ নয়। ব্রাহ্ম মুহূর্ত। ট্রোপোসফিয়ারে উঠে গদি আঁটা চেয়ারে বসে লজেনস চুষতে চুষতে বিমান-বালিকাদের চিবোনো ইংরেজী শুনতে শুনতে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সন্তান, বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশির মাইল পাঁচেক ওপরে সূর্য বন্দনাটি সেরে নিতে পারে। জবাকুসুম সঙ্কাশং বললে সত্যের অপলাপ হবে বরং হিরণ্ময় কি ফ্লোরেসেণ্ট বলাই ভাল। অত সকালে, নিজের গাড়ি না থাকলে বিমানের ল্যাজ ধরা শক্ত। বুদ্ধিমানের কাজ খাস কলকাতায় একদিন আগেই সরকারের হাতে নিজেকে জিম্মা করে দেওয়া। এক সময় আন্দামান যাবার সেই নিয়মই তো ছিল। একটা খুনটুন করে টাইট হয়ে বসে থাকো। যাবজ্জীবন হয়ে যাক। তারপর সরকারের পয়সায় চলে যাও কালাপানি পেরিয়ে সেলুলার জেলে। নিজের পয়সা খরচ করে কে কবে আন্দামান গেছে!

রিসেপসানের খুব গম্ভীর মুখ অবাঙালী রিসেপসানিস্ট দয়া করে জানালেন, দোতলায় চলে যান সেখানে কোনো একটা ঘরে দিল্লি আগত সেই মেহমান আদমি ও তাঁর দলবলকে পাবেন। ঘর পেলাম, ঘরে কয়েকটি তটস্থ চরিত্র পেলাম আর পেলাম একটি চেয়ারের পাদদেশে লেবুর খোসা ও ছিবড়ের ছোটোখাটো একটি টিলা। চেয়ার উঁচু কি ভুক্তাবশেষ উঁচু কি ভোক্তা উঁচু কি যারা বসে বা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা উঁচু, বুঝে উঠতে অল্প একটু সময় লাগল। নিজের নাম প্রথমে বাঙলায়, তারপর পর্যায়ক্রমে হিন্দি ও ইংরেজীতে ঘোষণা করে সেই অরেঞ্জ স্কোয়াশের কারখানায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইলুম। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি বললেন, ও এসে গেছেন! দাঁড়ান তিনি আসছেন। তিনি, সেই অধীশ্বর, এঁরা তাঁর অধস্তন দলবল। তিনি এতক্ষণ নাগপুরের কমলালেবুর আধখানা বাগান শেষ করে টয়লেটে ঢোকার জন্যে উঠে গেছেন। যেহেতু তিনি উঠেছেন সেই হেতু এঁরা উঠেছেন। তিনি বসলে এঁরা বসবেন। এর নাম সার্ভিস কনডাকট রুল।

দাঁতের ফাঁক থেকে লেবুর আঁশ খুলতে খুলতে তিনি এলেন। পরিচয় করার জন্যে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলুম, তাঁর দিক থেকে কোনো সাড়া এল না। শেকহ্যাণ্ডের ভয়ে হাতে তোয়ালে জড়িয়ে নিলেন। মুখের ভাব—তুমি কে হরিদাস পাল! আমি সো অ্যাণ্ড সো ফ্রম ডেলহি লাইভস্টক, দেখছো না আমার সব রেটিন্যু দেয়ালের গায়ে গায়ে উঁচিয়ে আছে, আমায় যায় না ধরা, যায় না ছোঁয়া! তুমি যে ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছ দিল্লি হলে, আমার দপ্তর হলে—ঢেউ! ঢেউ করে ঢেঁকুর উঠল। হাতটা শরীরের পাশে গুছিয়ে রাখলুম। হাত তুমি ইনসালটেড। কলমে শোধ নিও। বিশুদ্ধ বাংলায় কোণ থেকে একটি কণ্ঠ বললেন, সাঁইত্রিশে চলে যান, গিয়ে শুয়ে পড়ুন। ভোর তিনটের সময় উঠে নিচে নেমে এসে এদের ধরার চেষ্টা করবেন। সাঁইত্রিশটা কোথায় ভাই, আর চাবি। ভদ্রলোক বললেন, সে হবে, সে হবে এখন আপনি শুয়ে পড়ুন। কি মুশকিল! চাবিটাতো আগে চাই। তারপর তো শোয়া!
ইউ মাস্ট হ্যাভ দি কি। ইউ শুড নো হোয়্যার দি কি শুড বি। দাঁতের ফাঁক থেকে লেবুর ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে গেছে, এইবার বেরিয়ে এল দুটি ইংরেজী বাক্য। এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এতক্ষণ একপাশে চুপ করে বসেছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমার বিব্রত অবস্থার উদ্ধারকর্তা। হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন— চট্টোপাধ্যায়, আমি বরজিন্দর, সাকিন জলন্ধর, সাঁইত্রিশ নিশ্চয় ছত্রিশের পাশে হবে, আমি ছত্রিশ। চল তোমার চাবিটা নিচের রিসেপসান থেকে নিয়ে আসি। এক ফার্লং দূরে অতিথিশালার ঘুমন্ত সেরেস্তা থেকে চাবি উদ্ধার করে আমার ভিন্ন প্রদেশবাসী সাংবাদিক বন্ধু তিনতলার নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিলেন। সরকারী প্রভুরা কিন্তু তাঁদের অনমনীয় প্রভুত্ব নিয়ে দোতলার ঘরে কমলালেবুর বাগিচায় বসে রইলেন।
নির্জন পান্থশালা। তিনতলায় জনপ্রাণী নেই। বরজিন্দর বললেন, নিচে আসছো তো! বেশ বুঝলাম, বেচারা অনেকক্ষণ ধরেই নিজেকে নিঃসঙ্গ অপাঙক্তেয় বোধ করছেন। কারণ দলের সকলেই হিন্দিভাষী। সে রাতে অতটা বুঝিনি, পরে যত দিন গেছে ততই স্পষ্ট মনে হয়েছে, হিন্দি অহিন্দির দুটো বিপরীত স্রোত ভারত জনসমুদ্রের তলে তলে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই রাতে বরজিন্দরের সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে গেলাম, সারা ভ্রমণ পথে সে জোড় আর খোলেনি। পাঞ্জাব এখনো বাঙলাকে শ্রদ্ধা করে। কারণ নেতাজী, কারণ অবেনিয়া, অপ্রাদেশিক, ঈষৎ মুক্ত চিন্তা ও মগজ। ঘরটা বড়। দুটো খাট। একটা নির্ভেজাল। অন্যটা খাট আর খাটিয়ার ক্রসব্রীড। দুটোর ওপরেই আধপচা রবারের তোশক। সুন্দর একটা ভ্যাপসা গন্ধ আগেই অতিথি হয়ে বসে আছে। দুটো খাটের মাঝখানে প্রথামত এক চিল্তে কার্পেট পাতা।

সময় যার যৌবন হরণ করে নিয়েছে। কার্পেটটাকে জোরে বার দুয়েক দুরমুস করতেই পরপর ছ'টা হাঁচি হল। বেডসাইড টেবিলের ওপর ওমর খৈয়ামের আমলের পানপাত্র। সাহারার মত শুকনো। ভেতরে নিশ্চিন্ত আরামে আরশোলা দম্পতি। একপুরু ধুলো। হাত দিলেই রাত্রিবাসের অপরাধের ফিঙ্গার প্রিন্ট। সেণ্টার টেবিলের ওপর একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট। মাথার বালিশের তলায় একটা সেফটি পিন। ওয়ার্ডরোবটা খুললুম এই আশায় যদি বোতলটোতল পাওয়া যায়। একটা পুরোনো খবরের কাগজ এক কোণে ঘাড়মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। সেফটিপিনটা তুলে রাখলুম। হায় সীতা! এমনি ভাবে কত সেফটিপিন কতদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে তুমি বার্ধক্যের দিকে চলেছো। বুদ্ধি করে সঙ্গে এক প্যাকেট ভাল ধূপ নিয়েছিলাম! একটা জ্বালিয়ে, দরজা বন্ধ করে দোতলায় নেমে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। সকলেই তখন খাবার ঘরে। মার্লোন ব্র্যাণ্ডোর টেবিলে বরজিন্দর এবং আর এক ভদ্রলোক। একটা চেয়ার খালি ছিল। সেইটাতেই বসে বরজিন্দরকে আন্দামান সম্পর্কে একটু জ্ঞান দিতে শুরু করলুম। মহামানবটি চামচে বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিগ্যেস করছেন, চিকনকা লেগ কাঁহা। লেবু খাবার বহর দেখে ভেবেছিলাম ভদ্রলোক শম্পভোজী। তা নয়, ইনি সর্বভুক। বেয়ারা বলছে, স্যার, চিকনকা দো ঠ্যাং। এক ডাইনাওলা বাবু লে লিয়া, এক বাঁয়াওলাবাবু লে লিয়া। আপনার দুর্ভাগ্য ডানা দুটো পড়ে আছে। ভদ্রলোক সহভোজীদের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন, ভস্মলোচন, কাহে লিয়া! আমি কিছু খাবো কিনা, এই ভদ্রতার প্রশ্ন তখনো পর্যন্ত কেউ করেন নি। বরজিন্দরই প্রথমে জিগ্যেস করলেন, খাবেন না! খিদে পেয়েছে কিন্তু খেতে ইচ্ছে হল না। বেয়ারাকে ডেকে এককাপ চা চাইলাম। সৃষ্টিকর্তার হাতে একটা দাঁড়িপাল্লা আছে। পয়মাল যেমন সৃষ্টি করেন পাশাপাশি ভাল মালও কিছু নামান। তা যদি না হত, এতদিনে জগৎটা একপাশে কেতরে যেত। দিল্লিশ্বরের সঙ্গে আর একজন যিনি চলেছেন, তিনি নিখুঁত নিভাঁজ ভদ্রলোক, সহবত জানা মানুষ। পরে জেনেছিলাম, উর্দু কবি। ব্যবহারটি নিপাট পারস্য গালচের মত। একজন যখন চিকন ঠ্যাং-এর নিদারুণ শোকে, পরম আক্রোশে বড় মাপের একটা পুডিং খাবলাখাবলি করছেন, কবি তখন খাওয়া ভুলে আমার কাছে আন্দামানের গল্প শুনছেন। কলকাতার বাঙালী সন্তান জানার চেষ্টা না করেও আন্দামান সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে বসে আছি। যখনি ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বটুকেশ্বর দত্ত কি বীর সাভারকরের নাম খণ্ড খণ্ড মেঘের মত মনের আকাশে ভেসে ওঠে, তখনি কল্পনার জগতে কালাপানির ঢেউ ওঠে। চোখের সামনে দেখতে পাই

সেলুলার জেল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাতা হাওয়ায় উড়তে থাকে—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, মানিকতলার বোমা মামলা, বিয়াল্লিশের উৎক্ষিপ্ত কলকাতা, টেগার্ট, ওয়াটসন, ডায়ার।

এই কলকাতায় বসেই দেখেছি, বাঙালী কারুশিল্পীদের হাতে আন্দামান সমুদ্রের ঝিনুক কাটাই ছাঁটাই আর পালিশ হতে হতে সুচারু অলঙ্কার, সুদৃশ্য বোতাম আর টেবিল ল্যাম্পের মন ভোলানো আকৃতি নিচ্ছে। সমুদ্রের স্বপ্নমাখা কারুশিল্প। কত আগেই জেনে বসে আছি, চল্লিশ বছর আগে স্বর্গত হীরালাল মেহতা, কি ভাবে কলকাতায় পাথুরেঘাটায় ইণ্টার আইল্যাণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী স্থাপন করেছিলেন।

হীরালাল ব্রহ্মদেশে গিয়ে সামুদ্রিক ঝিনুকের কাজ দেখেছিলেন। ভারতের দক্ষিণে আন্দোলিত সমুদ্রের জলজ ঐশ্বর্য তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধিকে নাড়া দিয়েছিল। জার্মানী থেকে যন্ত্র আনিয়ে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন। আন্দামানের দু' হাজার মাইল বিস্তৃত সমুদ্র দিল কাঁচামাল টার্বো, ট্রোকাস আর নটিলাস ঝিনুক। কলকাতা দিল কারিগর। বিদেশ দিল বাজার। সেই প্রতিষ্ঠান এখন সুদর্শন শঙ্খ ভাণ্ডারের হাতে।

এই কলকাতায় বসেই জেনেছিলাম, ৪৫ সালের পর থেকে আকুজিরা কি ভাবে ক্ষমতায়, ঐশ্বর্যে আন্দামানের মুকুটহীন রাজা হয়ে উঠেছিলেন। নিকোবারের নারকেল, সুপুরি, তেলকল, আমদানি রফতানি জাহাজ কোমপানী, বিবিধ ব্যবসা বাণিজ্য কি ভাবে নিজেদের একচেটে অধিকারে এনে আকুজিরা ওনাসিস হয়ে উঠলেন, সে কাহিনী অজানা ছিল না।

টেবিলের ওপর পুডিং মাখামাখি প্লেট, চামচ, চিবোনো মুরগীর ঠ্যাং খালি কাপ পড়ে রইল। আমরা সবাই রাতের স্বল্প বিশ্রামের জন্যে প্রস্তুত। আর ঠিক তখনই জানা গেল আগামীকাল ভোরে আমাদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্যে এখনও কোনো গাড়ির ব্যবস্থা হয়নি। কলকাতা এবার দিল্লিকে ল্যাং মেরেছে। এর নাম প্রশাসন!

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের নতুনদারা অমর। বিপদে পড়লেই এঁদের অহং খাটো হয়ে আসে, ঝুঁকে পড়ে উইপিং উইলোর মত। তখন তাঁরা ইন্দ্রর ময়লা চাদর গায়ে জড়াতেও দ্বিধা করেন না। তারপর বিপদ সরে গেলেই অবশ্য খোঁজ করেন, আমার একপাটি পাম্প। দিল্লির নতুনদার গম্ভীর মুখে একটু টোল। হাসি নাকিরে বাবা! রাতের খানাটা বোধহয় নিজের বাড়ির চেয়ে ভালই হয়েছে! হওয়াটাই স্বাভাবিক। সরকারী কর্মচারী যা মাইনে পান, তাতে রোজ রাতে কি আর চিকেন হয়, না অতখানি

এক খাবলা পুডিং হয়! না হাসি অন্য কারণে। কাজের সময় কাজি কাজ ফুরলেই পাজি। সঙ্গের অধস্তন সেই উর্দু কবিকে ভদ্রলোক পরামর্শ দিচ্ছেন, চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্য নিন, কলকাতার মাল, এখুনি কাল সকালের ট্যাকসির ব্যবস্থা করে দেবে। আহা তাই যদি নাহি হবে গো! ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। কলকাতার ট্যাকসি! জানো না তো মিঞা? সাংবাদিকদের নিয়ে যাবার জন্যে দিল্লি থেকে সরকারী অর্থ ধ্বংস করে এতদূর এলে, যাবে অতদূরে, আর ট্যাকসি জোগাড় করে দেবে শ্রীকান্ত। ওই খপ্পরে না পড়ে বরং আর একটু ভয় দেখিয়ে দি! আন্দামান ভীতি। হজমের জন্যে অতিথিশালার সামনের চত্বরে পায়চারি চলছে। রাত প্রায় সাড়ে দশ। বাইরে প্রায় অন্ধকার সার্কুলার রোড। কিছু দূরে বিশাল একটা হোটেল। অন্ধকারে যেন আলোকিত জাহাজ! পানসে হাওয়া বইছে। ১৮৪৪ সাল। বুঝলেন কবি। কবি ট্যাকসি সমস্যা ভুলে ইতিহাসের দিকে সরে এলেন। ১৮৪৪ সালে দুটো বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ। একটার নাম ব্রিটন, অন্যটার নাম রুনি মিড, বঙ্গোপসাগরের ১০ ডিগ্রি চ্যানেলের কাছাকাছি ঝড়ে ওলটপালট। ১০ ডিগ্রির পর থেকেই সমুদ্র অশান্ত প্রবল। দিল্লি-টিল্লির শাসন মানে না, আই এ এস-দের ভয় পায় না। অধস্তনদের আন্দোলনের চেয়েও আন্দোলনকারী। জাহাজের কাপতেনরা হাল ছেড়ে ক্রুশ আর বাইবেল হাতে নিলেন। জাহাজ টাল খেতে খেতে এক সময় একটা দ্বীপে এসে কেতরে পড়ল। শোর অ্যা হায় শোর বলে চিৎকার করতে করতে বিধ্বস্ত নাবিকরা সোনালী সমুদ্র সৈকতে লাফিয়ে পড়লেন। বেঁচে যাবার আনন্দে কাপতেন শ্যামপেনের বোতল খুললেন। তারপর! তারপর সব চিকেন হয়ে গেলেন।
এর মানে। মানে খুব সহজ। একঘেঁয়ে শূকর মুরগী আর হরিণের মাংস খেয়ে খেয়ে মুখটা বোদা মেরে গিয়েছিল। একসঙ্গে অতগুলো সাহেব! লোভ সামলানো যায়! প্রথমে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নৃত্য। শুধু নাচ নয়, বাদ্য যন্ত্র সহযোগে ক্যাবারে নাচ।
তখন ক্যাবারে ছিল!
তখনও ছিল এখনও আছে। বিবস্ত্র হয়ে নাচাকেই তো সভ্য সমাজে ক্যাবারে বলে। ওই তো ওই হোটেলে এখন হচ্ছে। বারে বসে ক্যাবারে! আর আন্দামানে তখন সব দ্বীপেই ক্যাবারে হত। এখন মাত্র কয়েকটা দ্বীপে হয়।
আমরা দেখতে পাব!
চেষ্টা করলে পারব! তবে ডিনারের মূল্যটা বড় বেশি! আমাদের এক কবি ছিলেন, নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর লেখা কবিতার সেই মোরগটার মত অবস্থা হবে!
কি রকম!

ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে— / 'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার !' / তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল / একেবারে সোজা চলে এল / ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে, / অবশ্য খাবার খেতে নয়— । খাবার হিসেবে। আমাদের মুড়োগুলো ধড়হীন হয়ে গড়াগড়ি যাবে। দেহ দিয়ে তৈরি হবে প্রস্তর যুগের কাবাব, ওদিকে চলবে ক্যাবারে। তবে সাদা সাহেব ওরা যেমন পছন্দ করত ব্রাউন সাহেব তেমন পছন্দ করবে কিনা বলতে পারছি না।

ওরা মানে কারা !

হাল ভেঙে যে নাবিকরা পথ হারিয়ে দ্বীপবাসীদের অতিথি হত, সেই দ্বীপের অধিবাসীরা। হাতে তাদের তীর ধনুক, অস্ত্রশস্ত্র। বেঁটে খাটো, গাঁট্টা গোঁট্টা চেহারা মাথায় কুঁচোকুঁচো, কোঁকড়ানো চুল। আবলুসের মত গায়ের রঙ। ভারি অতিথি-বৎসল ! বাইরে রাখলে পাছে কষ্ট হয় ভেবে একবারে পেটে চালান করে দেয় ! তার মানে ওই সাহেবদের সব খানা পাকিয়ে ফেলল ! কবির গলায় বিস্ময় !

আমি একটু হাসলুম শব্দ করে। অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। ভয়টাকে আরো একটু জমানো দরকার। এ তো টিকিট কেটে, রূপালী পর্দায় একজরসিস্ট কি ওমেন দেখা নয়। এ হল জীবন দিয়ে জীবন দেখা।

১৮৪৪ সালের সেই নাবিকরা জল সমাধি নয়, জঠর সমাধি লাভ করেছিল। সেই দ্বীপ এখনো আছে। সেই সব দ্বীপে সময় ১৮৪৪ সালের পর একটুও এগোয় নি। সেই শমপেন, সেই জারোয়া, সেই সেনটিনেলিজরা এখনো আছে। বিবস্ত্র মানব। আগুনের ব্যবহার এখনো জানে না। সভ্য মানুষ দেখলেই তাদের মাথায় আগুন জ্বলে যায়।

বারে বারে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সমুদ্র আছে, ঝড় আছে, আগের মত না হলেও জাহাজ ডোবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ডাঙা পেলেও বাঁচার আশা নেই। ১৮৪৪-এর পর থেকে বারে বারে ওই একই ঘটনা ! রাজ দপ্তরে বারে বারে একই রিপোর্ট, 'হেনরি ডাইজেস্টেড, হ্যারি রোস্টেড, ডিক চপড' ! চপ কাটলেটের ঠ্যালায় প্রশাসনের চোখের ঘুম চলে যাবার দাখিল !

তখন !

তখন, কর্তৃপক্ষের টনক আবার নড়ে উঠল। একটা কিছু করতেই হয় ! মনে পড়ল ১৭৮৯ সালের সেপটেমবরে একবার চেষ্টা হয়েছিল। বঙ্গ সরকারের নির্দেশে, ক্যাপটেন আর্চিবলড্ ব্লেয়ার, গ্রেট আন্দামানের দক্ষিণ-পূর্ব সাগর উপকূলে চ্যাথাম দ্বীপে একটি বন্দিনিবাস তৈরি করেছিলেন। নাম রেখেছিলেন—পোর্ট কর্নওয়ালিশ। দু' বছর

পরে, অ্যাডমিরাল স্যার উইলিয়াম কর্নওয়ালিসের ইচ্ছায়, সেই বন্দিনিবাসকে ওই দ্বীপেরই উত্তর-পূর্ব দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নামটাকেও সরিয়ে নতুন জায়গার নামও রাখা হয়েছিল পোর্ট কর্নওয়ালিস। সরকারের ইচ্ছে ছিল শুধু বন্দিশালা নয়, ওখানে একটা নৌঘাঁটিও তৈরি করবেন। অতই সহজ! উত্তাল সমুদ্র, আকাশছোঁয়া বিশাল অরণ্য, বিদ্‌ঘুটে অসভ্য মানুষ, খাঁড়ি, জোঁক, ম্যালেরিয়া, পেটের অসুখ, বিদ্রোহী আবহাওয়া, অত কষ্ট কে সহ্য করবে। সাহেবরা তো বাঙালী উদ্বাস্তু ছিলেন না। ১৭৯৬ সালে পরিকল্পনা ফেলে তাঁরা পালিয়ে এলেন। কিন্তু না, এবার তো কিছু করতেই হয়। পোর্ট কর্নওয়ালিস পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে, চ্যাথামে স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে। ১৮৫৫ সালে কর্তৃপক্ষ আবার সজাগ হলেন। বন্দিশালার চাবি খোলো। দ্বীপের একটা অংশকে অন্তত 'অসভ্য' সভ্যদের বাসোপযোগী করে তোলো। তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করা গেল না। সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহীদের স্তব্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আন্দামান বিষয়টি জোরদার হয়ে উঠল। শয়ে শয়ে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী মানুষ, চোর-ছ্যাঁচোরের জন্যে দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করতেই হয়। মূল ভূখণ্ডে এদের রাখা চলে না। ১৮৫৮ সালে ব্লেয়ার সাহেবের পোর্ট কর্নওয়ালিশ আবার জেগে উঠল। এই পোর্ট কর্নওয়ালিশকে আগেই উত্তর-পূর্ব অংশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দুটো নাম এক হয়ে গেলে কি করে চলে! নাম রাখো—পোর্ট ব্লেয়ার, এখন কলকাতা থেকে এয়ার বাসে মাত্র দু ঘণ্টার পথ! তাহলে এখন শুয়ে পড়া যাক। পায়চারি করতে করতে এতক্ষণে নিশ্চয়ই 'ওয়াক এ মাইল' হয়ে গেছে!

কিন্তু কাল সকালের ট্যাকসি!

দুই প্রৌঢ়কে ট্যাকসির ভাবনায় পথে বসিয়ে বরজিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে নির্জন তিন তলায় ফিরে এলুম। বরজিন্দর বললেন, শোবার আগে, কিছু যদি মনে না কর, আমাকে একটু সাহায্য করবে? বল, কি সাহায্য! আমার 'পুনি'টা একটু ঠিক করতে হবে। সেটা আবার কি বস্তু! বরজিন্দরের ঘরে গেলাম। সে সুটকেস খুলে. দলাপাকানো সবুজ রঙের একটা কাপড় বের করল। ছিড়িক, ছিড়িক করে অল্প অল্প জল ছিটিয়ে সেটাকে দু হাতে তালগোল পাকাল বার কতক। বার হাত লম্বা খড়খড়ে একটা কাপড়। বরজিন্দরের পাগড়ি। একটা দিকের দুটো কোণ আমার দু হাতে, অন্য দিকটা বরজিন্দরের হাতে। প্রথমে সোজাসুজি টান, তারপর কোনাকুনি টানাটানি। তারপর টেনে ধরে এক দিকের কোণ থেকে গোল করে পাকানো। বরজিন্দর বললেন, এই পাগড়ির জন্যেই, কোন সর্দারজীর অবিবাহিত থাকা মুশকিল। একজন সর্দারনী

জীবনে না ঢোকালে, রোজ পাগড়ি পাকিয়ে দেবে কে!
ওই তো হয় রে ভাই, সাধুর কৌপীন সামলাবার জন্যেই সংসার।
ফিরে এলাম নিজের ঘরে। ধূপের গন্ধে লাশকাটা ঘরের গন্ধটা চাপা পড়ে গেছে। একটা হত্যা না করলে আন্দামানে যাওয়া যেত না। যত ক্ষুদ্রই হোক সেই রকম একটা হত্যাকাণ্ড ঘরে ঢুকেই করতে হল। নরম, চাপা আলোয় ঘরের এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল, কি একটা উড়ছে, মনের আনন্দে। ওড়ার ধরন দেখেই বুঝেছি. মানুষের পরেই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত প্রাণী, একটি আরশোলা! মধু বসন্তে, ধূপের গন্ধে, তার 'নাপচিয়াল ফ্লাইট' বিবাহোত্তর 'অ্যাক্রোব্যাটিকস' শুরু করেছে। একপাটি চটি হাতে আমি তার শমন, ঘাতকের ঘৃণা নিয়ে তৈরি। আমার এই দু শয্যার ঘর অন্য কারুর সঙ্গে ভাগাভাগি করতে রাজি, আরশোলার সঙ্গে নয়। দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে যেই মেঝেতে পড়েছে, চটির চাপড়। চিঁড়ে-চ্যাপটা। এক লাথি। মনে মনে বললুম, পরের জন্মে মানুষ হয়ে জন্মে, মধ্যবিত্ত বাঙালী হস। তখন তোর সব অশ্বতরামি মুখ বুজে সহ্য করব।
শুলেই কি আর ঘুম আসে! সভ্যতা সভ্য মানুষকে সব দিয়ে, সুখনিদ্রাটি কেড়ে নিয়েছে। সময়ের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে সময়ের নদী বইছে। অতীতের বারান্দা দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পুরোনো পৃথিবীর দিকে চলে যাই। ৬৭২ খ্রীষ্টাব্দ, চৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষু ইৎসিং আন্দামানের উল্লেখ করে গেছেন। কিভাবে! সেই দূর শতকে, পালতোলা কোনো বিপজ্জনক জাহাজে করে, জাভা, সুমাত্রার পাশ দিয়ে ভারত মহাসাগর ধরে সিংহলের দিকে আসতে গিয়ে হয়ত দেখেছিলেন রুটির টুকরোর মত ভাসমান কয়েকখণ্ড দ্বীপ, বঙ্গোপসাগরের জলে। নাবিকরা বলেছিলেন, রহস্যময় 'আঙ্গামানিয়ান', যে যায় সে আর ফেরে না। ভিক্ষু তুমি দূর থেকেই হরিতের শোভা দেখ। কোনো সভ্য মানুষ আজও ওই সোনালী বেলাভূমিতে পা রাখেনি। ওই দ্বীপপুঞ্জের অন্য নাম 'সবুজ নরক'। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ আর দূর প্রাচ্যের সামুদ্রিক পথে এই দ্বীপপুঞ্জ পড়ে বলেই হয়তো সুপ্রাচীনকালের বিভিন্ন পুঁথিপত্রে এর উল্লেখ। নবম শতকের আরব পর্যটকরা এর অবস্থিতি জানতেন। ১২৮৬ সালে মার্কোপোলো এই দ্বীপের পাশ দিয়ে ভেসে গিয়েছিলেন। ১৩১২ সালে ফ্রায়ার ওডোরিক। ১৪৩০ সালে নিকোলো কন্টি। বাণিজ্যিক অভীপ্সা, ধর্মপ্রচারের অভীপ্সায় একদল দুঃসাহসিক মানুষ পৃথিবীর সীমানা ক্রমশই বাড়িয়ে চলেছেন, এই দ্বীপের ঠিকানা তখন থেকেই জানা হয়ে গেছে। আন্দামান নাম কে, কবে, কিভাবে দিয়েছিলেন, সঠিকভাবে বলা সহজ নয়। টলেমি যাকে বলেছিলেন, 'আগাথাও

ডাইমোনোস নেসোস', যার অর্থ শুভ আত্মার দ্বীপ, সেই দ্বীপই হয়তো এই আন্দামান। মার্কো পোলোর 'আঙ্গামানিয়ান' সম্ভবত একটি আরবী শব্দ, আন্দামানের দুটি দ্বীপকেই বোঝাতে যে শব্দের ব্যবহার। কণ্টি বলছেন, 'আঙ্গামানিয়ান' শব্দের অর্থ সোনার দ্বীপ। কারুর মতে মালয় হণ্ডুমান বা হনুমানের অপভ্রংশই হল আন্দামান।

ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রামত এসেছিল। স্বপ্ন দেখছি, জারোয়ারা তীর মারছে। সর্ব অঙ্গ জ্বলছে। ছাঁৎ করে ঘুম ভেঙে গেল। সর্বশরীর সত্যিই জ্বলছে। জারোয়াদের তীর নয়, মশার কামড়। প্রকৃতই সুব্যবস্থা, খাটের মাথায় মশারি নেই, মশা আছে প্রচুর। ঘুমের জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা। রাত আড়াইটে। রাত্রির শেষ যামে দাড়ি কামাতে মন্দ লাগে না। নিস্তব্ধ রাত, অচেনা পরিবেশ, মাঝে মাঝে কুকুরের খান খান চিৎকার, আয়নায় আমি আমার মুখোমুখি। আয়নার মুখকে বললাম, তৈরি হও, আর একটু পরেই চিলের মত তোমাকে আকাশে ওড়াবো, সবুজ দারুচিনির দ্বীপ দেখাবো, অনন্ত সমুদ্র দেখাবো, তবে পাখির নীড়ের মত চোখ কোনো বনলতা সেন দেখাতে পারব কিনা জানি না।

॥ ২ ॥

'পোর্টব্লেয়ার' শব্দটার মধ্যে কেমন যেন একটা বারুদ-বারুদ, কামান-কামান গন্ধ আছে। অতীতে আমাদের সুদীর্ঘ দাসত্বের, উৎপীড়নের কলঙ্কে কলঙ্কিত পোর্টব্লেয়ার, অদৃশ্য একটি উৎপীড়ক মূর্তির মত অথৈ জলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে ইতিহাসের শেষ দিন পর্যন্ত। আমরা আকাশে উঠে পড়েছি, নিচে পড়ে আছে, কুটি কুটি ক্ষুদি ক্ষুদি মানুষের ঘর বাড়ি সংসার। আমাদের পরিচালক মহাশয়, বিমানের গবাক্ষের ধারে একটি আসনের জন্যে কাতর হয়ে বড়ই অসভ্যতা করেছিলেন একটু আগে, তিনি সমুদ্র দেখবেন, জটায়ুর তলপেটে সারি সারি সাজানো ছিদ্র দিয়ে। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আমাদের আকাশযানের বহন ক্ষমতার মাত্র অর্ধেক যাত্রীদের দখলে। সুতরাং পোর্টহোলের পাশে বসা নিয়ে মধ্য বায়ুমণ্ডলে যে ধরনের খুনসুটি আশা করা গিয়েছিল তা হয়নি। সঙ্কীর্ণতার আবরণ খুলে গেছে।

আন্দামান যাবার এইটাই সবচেয়ে ভাল সময়। ফেব্রুয়ারি মার্চ। বছরের বাকি আট মাস আন্দামানের আকাশে মৌসুমী মেঘ। উদ্দাম বাতাস। নিশ্ছিদ্র বর্ষা। পৃথিবীর সর্বাধিক বর্ষণসিক্ত বনমণ্ডিত দ্বীপপুঞ্জ। নীল স্ফটিকের মত উজ্জ্বল আকাশ। নিচে পড়ে আছে রেকসিন সুটকেশের মত, ভাঁজ ভাঁজ মোলায়েম সমুদ্র। সেই সমুদ্র এখনো আকাশের দিকে মেঘের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে পারেনি। যেদিকেই তাকাও নীল, ঘন নীল, শীতল সবুজ। মাঝে মাঝে, শ'পাঁচেক টাকা খরচ করা চলে, শুধুমাত্র বিশালের এই নীল সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্যে। অহং-এর পুঁটলি কিছু মানুষ, এই পরিবেশে, নিজের ক্ষুদ্রতাকে অনুভব করে ফ্যালফেলে দৃষ্টি মেলে কেমন বসে আছে, যেন প্যাণ্ট জামা পরা সারি সারি কাক-তাড়ুয়া!

পৃথিবীর তিন ভাগ জলের পাশে, এক ভাগ স্থলের অহংকার চলে না। সমস্ত সমুদ্র হঠাৎ যদি একদিন সরোষে ফুঁসে ওঠে, সমস্ত মেঘ যদি বৃষ্টির ধারায় ভেঙে পড়ে, কোথায় থাকবে এই এক চিমটি মাটি! কোথায় যাবে কিল-বিলে পোকার মত একরাশ মানুষ। আমার পাশে বসে বরজিন্দর অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছিলেন, আকাশ আর সমুদ্রের সীমারেখা খুঁজে পেতে। দিগন্ত সত্যিই হারিয়ে

গেছে। সমুদ্র লাফিয়ে উঠেছে আকাশে। আকাশ ডুবে গেছে সবুজ সমুদ্রে। বসেছি বাঁদিকে। পোর্টহোলে তৃষ্ণার্ত চোখ। বিমানের ডানাটা ঘাড় ঘোরালেই চোখে পড়ছে। বেশ আত্মবিশ্বাসে উড়ে চলেছে। হাওয়ার ঝাপটায় ডানার ডগাটা ঝরঝর করে কেঁপে উঠছে। কেবলই মনে হচ্ছিল, বাঁদিকে হঠাৎ যদি ব্রহ্মদেশের একটুখানি দিগন্ত উঁকি দিয়ে যায়।

ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগ। কত বাঙালী এক সময় ওখানে ছিলেন! কেবলই মনে পড়ছে শরৎচন্দ্রের নাম। মনে পড়ছে, রেঙ্গুন, প্রোম, পেনাং, মৌলমিন আকিয়াব, ইরাবতী! ব্রহ্মের দক্ষিণের একটা অংশ, বলা চলে, আন্দামানের সঙ্গে প্রায় ঠেকে আছে। ব্রহ্মের নেগরাইস অন্তরীপ থেকে আন্দামানের উত্তর মাথার দূরত্ব মাত্র ১২০ মাইল! কোনো সাহসী সাঁতারু কি এই ১২০ মাইল কালাপানি সাঁতরে ব্রহ্মের অন্তরীপে উঠতে পারে! হুগলী নদীর মুখ থেকে কাক যেভাবে ওড়ে (অ্যাজ দি ক্রো ফ্লাইজ) সেইভাবে উড়লে, আন্দামানের দূরত্ব ৬৫০ মাইল। কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার কিলোমিটারে ১২৫৫, মাদ্রাজ থেকে ১১৯১, ভিজাগাপত্তম থেকে ১১২৬। উত্তর অক্ষাংশের ৬ ডিগ্রি থেকে ১৪ ডিগ্রি আর পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯২ থেকে ৯৪ ডিগ্রির মধ্যে একটা ধনুকের মত এই দ্বীপপুঞ্জ প্রকৃতিকে কোলে নিয়ে বসে আছে।

হাজার হাজার বছরের বিশাল বিশাল প্রাচীন গাছ, কিছু আদিম মানব, সামান্য একটু জীব জগৎ নিয়ে, আন্দামানের প্রাচীনতম ইতিহাসের ভূমিকা। অরণ্যের উদ্ভব প্রকৃতির হাতে, কিন্তু চারপাশে প্রায় দু হাজার বর্গ মাইলের সমুদ্র সীমানা পেরিয়ে মানুষ কিভাবে প্রথম এসেছিল এই দ্বীপে! এ প্রশ্নের সঠিক কোনো উত্তর ইতিহাসে নেই।

ভূতাত্ত্বিকরা বলেছেন, আন্দামান আসলে কিন্তু মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ ব্রহ্মের পশ্চিম উপকূল দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে আরাকান-ইয়োমা পর্বতমালায় মিশে সমুদ্রের তলা দিয়ে সাতশো মাইল চলে গেছে, সুমাত্রা, জাভার মধ্যে দিয়ে সুন্দা আর মালাক্কা পর্যন্ত। আন্দামান আর নিকোবর দীপপুঞ্জ সেই বিশাল নগ্ন পর্বতমালার কতকগুলি সর্বোচ্চ শিখর। বঙ্গোপসাগর আর আন্দামান সাগরের মাঝখানে সবুজ প্রাচীর। প্রকৃতির বিস্ময়কর খেলায় মন ভরে ওঠে। আনত মস্তকে স্বীকার করে নিতে হয় বিশাল তোমার পায়ে দয়া করে স্থান দিয়েছো, তাই তোমার জগৎ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রের অংশ নিতে পেরেছি নইলে খড়কুটোর মত ভেসে যেতে কতক্ষণ! কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেছে তোমার ভূখণ্ডের নাড়ির যোগ!

ভাগনারের, থিওরি অব কন্টিনেন্টাল ড্রিফট, যেন কান পেতে শোনা, পৃথিবীর ভূখণ্ডের আদি ভাঙাগড়া। কিছু প্রমাণ, কিছু কল্পনা দিয়ে তৈরি একটি সিদ্ধান্ত। ভারত, আফ্রিকা, ব্রহ্মদেশ ও অস্ট্রেলিয়া একসঙ্গে একটি মহাদেশ—গণ্ডোয়ানা, উত্তরে টেথিস সমুদ্র, আরও উত্তরে এশিয়া। ভাসমান ভূখণ্ডে অদৃশ্য শক্তির টান ধরল। গণ্ডোয়ানা পাঁচ টুকরো হয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়া সরে গেল পূবে। আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ভেসে গেল দূর পশ্চিমে, ভারতখণ্ড ভাসতে ভাসতে চলে গেল উত্তর থেকে উত্তরে এশিয়ার কোলে, ব্রহ্মদেশ উঠে গেল উত্তর-পূর্বে। এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ধাক্কায় তৈরি হল হিমালয় পর্বতমালা, আরাকান-ইয়োমা। যেদিন এই ঘটনা ঘটেছিল, সে রাতে সে কি শব্দ, জলোচ্ছ্বাস, ভূকম্পন! গিরিরাজের জন্ম, তিনটি মহাদেশের জন্ম, তিনটি সাগরের জন্ম! কল্পনায় সেই ক্ষণটিকে ইতিমধ্যে পাওয়া বিভিন্ন প্রমাণের খণ্ড দিয়ে বাস্তব করে তোলার চেষ্টা। দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীর বিচিত্র পরিবর্তন।

সংযোগহীন নিরন্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করে আন্দামানের মাটিতে প্রথম মানুষ কিভাবে এসেছিল! নানা মতের, কোন্ মতটা ঠিক! আন্দামানের আদিম জাতি অবলুপ্ত প্রস্তর যুগের মানুষ। 'নেগ্রিটো' জাতির বিচ্ছিন্ন অবশিষ্টাংশ। বহু দূর অতীতে পূর্ব এশিয়ার বিশাল এক অংশে এদের বসবাস ছিল। কিন্তু কিভাবে এরা আন্দামানে এল। কেউ বলেন, কোনো এক সময়, হয়তো কোনো পর্তুগীজ জাহাজ নিগ্রো ক্রীতদাস ধরে নিয়ে যাবার সময় ঝড়ে দ্বীপের পাশে ভেঙে পড়েছিল। যারা সাঁতার কেটে দ্বীপে উঠতে পেরেছিল তারাই এই দ্বীপের প্রথম মানুষ। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিতে টেঁকে না। কারণ, পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে কোনো পর্তুগীজ জাহাজের এই অঞ্চল দিয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ তার ঢের আগে থেকেই প্রকৃতির কোলে এই সব বর্বর মানুষ তাদের জীবন শুরু করেছিল।

দ্বিতীয় যুক্তি প্রথমটির চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। আন্দামানিরা এসেছিল সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থলভাগ ব্রহ্মদেশ থেকে। ব্রাউন বলছেন আরাকান অঞ্চল থেকে স্থলপথে এরা আন্দামানে এসেছিল। যখন এসেছিল তখন আরাকান-ইয়োমা পর্বতমালা পুরোপুরি সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যায়নি। স্থল পাটাতনের মত সমুদ্রে জেগেছিল। হয়তো হাঁটুভর লোনা জল ভেঙে ভেঙে একদল সিক্ত মানুষ এখানে শিকারের খোঁজে এসেছিল। আর তা না হলে, পেগু কিংবা আরাকান থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়েই এরা এসেছিল। কোনো কোনো ভূতাত্ত্বিক মনে করেন, এরা যে সমুদ্রপথে এসেছিল, সেই অঞ্চলে সমুদ্র তল হঠাৎ তিনশো মিটারের মত ঢালু থাকায় এই আসাটা সহজ হয়েছিল। সিদ্ধান্তটিকে মেনে নিতে আপত্তি নেই। আন্দামানের সঙ্গে ব্রহ্মের সংযোগ সহজ

ছিল। সহজ ছিল না ১০ ডিগ্রি চ্যানেলের আরো শ'খানেক মাইল দক্ষিণে নিকোবারের সঙ্গে। সেই কারণে দুটি দ্বীপের আদিবাসীদের চেহারাই আলাদা।
আরো একটি মত আছে. যে মত আমাদের রামায়ণের কালে নিয়ে যায়। কিরাতদের দেহ বর্ণনা আর ভাষার সঙ্গে আন্দামানের আদিম মানুষের যথেষ্ট সাদৃশ্য।
আন্দামানিজরা আলা-কোরা (দা) নামে পরিচিত। কোরাদা আর কিরাত শ্রুতির দিক থেকে প্রায় এক। ওঙ্গিদের ভগবান 'বোয়ান' আর সাঁওতালদের ভগবান 'বোঙ্গা', একই রকম শুনতে। সুতরাং, আন্দামানিজরা আসলে বাংলার জলা কিংবা দূর সাঁওতাল পরগনার অধিবাসী অথবা ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের গভীর অরণ্যে এদের বসবাস ছিল।
বিমান বালিকার ঘোষণা কানে এল, আমরা আন্দামানের আকাশে। নাক নিচু হবে এখনি, কোমরে বগলস বাঁধো। নিচের দিকে তাকালাম। টুকরো টুকরো জঙ্গল ভাসছে। পেছন থেকে অভিজ্ঞ কেউ বললেন, ওই তো ব্যারেন আইল্যাণ্ড। ওই যে 'নরকোণ্ডা'। ঝুঁকে পড়লুম, যতটা পারা যায় দেখে নিই। দুটোই নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি। জঙ্গল, বন্যপ্রাণী, আর জ্বালামুখ ছাড়া ওখানে কিছু নেই। নরকোনডম বা নরককুণ্ড হিন্দুদের ভয়ের জায়গা। পৃথিবীর কর্ম শেষ হলে, হয় স্বর্গে গমন, না হয় নরককুণ্ডে পতন। নরকেই যখন যেতে হবে জায়গাটা ভাল করে দেখে নিই। বাঃ বেশ ভীতিপ্রদ। সমুদ্র থেকে খাড়া উঠে গেছে ৭১৩ মিটার। জনপ্রাণীশূন্য। দৈত্যের মত গাছ। গাছে গাছে ছয়লাপ। চার ধারে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে। আজ সুপ্ত, যে কোন দিন জেগে উঠতে পারে। তখন আমার আত্মা গন্ধকের আগুনে জ্বলে জ্বলে উঠবে। নীল আলো রাতের আকাশের দিকে বিশুদ্ধিকরণের শিখা মেলে দেবে। শুনেছি, বহু দূর সমুদ্রে, নাবিকরা ভীষণ সব আগ্নেয়গিরি দেখেন। এখনো টগবগে জীবন্ত। দিগন্তে আগুনের গোলা ছুঁড়ছে। কাপ্তেন সাবধানে পাশ কাটিয়ে যান। পুড়ে যাওয়া আকাশের পটে নাবিকরা ডেকের ওপর স্থাণু সিল্যুয়েট।
বিমান বন্দরের সংক্ষিপ্ত, সস্তা সংস্করণ, পোর্টব্লেয়ার। এত সহজ, সরল বিমান অবতরণ ক্ষেত্র আর কোথাও আছে কিনা জানি না। ছোট্ট একফালি দৌড়ক্ষেত্র, চারপাশ খোলা যাত্রী-আটচালা। সাম্প্রতিক সংযোজন—তিনটে পর্দাফেলা খুপরি ঘর। বিমানে ওঠার আগে এই ঘরে বিমান-ছিনতাইকারীদের বাছাই করে ফেলার কাজ চলে। চারপাশে উঁচু টিলা। একদিকে থাকে থাকে, ধাপেধাপে ছোটো ছোটো কাঠের বাড়ি উঠে গেছে। নারকেল গাছের সারি। পোর্টব্লেয়ার, পার্লহার্বার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিটলার, তোজো, জাপানী সৈন্য, হাতিবাগান, খিদিরপুরে বোমাবর্ষণ,

হিরোশিমা, নাগাসাকি, স্মৃতির জলাশয়ে এই ধারার অসংখ্য বুদবুদ। রানওয়ের ওপর দিয়ে দলবল সমেত চলতে চলতে মনে হচ্ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোন এক সকাল! এখনি সারি সারি জাপানী সৈন্য টিলার ওপার থেকে, তোমোদাচি, তোমোদাচি করতে করতে লাফিয়ে নেমে আসবে, খুদে খুদে পায়ে ঢালু জায়গায় আলগা কাঁকরের ঝর্না তুলে। মনে হচ্ছিল, এইবার হয়তো নেতাজীকে দেখতে পাব! ৩৬০ ডিগ্রিতে ঘাড়টাকে রাডারের মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই সময়কার বিমানধ্বংসী কামান খুঁজতে লাগলাম। পুরোনো ইতিহাসকে জোড়া লাগাবার মত মধুর কাজ আর কি আছে। ধুলো, ধোঁয়া, রক্ত, শ্রম, যন্ত্রণা, বঞ্চনা বর্তমানের ছাঁকনিতে ছেঁকে নিয়ে অতীতকে সহনীয় রূপে সামনে হাজির করা। আগুন থাকবে, ফোসকাটা থাকবে না। দূরে বসে, সুখে থেকে, কল্পনায় যন্ত্রণার আস্বাদন!

আমাদের পুরো দলটাকে এতক্ষণে গোছানো অবস্থায় দেখা গেল। মোট নজন। দুজন সরকারী আমলা, একজন বয়ড়া, আমরা ছজন নির্ভেজাল হরীতকী। সুন্দর একটি ত্রিফলা। এক সঙ্গে মিললেই, কথা আর তর্ক-বিতর্কের জোলাপ। দৌড়পথের বাইরে পতাকাধারী কিছু মানুষ। আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে নাকি! যাত্রী-ছাউনিতে ঠাসাঠাসি মনুষ্য। মুখ দেখেই মনে হল, সিজনড অফিসিয়ালস। বাংলা তর্জমা কি হবে—মসলামাখা অধিকর্তা। পতাকাধারীরা শ্লোগান দিতে শুরু করলেন। না, আমরা লক্ষবস্তু নই। লক্ষ, তসরের পাঞ্জাবি, ধুতি পরা, মধ্যমাকৃতির একটি মানুষ। দিল্লি থেকে মন্ত্রী এলেন, আন্দামানের খবর নিতে। ওই মিছিল না চলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অবাঞ্ছিতের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলুম।

রোদ-ঝলসানো আন্দামানের উজ্জ্বল আকাশ। শৌখীন নেশার মত, 'ওজন' সমৃদ্ধ সমুদ্রের বাতাস। মৌমাছি উড়ছে। জায়গাটা এত নিচু, মনে হচ্ছে পকেটে পড়ে গেছি! মন্ত্রী চলে গেলেন দলবল নিয়ে। পাশ থেকে এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—বাঙালী! প্রশ্নের ধরন শুনে মনে হল, হ্যাঁ বললেই ঠাস্ করে এক চড় মারবেন। এখনি বিচার হয়ে যাবে—গত তিরিশ বছরের অপদার্থতার পশ্চাৎগামিতার! বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভদ্রলোক হাসিমাখা মুখে বললেন—আমিও বাঙালী। দুই বাঙালীর তখন কি আনন্দ! একজন আন্দামানের বাঙালী, একজন পশ্চিম বাংলার বাঙালী! ভদ্রলোক বললেন—কি মতলব! আমি বললুম—আপনি কি মতলবে!

মতলবে মতলব মিলে গেল—ভদ্রলোক, দ্বীপ-সাংবাদিক। ছোটো একটা প্রেস আছে, পত্রিকা প্রকাশ করেন। মন্ত্রী-কভারেজে এসেছিলেন। বিশেষ সুবিধে করতে পেরেছেন বলে মনে হল না। মন্ত্রীকে তাঁর দলের লোকেরা পতাকা উড়িয়ে হই হই করে নিয়ে চলে গেছে। আন্দামান নিকোবারে লোকসংখ্যা, এক লাখ পনেরো হাজারের মত। মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। সপ্তাহে দুবার বিমান আসে, তখন ডাক আসে, বস্তা বোঝাই কাগজ আসে। আন্দামানে বসে জানার উপায় নেই বাইরের জগতে কি ঘটছে। রেডিও ভরসা। ছাপাখানা, ছোটখাটো কাগজ মোটামুটি ভালই চলে। আন্দামান থেকে চার পাতার একটি দৈনিক বেরোয়। সরকারী কাগজ। ভাষা ইংরাজী। নাম দি ডেলি টেলিগ্রামস। নিকোবার থেকে দু পাতার একটি সরকারী সাপ্তাহিক বেরোয়—নিকোবারস নিউজ লেটার। এক পিঠে ইংরেজী, অন্য পিঠে নিকোবারিজ ভাষা। নিকোবারিজে সাপ্তাহিকটির নাম ইনলাহেন ই নিকোবারস। কাগজ দুটো তেমন সুখের নয়। আমলা মার্কা সাংবাদিকতা। অন্য চিফ কমিশনারের বাগানে পাখি ডিম পাড়িয়াছে। শ্রীমতী সিসির একটু জ্বর জ্বর হয়েছে। তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

সাংবাদিক সমানে আমার কানের কাছে দ্বীপপুঞ্জের তাবৎ বড় বড় লোকের নিন্দে করে চলেছেন। আর মশাই লুটেপুটে সব ফাঁক করে দিলে। বাঙালীর বারোটা বাজিয়ে দিলে! গর্জে উঠুন, তর্জে উঠুন, কলমে আগুন জ্বালুন। হঠাৎ উচ্ছ্বাস থামিয়ে স্যার বলে এক ভদ্রলোকের দিকে ছুটে গেলেন। পর মুহূর্তেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে চোখ বড় বড় করে বললেন—চেনেন? না ভাই আমি তো সবে মিনিট পনের হল আকাশ থেকে নেমেছি। ছবি দেখেন নি! না। আরে মশাই ওই তো কৃষ্ণার্তী, চিফ কমিশানার। আর ওই যে পাশে সুন্দর মত ভদ্রমহিলা মিসেস কৃষ্ণার্তী।

চিফ কমিশানার, রথ দেখতে কলা বেচতে এসেছেন। মন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানিয়েই অপেক্ষমাণ প্লেনে গিয়ে উঠবেন সস্ত্রীক। নিন্দুকে বলেন, দিল্লী, পোর্টব্লেয়ার পোর্টব্লেয়ার দিল্লী এই হল কর্তা-গিন্নির কাজের মধ্যে বড় কাজ।

আমাদের ব্র্যাণ্ডো দেখি হেসে হেসে চিফ কমিশনারের সঙ্গে খুব কথা বলছেন। চার পাশে আমলাদের ব্যূহ। ব্যাপারটা কি! এসেছি আমরা। আমাদেরই কেউ পাত্তা দিচ্ছেন না। এগিয়ে গেলুম। পরিচয়টা অন্তত হয়ে থাক। শুনলুম কমিশনারের দলবল আমাদের ছজনের দলটাকে দু খণ্ড করতে চাইছেন। একখণ্ড জাহাজে করে চলে যাবে উত্তরে। আর একখণ্ড যাবে দক্ষিণে—কারনিকোবার, কাছাল,

নানকৌড়িতে। কোনো দলই পুরো দ্বীপপুঞ্জটি দেখতে পাবে না। ব্র্যাণ্ডো আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই—ইয়েস স্যার ফাইন স্যার ট্রু স্যার দ্যাটস গুড স্যার করে চলেছেন। বাঃ বেড়ে মজা! রাম ছাড়াই রামায়ণ লেখার চেষ্টা! রসুল শার দুটো লাইন মনে পড়ে গেল—দি ক্যামেল ড্রাইভার হ্যাজ হিজ প্ল্যানস; অ্যাণ্ড দি ক্যামেল হ্যাজ হিজ ওন প্ল্যানস। উট চালকের যেমন নিজের পরিকল্পনা আছে উটেরও তেমনি নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা আছে।

পুনার মহিলা সাংবাদিক শ্রীমতী গোড়বোলে প্রতিবাদ করে উঠলেন এক যাত্রায় পৃথক ফল চলবে না, আমরা একসঙ্গে যতটা দেখার ততটাই দেখবো। আমি তাঁর প্রতিবাদকে সমর্থন করে আরো জোরদার করে তুললুম। উটচালক একটু ঘাবড়ে গেলেন। তুমি কে হে সায়েব! আন্দামান সরকারের আমন্ত্রণে আমরা এসেছি গল্প লিখতে, কথা হবে পরিকল্পনা হবে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে। সিসি বুদ্ধিমান মানুষ। সরে এলেন আমাদের দিকে। শুধু বুদ্ধিমান নন, মুখ চোখ আচার আচরণ দেখে প্রাথমিক ধারণা হল, প্রিয় মানুষ সুপ্রিয় স্বভাব। সেই বাঙালী সাংবাদিক পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফিস ফিস করে বললেন, খুব ধড়িবাজ লোক। চেপে ধরুন। সিসি বললেন, তোমরা যা চাইবে তাই হবে। আমার পুরো দপ্তর তোমাদের হাতে রইল। তবে কি জানো এই বিশাল দ্বীপে, যোগাযোগের অসুবিধে, আমি এত বছর থেকেও কতটুকুই বা জানতে পেরেছি, তোমাদের হাতে তো মাত্র সাত দিন সময়। তাই ভেবেছিলুম, দুটো দলকে দুদিক দেখাবো!

সিসির প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল। আমরা এক খণ্ডই থাকব। সিসি বললেন, ভাল করে লিখুন তো মশাই! এই 'আরকিপেলাগো' সম্পর্কে মানুষের ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়, এর সম্পদ, মানুষ, প্রকৃতি, অবস্থা, উন্নতি। আমি বললুম, শুনুন তাহলে, আসার আগের দিন, ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগের কলকাতা শাখায়, আন্দামান সম্পর্কে ছাপা কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে গিয়েছিলুম। প্রথমে বললেন, নেই। তারপর চেপে ধরতেই বললেন—একটা ফাইল দিচ্ছি লিখে নিন। দেবার মত নেই কিছু মোর, আছে শুধু সমুদ্রের নোনা জল।

কথা শুনে, সিসি তাঁর নিচের আমলার দিকে তাকালেন, তিনি তাঁর নিচের, তিনি আবার তাঁর নিচের। তাকাতে তাকাতে আমলা ফুরিয়ে গেল। সবুজ মাঠ, রানওয়ে, খুপরি ঘর, চকচকে বিমান, শূন্য আকাশ। শ্রীমতী সিসি দূরে ছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন—ম্যান হ্যাভ ইউ ফরগটন, ইউ হ্যাভ এ ওয়াইফ। সিসি হাসতে হাসতে বললেন, আরে তাই তো! এতক্ষণ তাই মনে হচ্ছিল শরীরের আধখানা নেই। তুমি যে আমার অর্ধাঙ্গিনী।

সস্ত্রীক বিমানের দিকে এগোতে এগোতে বললেন—একেই বলে কমিউনিকেশান গ্যাপ। এদিকে তাঁর সঙ্গে আমাদের গ্যাপ বেড়েই চলেছে। সিঁড়ি বেয়ে প্লেনে। প্লেন আকাশে। তারপরই সব শূন্য। মাছি উড়ছে। ছোটো ছোটো আমলারা উড়ছে। বাঙালী সাংবাদিক বললেন, দিস ইজ সিসিজ লাইফ। চেয়ার থেকে প্লেনে, প্লেন থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে প্লেন, প্লেন থেকে চেয়ার। আমাকে ভীষণ ভয় পায়। দেখলেন না কি রকম চোরের মত আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন! দুমদাম লিখি তো! এমন দুর্ভাগ্য, এত লিখেও একবারও জেলে যেতে পারলুম না!

জেলে! সে কি মশাই, এত জায়গা থাকতে জেলে যাবার শখ কেন! জেল কি খুব ভাল জায়গা? বিশেষ করে সেলুলার জেল!

ধ্যাত্, আপনি ঠিক ধরতে পারলেন না। জেলে না গেলে সাংবাদিকদের ইজ্জত বাড়ে না। ফাঁকতালে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী রামরামটা টুক করে ঘুরে এসে, খুব টেক্কা দিচ্ছে আমার ওপর। সবই মশাই ধরাকরার ব্যাপার।

জেলে যাবার জন্যেও ধরাকরা! যাকগে দুঃখ করে আর কি হবে! এক প্রকার জেলেই তো আছেন। আন্দামান ছিল বিখ্যাত পেনাল সেটেলমেণ্ট। এখনও তাই। মনে করুন না যাবজ্জীবন খাটছেন!

ভদ্রলোক মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, এইবার একটা বম্বশেল ছাড়ছি। হয় এসপার না হয় ওসপার!

কি বম্বশেল?

ব্যানার হেডলাইন, ছত্রিশ পয়েণ্ট, আন্দামানের থানায় মদ চোলাই। সাবহেডিং বাঙালী রিফিউজিদের কমবয়সী ছেলেদের ধরে ধরে ওই পাপকাজে লাগানো হচ্ছে। তিন মাস যেতে না যেতেই ছলছুতো করে ওদের গ্রেফতার। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার পথ বন্ধ। পুলিসের স্বার্থে, পুলিসের নাগপাশে শতশত নিরপরাধী কিশোর। কি বাজে বকছেন। আন্দামান ড্রাই এরিয়া, সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্যের প্রবেশ নিষেধ। ক্যা বলেছে! নাবালক আপনি। কোত্থেকে এই হাসির খবরটা পেলেন?

ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের ফোলডারের তলায় বড় বড় করে লেখা আছে। প্রিণ্টিং মিসটেক, প্রিণ্টিং মিসটেক। জল লিখতে মদ লিখে ফেলেছে। আন্দামানে জল পান নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে ভাটিখানা। দেখছেন না, সব বড় বড় ভুঁড়ি। এক একটি চলমান মদের পিপে। যান, আপনাদের ডাকছে। পরে দেখা হবে।

আন্দামান প্রশাসনের ব্যবস্থা, আতিথেয়তা খুবই সপ্রতিভ, নিখুঁত। সারি সারি

গাড়ি। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। একাধিক অফিসার হাসিহাসি মুখে হাজির। স্বয়ং চিফ সেক্রেটারি এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, পরিচয় না দিলে ধরার উপায় নেই। অনেক চিফ দেখেছি, এমন একজন লেবেল ছাড়া চিফ এই প্রথম। দক্ষিণ ভারতীয়। কলকাতায় শৈশব, কৈশোর, যৌবন তিনটেই কেটেছে। আশুতোষ কলেজে পড়াশোনা। পরিষ্কার বাংলা বলেন।

গাড়ির মিছিলে, একমাত্র সাদা অ্যামবাসাডার, বাকি জিপ আর মিনি বাস। ব্র্যাণ্ডো তাঁর পদমর্যাদার গর্বে কথা তো বলতেই চান না, মিশতেও পারেন না ভালভাবে। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাদুড়ীমশাই'-এর স্ত্রীর অবস্থা! কার সঙ্গে মিশবো দিদি, আমার স্বামী যে টোর্নী গো, টোর্নী। ব্র্যাণ্ডো ধরেই নিয়েছেন, অ্যামবাসাডারটা একমাত্র তাঁর জন্যেই চিহ্নিত। ধরে নিলে কি আর করা যাবে! কেউ যদি ভাবেন পৃথিবীটা তাঁর জমিদারি, পৃথিবীকেই তা হলে একটু গাঝাড়া দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয়, কীটের সংসারে কৃকলাসের গর্ব কত দিন!

আমরা নজন মিনিবাসে উঠলুম। ছজন আমন্ত্রিত সাংবাদিক, পি আই বির ফটো অফিসার প্রদ্যোতবাবু, উর্দু কবি আর আন্দামানেই কর্মরত পি আই বির ইনফরমেশান অফিসার শ্রীমজুমদার। এক পালকের পাখিরা একই খাঁচায়। দলে দুজন মহিলা। পুনার শ্রীমতী গোড়বোলে, আদি, অকৃত্রিম ভারতীয় মহিলা। 'লিব' তাঁর নারীত্ব, সংস্কারকে সেলুন-ছাঁটা করে দেয়নি। দিল্লির মহিলা বয়সে কিশোরী, স্বভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত। বেলবট পরা বিদ্রোহ।

আন্দামানের গাড়ি নিজস্ব কায়দায় চলে। রাস্তায় প্রচুর চড়াই-উৎরাই। লোকজন কম। গাড়ি ঘোড়া খুবই কম। মোটর সাইকেল আর স্কুটারের সংখ্যা ৮৬০, লরি ৪১০, ট্যাকসি ৫৩, বাস ৫৭, গাড়ি ও জিপ ২৭১, অন্যান্য ১৭৬। আন্দামান নিকোবারের ৫৩৮ কিলোমিটার পিচের রাস্তায় এক হাজারেরও কম গাড়ি চলাফেরা করে। যে কোনো শিল্প-শহরের, অনবরত গাড়ির তাড়া খাওয়া, শব্দে শব্দে উত্ত্যক্ত মানুষের কাছে আন্দামান যেন শান্তির স্বর্গ! ভ্যাঁক ভ্যাঁক নেই, প্যাঁক প্যাঁক নেই। অধিকাংশ জায়গায় গাড়ি চলার রাস্তাও নেই। সমুদ্রের ধারে ধারে পায়ে হেঁটে যতদূর পারো চলে যাও। সোনালী বালির ভিজে ভিজে কার্পেট, বহু বর্ণের কোরালের কাজ করা। ঝকঝকে ঝিনুকের ছড়াছড়ি।

দক্ষিণ আন্দামান, যেখানে পোর্টব্লেয়ার, সেখান থেকে ট্রাঙ্ক রোড চলে গেছে ৮৭ কিলোমিটার উত্তরে। পোর্টব্লেয়ারের কেন্দ্রীয় দপ্তরের আশেপাশে ৭৩ কিমি রাস্তার বেড়। পোর্টব্লেয়ার থেকে যে সব ছোটোখাটো রাস্তার শুঁড় বেরিয়েছে, তার মোট

দৈর্ঘ্য হবে ১২১ কিমি। বরাটাঙে একটা ১৫ কিমি দৈর্ঘ্যের ট্রাঙ্ক রোড আছে। মধ্য আন্দামানে ট্রাঙ্ক রোডের দৈর্ঘ্য ১১৯ কিমি। উত্তর আন্দামানে ৯ কিমি। কার নিকোবারে সারা দ্বীপ ঘিরে মজার একটি গোল রাস্তা আছে—দৈর্ঘ্যে ৪৫ কিমি। সব জায়গার মিনি বাসেরই এক ধরনের গোঁয়ার্তুমি! বুলেটের মত ছুটতে ছুটতে ঝপাং করে ব্রেক, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ার পরিবর্তন, সামনে দৌড়। তার মানে বাসের ভেতরে অনবরতই যাত্রীদের অবস্থা এই রকম—রকেটের মত আসন ছেড়ে সামনের দিকে উড়তে গিয়েই গুলি ছোঁড়ার পর রাইফেলের মত সবেগে পেছিয়ে আসা। আসনে বসার সুযোগই পাওয়া যাবে না। হাওয়ায় ভাসা, হাওয়ায় ঘুড়ির মত লাটখাওয়া, টাল খাওয়া। মাঝে মাঝে, গেল গেল বলে অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত চিৎকারকে চেপে রাখার চেষ্টা। ঢালু জায়গায় নামার সময় হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ করা। এমনভাবে বাঁক ঘোরা, একটু ফসকে গেলেই ছিটকে গিয়ে রাস্তা-ফাস্তা ছেড়ে গোঁত করে হয় সমুদ্রে না হয় খন্দরে গিয়ে উল্টে পড়া।

একসময়কার অপরাধী নিবাসে, সবই বোধ হয় একটু কাঠখোট্টা। মাটিশূন্য জমি। হাতখানেক চেঁছে ফেললেই, হাজার হাজার বছরের জমাট প্রবাল, আগ্নেয় শিলা, ঘন কালো ছত্রাক, সাদা আর ছাই রঙের মাটি, হালকা বালি, নানা বর্ণের নুড়ি, লাল আর হলুদ মাটি। সমুদ্রের ধারে ধারে বালি নিয়ে সময়ের খেলা। একটু একটু করে জমে উঠেছে সাদা বালির পাথর-জমাট ছোটো ছোটো টিলা। দূর থেকে রোদ পড়ে মনে হয় মার্বেলের স্তূপ। প্রকৃতি বোধহয় জানতেন, ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ে এই মাটিতে আসবে কিছু খুনী মানুষ, তারও পরে আসবেন আরও সাংঘাতিক একদল মানুষ, দেশকে ভালবাসাই যাঁদের অপরাধ। সাইবেরিয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের পারার খনিতে কাজ করতে করতে গলে গলে মরতে হয়। মালয়ে টিনের খনিতে ওই একই ব্যবস্থা। আন্দামানেও পারা আছে, টিন আছে। তবে কোনো অপরাধীকে সে কাজে লাগানো হয়নি কারণ তার চেয়েও কঠিন, কঠোর, জব্দ করার মত কাজ ছিল। পাথর আছে যার গায়ে সোনালী আঁচড়। প্রাচীন বিশ্বাস, দ্বীপে সোনা ছিল। অবশ্য সেই 'এল-ডো-রাডো'র সন্ধানে গোল্ডরাশের আগে আগে কোনো জ্যাকলণ্ডন ছুটে আসেন নি। এলে হয়তো চার্লি চ্যাপলিনের অবস্থা হত। পি আই বির মজুমদার মশাই অনেকক্ষণ আমাকে দেখছিলেন, ভেবেছিলেন আমি হয়তো যেচে আলাপ করব। আলাপ করব কী, আমি হতভম্ব হয়ে গেছি, স্পেল বাউণ্ড। সমুদ্রের ভিজে ভিজে পরিষ্কার হাওয়ায় কলকাতার গুটিয়ে থাকা ফুসফুস খুলতে শুরু করেছে। ঝিল্লির গা থেকে ধোঁয়া আর ধুলোর ঝুল, রেডিওর ইনডোর এরিয়েল

সাফ করার মত, উড়ে উড়ে বুকের নিচের দিকে, পাঁজরের শেষ খাঁজে গিয়ে জমছে। কেবলি মনে হচ্ছে আমি ব্রহ্মদেশে এসেছি, পেনাঙের পথ দিয়ে চলেছি। হালকা কাঠের বাড়ি চারদিকে ছড়ানো। একটা প্যাগোডা কি দেখতে পাব!

গাড়িটা আবার ব্রেক আর অ্যাকসিলেটারের যুগ্ম প্রয়োগে আমাদের ডানাঝাপটানো পাখির অবস্থা করেছে। নিজের আসনে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করতে করতে মজুমদার বললেন, কি ভাবছেন!

ভাবছি, সময় পেলে আপনি আর আমি, কাঁধে তীর ধনুক ঝুলিয়ে রত্নখনির সন্ধানে বেরোবো। এখন শুক্ল পক্ষ। নিঝুম রাতে, চাঁদের আলোয়, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, দৈত্যের মত গর্জন, বাদাম, সিমোয়া আর ধুনো গাছের হাজার বছরের কথোপকথন শুনতে শুনতে শ্যাডল পিকের দিকে এগিয়ে যাবো। আন্দামানের আড়াই ফুট উঁচু বিজ্ঞানী প্যাঁচা, দেড়শো ফুট উঁচু গাছের ডালে বসে বলবে, রাত হল, রাত হল। হরিণ, আর বার্কিং ডিয়ার মুন্তজাকস অবাক চোখে তাকিয়ে থাকবে, অন্ধকারে বালবের মত সারি সারি ঝকঝকে চোখ। মাঝে মাঝে ছুটে আসবে ভয়ঙ্কর-সুস আন্দামানিয়ান-সিস, প্যারাডকসোরাস আন্দামানিয়ানসিস।

সে আবার কি?

প্রথমটা বন্য বরাহ। দ্বিতীয়টা কি জানি না, কেউ দেখেনি, তবে তিনশো বছর আগে সাহসী সাহেবরা মধ্য রাতে এই হিংস্র প্রাণীর চেহারা দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। আমরা কিন্তু এগিয়ে যাবো নির্ভয়ে। দূর থেকে দেখবো, গাছের তলায় জারোয়ারা সারা গায়ে সাদা মাটি মেখে, তীর-ধনুক পাশে এলিয়ে রেখে, প্রেসার-কুকারে মানুষের হাঁড়িকাবাব বানাচ্ছে।

ওরা আবার প্রেসার কুকার পাবে কোথা থেকে!

আছে, আছে, স্টোন এজ প্রেসার কুকার। অ্যানথ্রপলজিক্যাল মিউজিয়ামে দেখেন নি! ডোঙ্গার মত বিশাল আর পুরু গাছের ছাল। আস্ত একটা মানুষ মুড়ে ফেলা যায়। গাছের ছালের চারটে কোণ ওরা দুটো গাছের মাঝখানে কায়দা করে বাঁধে। ভেতরে একটু জল দেয় তারপর দেয় রান্নার জিনিস। তলায় একটু আগুন তৈরি করে। আগুনের তাপে জল গরম হয়ে বাষ্প হয়। একে বলে স্টিম কুকিং। যেমন স্বাস্থ্যসম্মত, তেমনি প্রোটিন আর ভিটামিন সমৃদ্ধ। ঘি, তেল, নুন, মসলা বর্জিত রন্ধন প্রণালী। আমরা শ্বাপদের মত নিঃশব্দে সেই পাকশালার পাশ দিয়ে আরো গভীর বনভূমির দিকে এগিয়ে যাবো। একটু সাবধান হতে হবে। সবুজ সাপের ছোবল খেলেই মৃত্যু! দশ থেকে বারো ইঞ্চি লম্বা তেঁতুলে বিছে, হাতের মুঠোর চেয়ে বড়

সাংঘাতিক কাঁকড়া বিছেও কম বিষাক্ত নয়!
সবুজ সাপ মানে?
ও হরি! ইনফরমেশান অফিসার, পোর্টব্লেয়ারে বসে থাকলে, দ্বীপটাকে কি জানা যায়, স্যার। আন্দামানের বিখ্যাত সাপ হল সবুজ 'কোরাল স্নেকস'। এরা যে সমাজের সভ্য তার নাম 'এলাপিডা'। এদের জাতভাইদের নাম—কোবরা, মামবাস, ক্রেটস, সি স্নেকস। ছোট্ট একটু ছোবল, গভীর নিদ্রা!
এখানে একটা ছোট্ট দ্বীপ আছে, স্নেকস আইল্যাণ্ড, করবিন কোভের ঠিক উল্টো দিকে, বোটে যাওয়া যায়।
তাই নাকি! সামুদ্রিক সাপেরও প্রচুর বিষ, নিউরোটকসিক ভেনমস, শরীর অবশ করে দিতে পারে। মদ্যপান না করেও মাতাল হতে চাইলে একটি ছোবল।
দ্বীপটার নাম রাখুন—আবকারী দ্বীপ। এদের একটি প্রজাতি—ল্যাটিকউডা, জল থেকে ডাঙায় উঠে ডিম পেড়ে যায়। ফিলিপাইনসে বছরে প্রায় তিরিশ হাজারের মত এই সাপ ধরা হয়, খাদ্যের জন্যে, বাহারী চামড়ার জন্যে। কোন কোন সমুদ্রে দশ ফুট প্রস্থের ষাট মাইল দীর্ঘ সাপের ঝাঁক দেখা গেছে। একই দিকে, স্থিরভাবে পাশাপাশি ভেসে চলেছে।
শেষরাতে চাঁদ যখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে, আমরা তখন শ্যাডল পিকের তলায় পৌছে যাব। দূরে জারোয়াদের ডেরা থেকে নিবে যাওয়া আগুনের গোলাপী ধোঁয়া উড়ছে। সামনেই শ্যাডল, দু হাজার চারশো ফুট উঁচু বিশাল বিকৃত পর্বত। ভিজে হাওয়া গাছের গা বেয়ে ওপর দিকে উঠছে। উত্তরে একটা মাথা দু মাইল দূরে দক্ষিণে আর একটা মাথা। ভোরের আলোয় আপনি নিচু হয়ে একটা পাথর তুলে নিয়ে চিৎকার করে উঠবেন—গোল্ড গোল্ড! আমি তুলে নেবো একমুঠো রত্ন। কী রত্ন তা জানি না। পরে বউবাজারে এনে পরীক্ষা করাতে হবে, এমারেলড, কি এমিথিস্ট, কি মুনস্টোন, কিংবা রুবী। জাপানীরা তাদের কয়েক বছরের অধিকারের সময় দ্বীপটাকে চষে ফেলে, কয়লা আর রত্ন দুটোই আবিষ্কার করেছিল। পাহাড়ের পাদদেশেই আমরা ধনী। তারপর লোভে লোভে চুড়োর দিকে উঠে যাবো। মাথার উপর উত্তর থেকে দক্ষিণে দু মাইলের বিশাল এক গহ্বর। থকথকে অন্ধকার, মিহি ধোঁয়া উঠছে। গন্ধকের গন্ধ। যেন নরকের পথ! উঁকি মেরে দেখছি দুজনে, ভয়ে ভয়ে, কি আছে, কি থাকতে পারে। পেছনে ওঁত পেতে বসে আছে দৈত্যের মত জঙ্গল। আপনি সোনার লোভে হঠাৎ আমাকে ঠেলা মারবেন, আমিও ঠিক সেই সময়ে আপনাকে মারব রত্নের লোভে। ব্যাস, পুরো একটি হিন্দি ছবি। দুই ভিলেন জড়াজড়ি করে

শ্যাডল পিকের আড়াই হাজার ফুট গভীর গহ্বরে পারদ-সমাধি !
কথা বলতে বলতে এতক্ষণ লক্ষ করা হয়নি, গাড়িটা ঝিঁকি মেরে মাথা কাটা একটা টিলার ওপর উঠে পড়েছে। বাঁধানো রাস্তা সোজা চলে গেছে শুকনো একটা ফোয়ারার দিকে। চারদিকে হাত পা মেলে পড়ে আছে নতুন একটা একতলা বাড়ি —ট্যুরিস্ট লজ। লাল বোগেনভেলিয়া এলোমেলো হয়ে ঝুলছে ঢোকার পথে। সারি সারি বাহারী পাতার গাছ। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই উর্দিপরা একজন কর্মচারী সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাতে ট্রের ওপর সারি সারি জলের গেলাস। শ্যামদেশীয় পদ্ধতিতে অতিথি আপ্যায়ন। বিষুব রেখার কয়েক ডিগ্রি ওপরে আছি। বারান্দা থেকে নিচের দিকে ঝুঁকলেই বিষুবরেখা দেখতে পাব যেন। আফ্রিকার পেট চিরে সুমাত্রাকে বিদ্ধ করে, বোর্নিয়োকে ফালা করে, অস্ট্রেলিয়ার পাশ দিয়ে, উত্তপ্ত বিষুববন্ধনী পৃথিবীর অপর পিঠে চলে গেছে। জলই তো এই উষ্ণমণ্ডলের জীবন ! তবে প্রথমেই এক গেলাস জল ! এক ব্যাটেলিয়ান ব্যাকটিরিয়াকে যেচে পথ করে দেওয়া।

মিঃ নামবিয়ার হাসিমুখে বললেন—ভয় পাবেন না, চালিয়ে দিন। বিশুদ্ধ বৃষ্টির জল। ক্যালসিয়ামে ভরপুর। কদিন আর জল না খেয়ে থাকবো ! কলকাতার জল যাকে মেরে রেখেছে, তাকে আন্দামানের জল কি আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারবে ! ভয়ও নেই, ভরসাও নেই। তবে, ১৮৫৭ সালের ২রা মে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেকটারের কাছে ভাইকাউন্ট ক্যানিং, আন্দামান, কোকো ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাঠান তার একটি অনুচ্ছেদে পেটরোগা বাঙালীদের জন্যে সামান্য একটু আশার ইঙ্গিত আছে—

The natural resources of the proposed locality—Port Blair : There is an abundance of good water, much culturable land, and judging by the luxuriance of the vegetation, a generally fertile soil ; there is excellent clay for the manufacture of bricks, an inexhaustible supply of sand stone for building purposes, and large forest trees for timber.

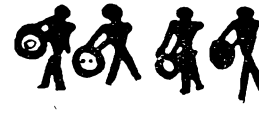

॥ ৩ ॥

ট্যুরিস্ট লজে কে কোন্ ঘরে থাকবেন এই নিয়ে একটা ছোটখাট, 'ব্যাটল অফ অ্যাবারডিন' হয়ে গেল। পেছন দিকে খোলা বাগান, ধাপে ধাপে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। লজের একটা হাত সে দিকে প্রসারিত। সেই বাহুর সমুদ্রমুখো শেষ এক-শয্যাবিশিষ্ট কামরাটি নিয়ে ব্র্যাণ্ডো সাহেবের সঙ্গে হাতাহাতি। পদাধিকার বলে তিনি ওটি দখল করবেনই। ইতিমধ্যে সেটি আর একজন সাংবাদিক দখল করে বসে আছেন। তাঁর দোষ নেই। সার সার ঘর, যে যেখানে ঢুকতে পারেন। একজন অনুদার হলেও, আর একজনের উদার হতে বাধা নেই। সাংবাদিক ভদ্রলোক খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন—এসো খোকা, নাও তোমার ঘর। তোমার চিকেন হলে চলবে না, তার মাংসল ঠ্যাঙটি চাই, দই হলেই চলবে না মাথাটি চাই, ঘোল হলেই চলবে না তার শেষটি চাই, ঘর হলেই চলবে না সমুদ্রমুখো জানলাও চাই। কিন্তু এই ঘরে থাকার মেয়াদ কতক্ষণ! মাত্র এক ঘণ্টা! দিল্লীর সাংবাদিক মহিলা আবার ব্র্যাণ্ডোর ওপরে যান। তিনি বায়না ধরলেন ট্যুরিস্ট লজের সাধারণ ঘরে থাকব না, আমি থাকব 'মেগাপড নেস্টের' শীতল ঘরে। উঃ ভীষণ সালট্রি ওয়েদার, মাই গড। রুমাল নেড়ে হাওয়া খেলেন। বিদেশী সেণ্টের গন্ধ হাওয়ায় ঝাপটা মেরে নাকের পাশ দিয়ে উড়ে গেল। বরজিন্দর ফিসফিস করে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন—ও গড সিভিলাইজেসান।

আমি আর বরজিন্দর অবিচ্ছেদ্য ভ্রমণসাথী। আমাদের ঘর বিপরীত দিকে। পেছনের দরজা খুললেই চওড়া বারান্দা। পাশেই রান্নাঘর। দু-পা বাড়ালেই কোর‍্যাল, সামুদ্রিক শঙ্খ আর ঝিনুক মোড়া পথ সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। ছোটখাটো একটা পাহাড়ের ওপর এই স্বপ্নময় রেস্ট হাউস। অনেক নিচে সমুদ্র। বন্দর। উল্টোদিকে রস আইল্যাণ্ড।

ঘরে মালপত্র কোনোরকমে টান মেরে ফেলে দিয়ে পেছনের দরজা খুলে বরজিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে টিলার কানায় এসে সমুদ্রের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। বাঁ দিকে জল থেকে ঠেলে উঠেছে লাইট-হাউস। পরিত্যক্ত, নির্জন, রস দ্বীপের ভুতুড়ে সৈকতে সমুদ্রের ঢেউ-বালকেরা অসংখ্য কচি কচি হাত মেলে হুড়োহুড়ি করে ছুটে আসছে আবার ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছে। একটা ভাঙা সমাধি একেবারে তীরে সমুদ্রের

দিকে তাকিয়ে বর্তমানের মানুষকে কেবলই বোঝাতে চাইছে—হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

কংক্রিটের ছাতার তলায় বসার আসন। সমুদ্র, লাইটহাউস, ইংরেজদের ছেড়ে চলে যাওয়া হেড কোয়ার্টার রস আইল্যাণ্ড, বন্দর, একটা গাছের পাশ দিয়ে গোল হয়ে এগিয়ে আসা রাস্তা সহজে চলে যেতে দিলে না, বসিয়ে দিলে ছাতার তলায়। অতবড় একটা দ্বীপ, কেউ কোথাও নেই। কিছু ভেঙে পড়া বাংলো, চুরমার চার্চ, আগাছায় ঢাকা বাগান, ছড়িয়ে থাকা সমাধি, নারকেল গাছের দীর্ঘশ্বাস, সমুদ্রের হাসি, কী অদ্ভুত ব্যাপার। রাস্তা আছে মানুষ নেই। প্রেতের মত সাদা সমুদ্র সৈকত, ঢেউ নিয়ে, ঝিনুক নিয়ে বছরের পর বছর খেলা করে চলেছে। বেশি না অর্ধ শতাব্দী আগেও রস আইল্যাণ্ডের ওই সাদা সি-বিচে, চাঁদিনী রাতে কোনো হ্যারিয়েট, কোনো জুলিয়েট, কোনো হ্যামিলটন, কোনো রস, ঢেউয়ের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে খেলা করত। ভিজে ভিজে নোনা শরীর জড়িয়ে ধরে গান গাইত—সাম্রাজ্যের গান, বৃটিশ পতাকার গান, সূর্য না ডোবার গান, কলোনির গান, ক্ষমতার অহংকারের গান। পিয়ানো আর অর্গানের সুর, চার্চের ঘণ্টা। কাছে গেলে দেখতে পেতুম সমাধি ফলকের গায়ে গায়ে, কত কর্নেল, ক্যাপটেন, লেফটেন্যাণ্টের নাম, দেখতে পেতুম অতীতের লেখন—ইন লাভিং মেমরী অফ মাই ওয়াইফ, ইন লাভিং মেমরী অফ মাই হাজব্যাণ্ড, কত শিশুর মৃত্যুতে পিতামাতার দীর্ঘশ্বাস, পাথরের বুকে অস্পষ্ট কালির লেখা হয়ে আছে। বৃষ্টি, নুন, রোদ, বাতাস ওই সব বেদনার শিলাগাত্রে বছরের পর বছর হাত বোলাতে বোলাতে কফিনের কঙ্কালকে কানে কানে বলছে—কেউ থাকে না, থাকবে না, আমরা আছি, আমরা আছি।

টিলার দু ধাপ নিচে বরজিন্দর কি একটা আবিষ্কার করেছে। ডাকাডাকি। নেমে গেলুম দেখতে। দুটি লোক আবিষ্কার করেছে। গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে আছে রোদে পোড়া কালো দুটি মানুষ। তাদের গায়ের সাদা জামা যেন আরো সাদা দেখাচ্ছে। পাশে পড়ে আছে দুটো ঝুড়ি, দুটো গাঁইতি। কাজের ফাঁকে বিশ্রাম। দুটি মানুষ দেখে সর্দারজীর এত উল্লাস কেন! এক সময়কার অপরাধীদের এরা বংশধর। এখন সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। একজনের পায়ে হাঁটুর নিচে গভীর একটা ক্ষত চিহ্ন। সেই চিহ্ন দেখিয়ে লোকটি গল্প শুরু করেছে—দূরে আরো দূরে, ওই উত্তরে এরা গিয়েছিল ট্রাঙ্ক রোড তৈরির কাজে মজুর হয়ে। জঙ্গলের বুক চিরে পথ তৈরি হচ্ছে। ছোটো ছোটো তাঁবু পড়েছে। সময়টা সন্ধে-সন্ধে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে সব। এমন সময় হাওয়ায় শিসের

শব্দ শোনা গেল। সামনে মাটিতে গিঁথে গেল লকলকে একটা তীর। অজস্র শিস, অজস্র তীর। পালাও পালাও। সেই তীর-বিদ্ধ পলাতক মানুষের মুখে আন্দামানের জীবনের গল্প।

জারোয়াদের হিংস্র উৎপাতে গ্রেট আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড ডিগলিপুর হয়ে কোনোরকমে পোর্ট কর্নওয়ালিস পর্যন্ত পৌঁচেছে। দীর্ঘ পথের বাঁ পাশে ঘন গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে জারোয়াদের উৎসুক সন্দিগ্ধ চোখ। সভ্যতার নিকুচি করেছে। বাবুরা এগিয়ে আসছে, সিগার, চুরুট, পাইপ মুখে, জামা কাপড় পরে। ওরা কাশলেই আমাদের টি বি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ওরা ছুঁলেই সিফিলিস, হাম, ওরা তাকালেই আমাদের অপথ্যালমিয়া, অন্ধত্ব, ওরা জঙ্গল যত সাফ করবে, ততই আমরা ম্যালেরিয়ায় উজাড়। চালাও তীর। সভ্যতাকে আটকাও। মনে নেই, রস আইল্যাণ্ডে ওরা, ওই ইংরেজ ব্যাটারা কি করেছিল। ভুলে গেছ নাকি সেই ১৮৬৩ সালের, ২৮শে জানুয়ারির ঘটনা!

১৮৬২ সালের মে মাসে পোর্ট ব্লেয়ারে হাউটনের জায়গায় সুপারিনটেনডেণ্ট হয়ে এলেন কলোনেল টাইটলার। ইংরেজরা তখন বন্য মানুষদের ওপর সভ্যতার পরীক্ষা চালাচ্ছেন। ওদের সুসভ্য করতে না পারলে আমাদের মেরে শেষ করে দেবে। ১৮৫৯ সালের ১৭ই মে, রাতে খুব শিক্ষা হয়ে গেছে, 'ব্যাটল অফ অ্যাবারডিন'। দুধনাথ তেওয়ারীর কৃপায় সে যাত্রা উদ্ধার পেয়েছিল ইংরেজ কলোনিবাজরা। দুধনাথ মানুষটিই বা কেমন ছিলেন!

দুধনাথ ছিলেন সিপাই। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ছিল তাঁর বড় ভূমিকা। দ্বীপান্তর হয়ে গেল। এলেন আন্দামানে। ১৮৫৮ সালের ২৩শে এপ্রিল নব্বইজন বন্দীকে নিয়ে বিদ্রোহী দুধনাথ রস আইল্যাণ্ডের ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। কোথায় পালাবেন, কিভাবে পালাবেন জানা নেই। শুনেছেন উত্তর আন্দামানের শেষ প্রান্ত একটি গুপ্ত স্থলখণ্ড ব্রহ্মদেশের ন্যাজের দিকে ঠেকিয়ে রেখেছে। ভাগ্য ভাল হলে সন্ধান মিলতে পারে। সমুদ্র থেকে দলবল নিয়ে সিপাই দুধনাথ ডাঙায় উঠলেন। গভীর দিকশূন্য জঙ্গল। পড়লেন আদিম মানুষদের হাতে। কিছু মারা পড়ল তীরের আঘাতে, কিছু জঙ্গলে পথ হারিয়ে মরল অনাহারে। আহত দুধনাথ, আরো কিছু আহত সাহসী মানুষ কোনো রকমে পালালেন। সে পালানো কতক্ষণের, কতদিনের! আবার ধরা পড়লেন আহত অবস্থায়। দুজন সঙ্গীর মৃত্যু হল। দুর্জয় দুধনাথ কিন্তু এবারও পালালেন। কিন্তু পালাবার যে পথ নেই। আবার আহত দুধনাথ এবার বন্দী। আন্দামানিজরা এই আহত যোদ্ধাটিকে ভালবেসে ফেলল। দুধনাথের বন্য জীবন শুরু হল। শিকার, ফলমূল আহরণ, মৎস্য শিকার, বন্য ফলার। দুটি মেয়ে

তাকে ভালও বেসে ফেলল। প্রথামত বিয়েও হয়ে গেল। দুই বউ নিয়ে দুধনাথের সংসার। সেই দুধনাথ বিশ্বাসঘাতক হলেন। সভ্য মানুষের রক্তে ভেজাল। দুধনাথ কয়েকদিন ধরেই আন্দামানিজদের সন্দেহজনক চালচলন লক্ষ করছিলেন। কিসের একটা জোর প্রস্তুতি চলেছে। অনেকটা রণসজ্জার মতই। একদিন দেখলেন কুড়িটা ডোঙ্গায় চেপে আড়াইশো আদিবাসী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দ্বীপ ছেড়ে ইংরেজদের ঘাঁটির দিকে চলে গেল। অন্যদিকে থেকে আর একটা দল এল। তাদের নেতা আবার দুধনাথের মতই একজন পলাতক আসামী, নাম সাদলু। দুটো দল এক হয়ে ১৬ই মে-র বিকেলে অ্যাবারডিনের দু মাইলের মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসল। ইংরেজ প্রভুরা এসবের কিছুই জানে না।

এইবার শুরু হল দুধনাথের মীরজাফরী খেল। যে দুধনাথ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে দ্বীপান্তরিত, যে দুধনাথ প্রাণের ভয় না করে পলাতক, জীবনমৃত্যুর সঙ্গে জুয়া খেলে অবশেষে নিভৃত জঙ্গলে আদিবাসীদের আশ্রিত এবং সংসারীও, সেই দুধনাথ সাদলুকে হাত করে আশ্রয়দাতা আদিমানবদের ঋণ শোধ করতে ছুটলেন। শিবিরে যোদ্ধারা নিদ্রিত। গভীর নিস্তব্ধ রাত। দুধনাথ আর সাদলু চুপিচুপি বেরিয়ে ছুটলেন অ্যাবারডিনের ইংরেজ নিবাসের দিকে।

রাত দুটো নাগাদ ইংরেজ ছাউনিতে পৌঁছে দুধনাথ গুপ্তচরের ভূমিকা নিলেন। সাবধান ইংরেজ, শ'পাঁচেক আদিবাসী আসছে তোমাদের আক্রমণ করতে। ওয়াকার সাহেব প্রতিরোধের সবরকম ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি শেষ করার আগেই শেষ রাতে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। একটা দল এগিয়ে আসছে সমুদ্রের তীর ধরে। নৌবাহিনী কামান দেগে সেই দলকে থামিয়ে দিল। দ্বিতীয় দল লাফিয়ে পড়ল ডাঙার দিক থেকে। কামান দেগেও তাদের প্রতিহত করা গেল না। ছাউনি দখল করে নিল। অবশ্য বেশিক্ষণ দখলে রাখতে পারল না। লেফ্‌টন্যাণ্ট ওয়ার্ডেনের সৈন্যরা এসে ছাউনি পুনর্দখল করে নিল। আদিবাসীরা যাবার আগে যথাসর্বস্ব নিয়ে গেল। কিছু মারা পড়ল, কিছু সাংঘাতিকভাবে আহত হল। অ্যাবারডিনের রক্ষাকর্তা হিসেবে পলাতক দুধনাথ প্রাণদণ্ডের বদলে পেলেন পুরস্কার, মার্জনা।

সভ্য মানুষের চালচলন জারোয়ারা জানে। জানে, ওই খণ্ডযুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজরা ঘন ঘন নানা উপহার নিয়ে আদিবাসীদের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে আসে। ঘাগরা নাও, কুর্তা নাও, তামাক নাও, ফল নাও। এস দোস্তি করি। মনে নেই সেই ঘটনা! ১৮৬৩ সাল, জানুয়ারি ২৮। রঙবেরঙের জিনিস সাজিয়ে ইংরেজ জাহাজ লোভ দেখাতে গেছে আন্দামানিজদের দ্বীপে। সভ্যতার ফেরিওয়ালাদের কীর্তি শোনো।

এক ইংরেজ নাবিক প্র্যাট, ব্যাটা লোভ সামলাতে না পেরে আন্দামানিজ এক মহিলার শ্লীলতা হানি করে বসল। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু। দুটি আদিবাসী ছোকরা প্র্যাটকে জবাই করে জলে ফেলে দিল। টাইটলার সাহেব রেগে আগুন। জাতভায়ের জান গেছে! কে দোষী, কে নির্দোষী দেখার দরকার নেই। পিরিতেও কাজ নেই। ওদের ধরো আর মারো। দ্বীপে আগুন ধরিয়ে দাও। খুনীর সাজা চাই।

ভারত সরকার অবশ্য অতটা নিষ্ঠুর হতে দিলেন না। মাসখানেক পরে নাবিক প্র্যাটের হত্যাকারীরা যখন ধরা পড়ল, তাদের মুখ থেকেই জানা গেল আসল ঘটনা। হত্যা যে করেছিল তার নাম জাম্বো। যে দেখেছিল তার নাম স্নোবল। জাম্বোর সাতমাস মেয়াদ হয়ে গেল। স্নোবল ছাড়া পেল। জাম্বোও মাসখানেকের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে গেল।

আর এই জাম্বো, স্নোবল, জাম্বোর বউ টপসি, তাদের ছেলেমেয়ে আরো সব বন্ধুভাবাপন্ন আন্দামানিজদের নিয়ে রস আইল্যাণ্ডে তৈরি হল আন্দামান হোম। পোর্টব্লেয়ারের ধর্মযাজক রেভারেণ্ড এইচ করবিন হলেন পরিচালক। সভ্যতার কুচকাওয়াজ শুরু হল। প্যাণ্ট পর, জামা পর, ইংরেজী পড়, সেলাই শেখ, ছাঁটকাট শেখ, বাস্কেট বানাও, বাগান কর। জঙ্গল ভোলো, শহর চেনো। খুপরি ঘরে থাকো। আকাশ ছোটো হয়ে আসুক, বাতাস নিয়ন্ত্রিত হোক, জীবনকে সীমাহীন থেকে রসদ্বীপের এই ঘেরা আশ্রমে গুটিয়ে আন। এই নাও সুস্বাদু খাবার, আয়না, চিরুনি, খেলনা, টাকা।

সভ্য বন্দীরা রইল তদারকির কাজে। তারা তামাক ধরাল, আফিম ধরাল, সিফিলিস ধরাল, গনোরিয়া ধরাল। এত সুখ, তবু একে একে সব পালিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল সভ্যতার অভিশাপ। রসের আন্দামান হোম থেকে মৃত্যুর দূত ছড়িয়ে গেল দ্বীপে দ্বীপে। যেখানে সভ্য মানুষ কোনদিন সাহস করে পা দিতে পারে নি, দিতে পারবেও না কোনদিন, সেখানে কুকুরের গা থেকে যেমন টিকস ছড়িয়ে পড়ে, সেইভাবে ছড়িয়ে পড়ল সভ্য মানুষের ব্যাধি। ইংরেজদের অতবড় ব্যাটেলিয়ান যা করতে পারে নি, আন্দামান হোমের তত্ত্বাবধায়ক একজন দণ্ডপ্রাপ্ত অফিসার শেরা একাই সে কাজটি করে দিল। আদিবাসী মেয়েদের সিফিলিস ধরিয়ে দিয়ে উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ আন্দামানের প্রায় সমস্ত আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দিল।

সঙ্গে এল অপথ্যালমিয়া, চোখের অসুখ। ১৮৭৬ সালে, ছ'মাসের মধ্যেই বেশ কিছু আদিবাসী প্রায়ান্ধ কিংবা অন্ধই হয়ে গেল। ১৮৭৭ সালের মার্চ মাসে ছাড়া পেল

হাম। গ্রেট আন্দামানের আদিবাসীর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল। ১৮৮৬ সালের আগস্টে এল মাম্পস, ১৮৯০ সালের এপ্রিলে বেড়াতে এল ইনফ্লুয়েঞ্জা। ১৮৯২ সালের জুলাই মাসে আন্দামান হোমের নব অবদান গনোরিয়া।

উনবিংশ শতাব্দীও শেষ হল, আন্দামানের অধিকাংশ আদিবাসীও শেষ হয়ে গেল। বেঁচে রইল কেবল তারা যারা তীরধনুক নিয়ে সভ্যতার মোকাবিলা করেছিল ও করছে—সেই জারোয়া, ওঙ্গি আর নর্থ সেন্টিনেল আইল্যাণ্ডের 'ওঙ্গি-জারোয়া', সেন্টিন্যালিজরা। প্যালিওলিথিক যুগের দুষ্প্রাপ্য মানুষরা কিভাবে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে তার একটা হিসেব সরকারী সমীক্ষকরা করেছেন। কিভাবে করেছেন বলা শক্ত। যাদের কাছে পৌঁছোতে গেলে জীবন দিতে হয় তাদের স্বাভাবিক কায়দায় গোনাগাথা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু এই দীপের বনবিভাগ কিভাবে যেন একটা হিসেব খাড়া করেছেন। অবলুপ্তির চিত্রটা এইরকম :

	উপজাতি	১৮৫৮	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৫১
১.	চারিয়ার	১০০	৩৯	৩৬	১৭	৯	
২.	কোরা	৫০০	৯৬	৭১	৪৮	২৪	
৩.	টোবা	২০০	৪৮	৬২	১৮	৬	
৪.	য়েরে	৭০০	২১৮	১৮০	১০১	৪৬	
৫.	কেদে	৫০০	৫৯	৩৪	৬	২	
৬.	জুওয়াই	৩০০	৪৮	৯	৫		
৭.	কোল	১০০	১১	২			
৮.	বোজিগিয়াব	৩০০	৫০	৩৬	৯		
৯.	বি	৫০০	৩৭	১০	১		
১০.	বালয়া	৩০০	১৯	১৫	৪	২	
১১.	ওঙ্গি	৭০০	৬৭২	৬৩১	৩৪৬	২৫০	১৫০
১২.	জারোয়া	৬০০	৫৮৫	২৩১	২৩১	১২০	৫০
	মোট :	৪৮০০	১৮৮২	১৩১৭	৭৮৬	৪৬০	২৩৩

জারোয়া আর ওঙ্গিদের হিসেবটা একেবারেই বেঠিক। ১৯৬১ সালের গণনা বলছে জারোয়াদের সম্ভাব্য সংখ্যা ৫০০-র কম হবে না। ওঙ্গিদের সংখ্যাও কম করে ৬০০। সভ্যতার পরীক্ষা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আদিমানবদের এইভাবে নিশ্চিহ্ন করে এনেছে। সভ্যতা বড় গুরুপাক খাদ্য। হজম করা শক্ত। ব্রাজিলেও ঠিক এই ব্যাপার হয়েছে। ষোড়শ শতকে পর্তুগীজরা যখন ঢুকলেন, ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা তখন প্রায় তিরিশ লক্ষ।

সভ্যতার নেকটাই সেই সংখ্যাকে এখন লাখে নামিয়ে এনেছে। কারণ, পশ্চিমী রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা এই প্রাকৃতিক জীবদের নেই। চাঁদের মানুষ কলকাতায় নেমে এলে যা হয় তাই হয়েছে। টালার জল, ডিজেলের ধোঁয়া আর রেড রোডের ধুলো মারণাস্ত্রের বাবা। দ্বিতীয় কারণ, কে চায় প্রকৃতির কোল ছেড়ে ফ্ল্যাটের খুপরিতে ঢুকে সীমাবদ্ধ জীবনের পরাধীনতাকে হাসিমুখে মেনে নিতে! মরব তবু শিল্পসভ্যতার ফাঁদে পা দেবো না। তৃতীয় কারণ, দাস হব না কিছুতেই। জঙ্গলের প্রভু আমরা। বিশাল প্রকৃতি আমাদের সাম্রাজ্য। অন্যের জন্যে, অর্থের বিনিময়ে, ভোগের বিনিময়ে দুর্ভোগ ভুগতে রাজি নই।

ব্রেকফাস্ট রেডি সাব। সানট্যান্ড একটি মানুষ সপ্রতিভ গলায় পেছন থেকে বেলা সাড়ে দশটায় ব্রেকফাস্টের ডাক দিয়ে গেল। সামনের সমুদ্র থেকে নেশা উঠছে। ডানদিকে আর একধাপ নিচে শীততাপনিয়ন্ত্রিত মেগাপড নেস্ট। বন্দরের দিকে রাস্তা ধরে পড়ি-কি-মরি করে একটা জিপ ছুটে আসছে। ধুলো নেই তাই ধুলো উড়ছে না। ধোঁয়া নেই তাই চোখ জ্বালা করছে না। এত পরিষ্কার, এত ঝাঁজালো, এত নীল, এত সাদা একটি অঞ্চলের বুক চিরে ফেললে রাম-সীতার বদলে যে একরাশ ক্যানসারের ক্ষত দগদগ করে বেরিয়ে আসবে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। মানুষ! মানুষের ব্যবস্থা কোটি বছরেও ত্রুটিহীন হল না। আধুনিক মানুষ যেন মেগাপডেরই ভিন্ন সংস্করণ! ব্রেকফাস্টের ডিম ছাড়াতে ছাড়াতে সেই কথাই মনে হল। নামটা ভালই রেখেছো—মেগাপড নেস্ট। তফাত এই, মেগাপডের বাসা গরম। মানুষ মেগাপডদের জন্যে ঠাণ্ডা ব্যবস্থা! মেগাপড এই দ্বীপমালার প্রতীকী পাখি। যে দ্বীপ গড়ে উঠেছে অস্বাভাবিক কিছু মানুষের শ্রম ও শারীরিক শক্তির নির্যাস নিঙড়ে নিয়ে, বেত আর বুটের নির্বিচার প্রয়োগে। যে দ্বীপে বেঁচে থাকাটাই ছিল বড় রকমের একটা কৌশল। প্রেম আর ভালবাসার বাঁধনে যে দ্বীপে পাখির বাসার মত কোনো উষ্ণ পরিবার ছিল না। ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের শক্তসমর্থ, সর্বজাতির পুরুষ অপরাধীদের দুঃস্বপ্নে তৈরি এই স্বপ্নময় দ্বীপের আদর্শ পাখি—মেগাপড।

মেগাপড, শক্ত, সমর্থ, বুদ্ধিমান, কুশলী পাখি। ওজনদার। নড়তে চড়তে বড়ই অনিচ্ছা। ফুট দুয়েক লম্বা। আকৃতিতে অনেকটা মুরগির মত। খড়খড়ে, লম্বা লম্বা পা। ধারাল নখ বসানো। গায়ের রঙ বাদামী, ছাই ছাই মাঝে মাঝে সাদার ছিটে। সৌন্দর্যের জন্যে বিখ্যাত নয়। বিখ্যাত স্বভাবের জন্যে। বিখ্যাত তাদের অননুকরণীয় বাসা তৈরির কায়দার জন্যে। এরা কেউ সংসারী নয়।

বৃক্ষশাখায় যত্নে তৈরি ঝুপড়ি বাসায়, কাজকর্ম, খাওয়া দাওয়া ভুলে, নিটোল দুটি ডিমের ওপর ফ্যালফেলে চোখে সারাদিন বসে বসে মা তা দিচ্ছে, আর বাবা পাখি ছুটোছুটি করে খাদ্য এনে দিচ্ছে। বাচ্চা ফোটার পর শিশু এতখানি লাল ঠোঁট বের করে সারাদিন খাবার জন্যে খা-খা করে উঠছে আর মা তাদের মুখে পালা করে নিজে না খেয়ে খাদ্য গুঁজে দিচ্ছে, পক্ষী জগতের এই একান্ত ছবিটাই মেগাপড বাতিল করে দিয়েছে। দেহ আছে, প্রাণ আছে, কাম আছে, ডিম আছে, ডিম পাড়া আছে তারপরের অনুচ্ছেদেই 'শঙ্করদর্শন'—তুমি কে, কে তোমার!

আগ্নেয় বালি, পচা জৈবপদার্থ, ছত্রাক, সব মিলিয়ে মিশিয়ে, ৪০ ফুট ব্যাসের ৬ ফুট পর্যন্ত উঁচু বাসা তৈরি করে সমুদ্রের ধারে। নিকোবারে ৮ ফুট উঁচু, ৬০ ফুট বেড়ের বাসাও দেখা গেছে। এই বাসা হল নিখুঁত, স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ডিম ফোটাবার যন্ত্রের মত। একটা বাসাই বহু বছর ধরে ব্যবহার করা চলে। এই বার পাখির মা ডিম পাড়ার সময় প্রতি দ্বিতীয় দিনে এই বাসায় চাপাচুপি দিয়ে একটি করে ডিম পেড়ে রেখে যায়। মার কর্তব্য এখানেই শেষ।

আগ্নেয় বালি আর জৈবপদার্থের পচনক্রিয়ার স্বাভাবিক উষ্ণতায়, ডিম শাবকে পরিণত হয়। দেখতে দেখতে ডানা, পালক, চোখ সবকিছু তৈরি হয়ে যায়। স্ব-নির্ভর শিশু মেগাপড বাসা ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন সে সাবালক, নড়বড়ে শিশু নয়। সে বলতে পারবে না কে তার মা, কে তার বাবা। জগতের কাছে তার পরিচয়—মেগাপড। যেমন আন্দামানের অনেক মানুষেরই অতীত নেই। খোলা ভাঙা ডিম পড়ে আছে দূর অতীতে। কার হাত ধরে কে কতদূর এসেছে বলতে পারবে না। নিজের চেষ্টায় কি হয়েছে সেইটুকুই মনে আছে। এই দ্বীপের মানুষের জীবন মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে। মেগাপডই এঁদের আদর্শ! গুরু!

ট্যুরিস্ট লজে ঘণ্টাখানেকের নাটক শেষ হল। বন্দরে চিফ কমিশানারের নিজস্ব জাহাজ এম ভি তারমুগলি দোল খাচ্ছে। ঠিক এগারটার সময় জাহাজ ছাড়বে। আমরাই একমাত্র যাত্রী। প্রথম গন্তব্যস্থান, তিরিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নীল আইল্যাণ্ড। জাহাজেই হবে দুপুরের খানা। আন্দামান প্রশাসনের ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। লোকবল, গাড়িবল, অর্থবল প্রচুর। আন্দামানে কিছুক্ষণ থেকেই শিখে গেছি, ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের নাম—মেনল্যাণ্ড। মেনল্যাণ্ডের সরকারী ব্যবস্থার মত এঁদের ব্যবস্থায় ঢিলেমি কম, অহঙ্কার তেমন গাঢ় নয়, ফিকে। এককথায় বেশ তৎপর। চিফ কমিশনারের ভয়ে সবাই জুজু। তিনি এখনও বৃটিশ ঐতিহ্য বহন

করে চলেছেন। দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজকর্মচারী। সমস্ত ক্ষমতার অকটোপাশ। জাহাজ যেন সাজানো-গোছানো প্রথম শ্রেণীর একটি হোটেল। একতলা, দোতলা, তিনতলা, ছাদ, উত্তপ্ত একটি পেটতলা, জঠরের মতই গরম আগুন। ভীষণ আকৃতির দুটো ইঞ্জিন, শক্তির অহঙ্কারে জল চুরমার করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ডেক ছাড়া সর্বত্র কয়ার কার্পেট পাতা। একতলায় চিফ কমিশানারের কেবিন। কেবিনের মত কেবিন। জলযানের উদরে এমন একটি জিনিস থাকতে পারে ধারণাই ছিল না। পা ডুবে যাওয়া লাল কার্পেট। দুদিকে দুটো নরম তুলতুলে বিছানা। লেখার টেবিল, ড্রেসিং টেবিল। গোটাকতক পাখা। সংযুক্ত স্নানাগার। বিশাল দাঁড়-করানো আয়না। মাথার ওপর ফুস্ শাওয়ার। পাশে ফ্যাঁস শাওয়ার। ব্র্যাণ্ডো ঠিক ঢুকে পড়েছেন। এই কেবিনটাই আমার চাই। পাশাপাশি আরো অনেক কেবিন। প্রত্যেকটার মাথার ওপর ধাতুর ফলকে উঁচু উঁচু করে লেখা—ফর টু অফিসারস। কমন প্যাসেজ। দুপাশে ঝকঝকে রেলিং। টাল খেলেই জাপটে ধরে পতন রোধের ব্যবস্থা। 'কাশী' মার্কা খাড়া লোহার সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। সেখানে খাবার ঘর। লম্বা টেবিল। গদী-আঁটা চেয়ার, সোফা, কোচ। বড় বড় কাঁচের জানলা। রেফ্রিজারেটর। পাশেই রান্নাঘর। তারপর রেডিও অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, ক্যাপটেনের ঘর। তিনতলায় ক্যাপটেনের কেবিন। কেবিন বললে ভুল হবে, নেভিগেশান রুম। বিশাল স্টিয়ারিং। টেবিলের ওপর ছড়ানো ম্যাপ, ডিভাইডার, পেনসিল, বাইনকিউলার। ঘরটা যেন কল্পনার সাম্রাজ্য। নীলের ওপর টোপরের মত ভাসছে।

একতলায় কেবিন দখলের লড়াই চলেছে। জাহাজ চলেছে, লড়াইও চলেছে। চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে সুসভ্য মানুষের অসভ্য সঙ্কীর্ণতা দেখছি। কত অল্পে মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ব্যাপারটা এক সময় স্থিতি লাভ করল। আরশোলার মত মানুষের ওড়াউড়ি বন্ধ হল। পড়ে রইল কোণের দিকে একটা অবহেলিত কেবিন। সর্দারজী কাঁধে হাত রাখলেন, হাসি হাসি মুখ। অসম্ভব রকমের পরিপূর্ণ একটি মানুষ! সমস্ত নীচতা আর দীনতার উর্ধ্বে নিজের উদারতা নিয়ে মনুমেণ্টের মত খাড়া। চলিয়ে জনাব, এই হল আমাদের দুজনের ঘর। নিচের বাঙ্কটা সর্দারজীকে দিলুম। ওপরেরটা আমার। এই ব্যবস্থাটাই নিরাপদ মনে হল। সর্দারজী লাট খেয়ে আমার ঘাড়ে পড়লে বাঁচবো না। আমি পড়লে মনে হবে, শুকনো একটা গাছের ডাল পড়ল।

কেবিনে একটা পাখা। একটা ওয়ার্ডরোব, দুজনের জন্যে দুভাগ করা। দুটো

লাইফ জ্যাকেট। দুটো পোর্টহোলের মাঝখানে একটা আয়না। একটা লেখার টেবিল। একটা চেয়ার। একটা ওয়াশবেসিন। মেঝেতে রবারের চাদর বিছানো। পোর্টহোলের বাইরে ঢেউ নাচছে। জলের ওপর মোচার খোলা। খোলার ওপর কয়েকটা প্রাণী। অহঙ্কার বড় ফ্যাঁসাদে পড়েছে। দেহ এক গণ্ডী। জাহাজ আর এক গণ্ডী। বেশি লম্ফঝম্ফ করার উপায় নেই। ফট করে দরজা খুলে একা একা ডাঁট দেখিয়ে, ফাঁট দেখিয়ে বেরিয়ে যাবার পথও বন্ধ। ডুবলে একসঙ্গে সলিল সমাধি। ডাঙায় গিয়ে ঠেকলে, তাল ঠুকে বেরিয়ে আবার লপচপানি!
আন্দামানের প্রকৃতি মানুষের খর্বতা, পরাধীনতা বোঝাবার জন্যেই তৈরি।
ওপরে চা চেপেছে। নিদারুণ একটা ছুটি ছুটি ভাব। মনে হচ্ছে বিশাল এক রবিবার সামনে প্রশস্ত নীল গালচে বিছিয়ে রেখেছে। ঘণ্টাখানেকেই যা শেষ হয়ে সোমবারের বাস-ট্রাম, অফিসের আতঙ্কে তুলে দেবে না। এই সব দিনে জলে ছিপ ফেলে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে মুড়ি তেলেভাজা। আন্দামানে ছিপে ধরার মত মাছ কোথায়! হয় ট্রলার চাই, না হয় ওঙ্গিসদের কায়দায় ঢেউ ভাঙা এক কোমর জলে তীরধনুক হাতে দাঁড়াতে হয়। সে আবার এমন কায়দা হাজার বছর পেছিয়ে গিয়ে ওঙ্গিস মায়ের গর্ভে জন্মে শিখতে শিখতে এই সালে ফিরে আসতে হবে। আন্দামানে মুড়ি তেলেভাজার দোকানও চোখে পড়েনি। কোথায় পাব পেটফুলো মোটা মুড়ি, সরষের তেল, হরিগিরির লড়াইয়ের চপ।
দলে দুজন মহিলা ছিলেন। খাবার ঘরে সকলেই জমায়েত জাহাজী চায়ের প্রত্যাশায়। শ্রীমতী গোড়বোলে রয়েছেন; কিন্তু আর একজন কোথায়! সেই তরুণী ছিপলি, যিনি নারী হয়েও অনারী। হিসেবী বিদ্রোহ। প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ফস্ করে ধরাচ্ছেন। প্যাণ্টের হিপপকেট থেকে চকোলেটের টালি বের করে কুট করে দাঁতে কাটছেন। জ্যাকেটের সামনের দুটো বোতাম এমন কায়দায় খোলা যেন সবাই বলতে পারেন—বন থেকে বেরোলো টিয়ে সোনার টোপর ইয়ে করে। জানা গেল, তিনি আসেন নি, মেগাপডের ঠাণ্ডা ঘরেই পড়ে আছেন। ভীষণ গরম! মাগো কি আবহাওয়া! মহিলার বরাত ভেবে দুঃখ হল। স্থলচর, গেলাসের লাল জলচর, এমন নীল জলচর হবার সুযোগটা হেলায় হারালেন। কে দেবে এমন চার্টার্ড জাহাজ। কে দেবে এমন সুখ! পয়সার জোরে দু ঘণ্টায় পোর্টব্লেয়ারে আসা যায়। তারপর পয়সা থাকলেও ইচ্ছে হলেই এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে যাওয়া যায় না। দ্বীপে দ্বীপে যোগাযোগের ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। ভীষণ কষ্টকর। সাধারণ যাত্রীবাহী জাহাজ যেন ক্যানিং লাইনের ট্রেন। তরিতরকারি, মাছ, নুন, গরু, ছাগল, পেট

বোঝাই যাত্রী, ঘাম, দুর্গন্ধ, ঠাসাঠাসি গাদা-গাদি। বিলিতি সেণ্ট, ওডিকোলনেয় জালা উপুড় করে দিলেও অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হবে না।

শ্যামবর্ণ, ডাঁটো চেহারার এক ভদ্রলোক অনর্গল হোসপাইপে জল দেবার মত বকে চলেছেন। কি না জানেন তিনি! অ্যানথ্রপলজি, আর্কেয়োলজি, এনসিয়েণ্ট হিসটি, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, জুঅলজি, জিওলজি। কে রে বাবা! হিজ মিনার্ভা ইজ বর্ন ইন প্যানোপ্লি! মজুমদারমশাইকে জিগ্যেস করলুম কে ওই জ্ঞানী শ্যামলিমা! জিনিসটা এল কোথা থেকে! যেখান থেকে জাহাজ এসেছে সেই একই জায়গা থেকে এই জ্ঞানের জাহাজটি এসেছেন!

গলাটা ডি শার্পে বাঁধা। তিনি বলছেন—আমি এখানে ধান ফলিয়েছি, আমি হাইব্রিড ধান ইনট্রডিউস করেছি, দারুচিনি, ছোট এলাচ, হিং, কর্পূর, জায়ফল, কোকো এনেছি। আমার কফি বাগানে সাদা ফুল ফুটেছে। আমি আখ এনেছি, আমি আম এনেছি, আনারস। আমি রেড অয়েল পাম এনেছি। আমি আন্দামানিজ ট্রাইবের শেষ বাইশ জন প্রতিনিধিকে কালচার করে স্টোন এজকে ধরে রেখেছি। ওঙ্গিসদের বিবস্ত্র মহিলাদের কোমর থেকে ঘাসের ঝুমকো খুলে লুঙ্গি ধরিয়েছি। বড় বড় আনারস ফলিয়েছি। হাঁক ছাড়লেন—পাইনঅ্যাপল লে আও!

জাহাজের স্টুয়ার্ট দৌড়ে এসে ফ্রিজের দরজা খুললেন—চাকা চাকা খাবা খাবা আনারস। ইয়েস পপিতা, আই হ্যাভ ইনট্রডিউসড পপিতা। পপিতাভি লে আও। ভদ্রলোক স্বয়ং ভূমিলক্ষ্মীর সেকেণ্ড এডিসান! এর পর বলবেন, সৃষ্টির আদি খণ্ডে আমিই ছিলাম কুর্মাবতার, পিঠ দিয়ে ঠেলে এই দ্বীপটাকে জলের ওপর তুলেছিলুম। আমি জল, আমি স্থল, আমি মীন, আমি কুর্ম, আমি বন, আমি আকাশ, আমি আলো, অন্ধকার, আমি গরু, আমি ছাগল, আমি সরকারী হামবাগ।

মনে হল একবার বলি—হে সরকারী কর্মবীর! আপনি ১৮৫৯ সালের ভারত সরকারের আন্দামান বিষয়ক যে কাগজপত্র ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত আছে, তা কি দেখেছেন? আরাকানের কমিশনার, ক্যাপটেন হেনরী হপকিনসন, ১৮৫৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গ সরকারের সচীব গ্রে সাহেবকে লিখছেন—আমার মনে হয় না, প্রচুর খরচপত্তর করে আন্দামানে একটি বন্দিনিবাস শুধু বন্দিনিবাসই থেকে যাবে! বিনিময়ে আমরা কিছুই পাব না। প্রকৃতির নিজের হাতে তৈরি মহারণ্যে যে সব গাছ আমি দেখেছি সেই গাছ আমাদের দেবে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট কাঠ। শুধু তাই নয় এই সব গাছের বাড়বাড়ন্ত দেখে মনে হয়েছে, কোরালই হোক, বালিই হোক কি আগ্নেয় ভস্ম হোক জমি অতি উর্বর। একটু চাষ করলেই অপর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদন সম্ভব হবে।

নারকেল গাছ অসম্ভব ভাল হবে। একটু নিচু সমতল জায়গায় প্রচুর ধান চাষ করা যাবে। বন্দর আন্দামান আর থাইল্যাণ্ডের মারগুই একই অক্ষাংশে অবস্থিত। ওখানে আমি জায়ফলের চাষ খুব ভাল হতে দেখেছি। আমার বিশ্বাস আন্দামানেও খুব ভাল জায়ফল ফলবে।

ওই বখতিয়ার খিলজীকে ইতিহাসের প্রথম পাতায় একবার ছেড়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। ফাইল বগলে নিয়ে বৃহৎ বৃহৎ কথার অজগর তৈরি করে সরকারকে বোকা বানান যায়, ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। ভদ্রলোকটিকে তীক্ষ্ণ ভাষায় যা বলা হয়নি এখানে লিখে রাখি। জানি এসব মানুষ ভয়ে অতীত নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি করতে চান না, বর্তমানের মিথ্যেটা তা হলে প্রকাশ হয়ে পড়বে আর তাহলেই পদোন্নতির মই বেয়ে শনৈঃ শনৈঃ ওপর দিকে ওঠা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য সারা দেশ জুড়েই মিথ্যেবাদী, ধূর্তদের এক ধরনের কারসাজি চলেছে। সকলেই হয় ঘুমিয়ে জেগে আছেন না হয় জেগে ঘুমোচ্ছেন।

আন্দামানে প্রথম নয়া বসতি স্থাপন করতে এলেন ডাঃ জে পি ওয়াকার। ৪ঠা মার্চ, ১৮৫৮। কলকাতা থেকে জাহাজ ছাড়লো। ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে আসছেন ২০০ অপরাধী, একজন ভারতীয় ওভারসীয়ার, দুজন ভারতীয় ডাক্তার, ইণ্ডিয়ান নেভির একজন অফিসারের পরিচালনায় পুরোনো ন্যাভাল ব্রিগেডের ৫০ জন জওয়ান। ডাঃ জে পি ওয়াকার আন্দামানের প্রথম সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। পরে এই পদের নাম হয়েছিল—চীফ কমিশনার।

প্রথমেই শুরু হল অপরাধীদের দিয়ে জোর করে জঞ্জাল পরিষ্কার করানোর কাজ। কাজ শুরু হল চ্যাথাম দ্বীপে। দেখা গেল চ্যাথামে কোনো পানীয় জল নেই। ওয়াকার তখন সরে গেলেন, রস আইল্যাণ্ডে। বন্দরে ঢোকার মুখে ছোট্ট একখণ্ড দ্বীপ। লম্বায় মাত্র ১৫০০ গজ, সবচেয়ে চওড়া অংশের মাপ ৬৫০ গজ। সব মিলিয়ে ১২ একরের মত একটি দ্বীপের টুকরো। পরিষ্কার বৃষ্টির জল পানীয়।

অমানুষিক জীবন। জঙ্গলের ভ্যাপসা গরমে প্রতিটি অপরাধীকে ন' ঘণ্টা কাজ করতে হবে। কি কাজ? পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ জঙ্গল কেটে সাফ। কি তার চেহারা! হাজার হাজার বছর ধরে বেড়ে ওঠা রেনফরেস্ট। দুশো আড়াইশো ফুট উদ্ধত গাছ। এক-একটার 'বাট্রেস' রুটের উচ্চতাই হবে ৫০ ফুট। চারদিকে দুর্ভেদ্য পরগাছা, কাঁটা ঝোপ, খোঁচা শিকড়। রক্তলোভী বিন্দু বিন্দু জোঁক। ঝাঁক ঝাঁক বালি মাছি। গাছ আর পরগাছায় এমন এক চন্দ্রাতপ তৈরি হয়ে আছে, গাছ কেটে ফেললেও ধড়াস করে পড়ে যাবার জায়গা নেই।

ন' ঘণ্টা কাজ মানে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যেতে দেওয়া নয়। কাজ বেঁধে দেওয়া আছে। এতটা জঙ্গল তোমাকে পরিষ্কার করতেই হবে। দিনের শেষে হিসেব মিলিয়ে হয় ছুটি না হয় শাস্তি। শাস্তিটা কি! মাঠের মাঝখানে বিশাল এক টিকটিকির মত লোহার ফ্লগিং ট্র্যাঙ্গল ওত পেতে বসে আছে। উলঙ্গ করে পেছন ফিরিয়ে বেঁধে, মোটা বেত দিয়ে পাছার ওপর অভ্যস্ত হাতে একই জায়গায় সপাসপ ছ ঘা। ছবার মারার প্রয়োজন হত না। তিন ঘায়েই চামড়া ফেটে দু ফাঁক। অজ্ঞান। একটু নুন জল ছিটিয়ে দিয়ে লকআপে। দিনের শেষে মজুরি—এক আনা ন পাই। তাইতেই খাওয়া, তাইতেই জামা-কাপড়, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা। ওই বরাদ্দে দু বেলা খাওয়াই জুটতো না। পরনে জুটতো লেংটি। এই বৃষ্টি এই রোদ। এই ভিজে যাওয়া, এই রোদে পুড়ে ঝলসে যাওয়া! ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, জনডিস। রোজই মৃত্যু। প্রতি দিন আত্মহত্যা। বাদাম, চুগলাম, গর্জন গাছে লতার ফাঁসে ঝুলছে মানুষ। ওয়াকারের ছড়ি ঘুরছে। ওয়ার্ডারদের চাবুক চলছে। কোম্পানী একদিকে জাহাজ বোঝাই শয়ে শয়ে আসামী পাঠাচ্ছে। অন্য দিকে শয়ে শয়ে না খেয়ে, মার খেয়ে খেটে খেটে মরছে। আন্দামান প্রেতাত্মার দ্বীপ! গভীর অরণ্য তাই এত নিস্তব্ধ! মধ্যরাতে জঙ্গলে তাই এত ফিস ফিস শব্দ! গর্জন তাই এত প্রেতবর্ণ, ধ্যানমৌন, বিশাল যোগী!

স্যার রবার্ট নেপীয়ার 'পেনাল সেটলমেণ্ট' দেখতে বেরিয়ে আন্দামানের অবস্থা দেখে প্রায় কেঁদেই ফেললেন—এই শীর্ণ, মৃতপ্রায়, উলঙ্গ মানুষের দল! এরা কারা! এদের ওইভাবে পয়সা না দিয়ে, যত খরচই হোক, বেঁচে থাকার মত দু বেলা দুটি খেতে দাও, কিছু পরতে দাও। আর একটা জিনিস দাও মেয়েছেলে।

পঞ্চভূতের শরীর। শ্রম, আহার, নিদ্রা তারপর! বেঁচে যখন আছে তখন মৈথুনের ব্যবস্থা না রাখলে শুধু আধপেটা খাইয়ে ডাণ্ডাবাজি করে এদের কদিন সামলে রাখবে! মহা দুশ্চিন্তা! চারিদিকে কংসের কারাগার খুলতে খুলতে ইংরেজ সবশেষে এসে ঠেকেছে আন্দামানে। এই ধরনের প্রথম সেটেলমেণ্ট খোলা হয় সুমাত্রার বেনকোয়েলেনে —ফোর্ট মার্লবরো (১৭৮৭ সাল)। এই সেটলমেণ্ট উঠে এল পেনাঙে। এর পর খোলা হল, মালাক্কা, সিঙ্গাপুর, আরাকান এবং টেনাসেরিমে। সব লোপাট করে অবশেষে আন্দামানে। হাত পুড়িয়ে নানা শিক্ষা। কেউ এসেছে খুন করে, কেউ এসেছে ধর্ষণ করে, কেউ এসেছেন বিদ্রোহ করে। কেউ বাঙালী, কেউ বার্মিজ, কেউ বিহারী, পাঞ্জাবী, উত্তরপ্রদেশবাসী অথবা দক্ষিণী। হিন্দু আছে মুসলমান আছে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আছে, আছে শিখ। আগাগোড়া লোহার বেড়ি পরিয়ে খাঁচায় ভরে

রাখার জন্যে এদের আন্দামানে আনা হয়নি। সারা জীবন যাদের কাটবে এই দ্বীপে তাদের নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা নতুন উপনিবেশ গড়তে হবে, নতুন মূল্যবোধের জমিতে। তারা চাষবাস করবে, শিল্প করবে, নতুন উপনিবেশে নতুন জীবনের শিকড় চালিয়ে দেবে। নতুন এক ধরনের সংস্কৃতি জন্ম নেবে। এক জীবন থেকে ছিটকে এসে আর এক জীবনে এরা নতুন করে বাঁচতে শিখবে! তাই যদি না হবে, তাহলে দেশের মাটিতেই তো অনেক ব্যবস্থা ছিল, ফাঁসির দড়ি ছিল, বুলেট ছিল, তোপ ছিল। স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফল্‌স্‌ ১৮১৮ সালে এই সব ভেবেই সুমাত্রার বেনকোয়েলেনে অপরাধী-নিবাস খুলেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন।

তাঁর সেই নীতির মূল বক্তব্য ছিল :

the employment of convicts, in any place desired, on any and every kind of labour necessary to a self-supporting community, their control by convicts selected from amongst themselves, permission to marry and settle down in the Penal Settlement after a given period.

সে যুগে এই নীতির নাম ছিল প্রথমে—'বেনকোয়েলেন রুলস', পরে 'পেনাঙ রুলস' (১৮২৭) তারপর 'বাটারওয়ার্থ রুলস' (সিঙ্গাপুরের তৎকালীন গভর্নর কলোনেল বাটারওয়ার্থের নামানুসারে)। সমস্ত আইনের কেতাবী মলাটে লেখা ছিল—Straits Settlement Rules and Regulations for the management of Indian convicts.

ওয়াকারও আন্দামানে এই সংশোধিত নীতিই অনুসরণ করেছিলেন তবে একটু কড়া হাতে।

নিয়ম ছিল অপরাধীরা দ্বীপে আসামাত্রই তাদের শ্রেণী ভাগ করা হয়ে যাবে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। আর একটি বিশেষ শ্রেণী ছিল—'ডি' ক্লাস বা 'ডাউটফুল গ্যাং'। এই শ্রেণীতে পড়ত অপরাধীর অপরাধীরা। নিয়মভঙ্গকারী, অবাধ্য। মারাত্মক চরিত্রের অপরাধীর গলায় ঝুলত 'ডি' টিকেট। 'ডি' স্টার মানে ভারতীয় অপরাধী। 'এল' টিকিট মানে যাবজ্জীবন। এই 'ডি' ক্লাসের জন্যে তৈরি হয়েছিল—সেলুলার জেল, ভাইপার আইল্যাণ্ড জেল, চ্যাথাম আইল্যাণ্ড জেল। ভাইপারে থাকত—'চেন গ্যাং'। মোটা চেন দিয়ে এক সঙ্গে চারজন বাঁধা—সেই অবস্থায় খাওয়া, শোয়া, স্নান, প্রকৃতির কর্ম অন্যান্য কাজ।

প্রথমে সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধী। ভাল আচরণের জোরে তৃতীয় থেকে দ্বিতীয়

এমন কি প্রথম শ্রেণীতে উন্নতি আর তা না হলে উল্টোটা—তৃতীয় থেকে চতুর্থে নেমে যাওয়া, যাও সেলুলারে, ভাইপারে, চ্যাথামে। তবে প্রথম শ্রেণীতে ওঠার আগে অন্তত এগার বছর অন্য শ্রেণীতে খাটতে হবে। প্রথম শ্রেণী মানেই মুক্ত অপরাধী—সেলফ সাপোর্টার। সেলফ সাপোর্টারদের ইতিমধ্যে তৈরি গ্রামে চাষবাসের জন্যে, বসতি স্থাপনের জন্যে জায়গা জমি দেওয়া হত, দেওয়া হত গরু, মোষ, ছাগল। তাদের সমস্ত উৎপাদন সরকার কিনে নিতেন। এদের মাথাপিছু উপার্জন মাসে ১০ টাকার কম ছিল না। আর এই সেলফ সাপোর্টাররা বিয়ে করার অনুমতি পেত। লোক বাড়াতে হবে। একদিকে থাক তারা যারা মেয়াদ খাটছে আর একদিকে গড়ে উঠুক সংশোধিত অপরাধীদের গ্রাম-সংসার।

সেলুলার জেল থেকে গ্রামের ঘর-সংসারের পথটা খুব সহজ ছিল না। ১৮৯০ সালে লায়াল আর লেথব্রিজ কমিশান রিপোর্ট দাখিল করলেন—স্বভাবটাই যাদের অপরাধপ্রবণ আন্দামানে তাদের ওপর আরো কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। ওদের সঙ্গে অত নরম ব্যবহার করলে চলবে না। প্রথম ছ' মাস প্রত্যেককে ছোট ছোট নির্জন খুপরি ঘরে আটকে রাখতে হবে। ছোট ছোট সেলে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে ওরা হাড়ে হাড়ে বুঝবে অপরাধ করার কি শাস্তি। এও বুঝবে চরিত্র সংশোধন করতে না পারলে নির্জন কারাবাসের দিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। ছ' মাস সেলে কাটাবার পর ১৮ মাস কাটাতে হবে ব্যারাকে অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে। এখানে কঠোর শ্রম। আইনকানুন একটু নরম। ব্যারাকের বাইরে যাবার হুকুম নেই। নানা ধরনের শিল্পে হাড়ভাঙ্গা খাটতে হবে। 'ফনিকস বের' ওয়ার্কশপে যে ধরনের কাজ হত তা হল—যন্ত্রপাতি, কাঠ, লোহা, চামড়া, রুপো, তামা, পেতল, টিন, ঢালাই, ট্যানারি, চুনের ভাঁটি, বেতের সাধারণ শৌখীন কাজ, দড়ি তৈরি, পাপোস তৈরি, মাছ ধরার জাল তৈরি, তারের জাল তৈরি, রঙের কাজ, সাইনবোর্ড লেখা, বয়লার, পাম্প, যন্ত্রপাতি মেরামত, ঘড়ি মেরামত, নারকেল তেল, সরষের তেলের ঘানি, নারকেল ভাঙা ও ছোবড়া ছাড়ানো, নারকেলের শাঁস শুকোনো, হুঁকো তৈরি, ছোবড়া পেটানো, সিসল পেটানো, কার্পেট আর তোয়ালে বোনা, দড়ি ও সিসলের কার্পেট তৈরি, সরষে বাছাই আর ঝাড়াই। ১৮ মাস ব্যারাকে কাটাবার পর তৃতীয় স্তরের জীবনে ব্যারাকের বাইরে কড়া পাহারায় নানা কাজ। গাছ কাটা, জমি পরিষ্কার, চাষবাস, মাছ ধরা, রান্নাবান্না, গেরস্থালির বাসনপত্র তৈরি, পশু প্রজনন ও পালন, মুরগির চাষ, জ্বালানি সংগ্রহ, নুন তৈরি, জাহাজে মাল ওঠান-নামান, কুলির কাজ, জাহাজ তৈরি, বাড়ি তৈরি। সারাদিন কাজের পর দিনের শেষে আবার বন্দী। কাজের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নেই।

এই সময় শুধু দেখা হত তার আচার-আচরণ, কর্মক্ষমতা, কতটা অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে পারে। এর পরের পাঁচ বছর শ্রমিক অপরাধীর ভূমিকা। কম পরিশ্রমের কাজ। অল্প কিছু মজুরি। সেই অর্থে প্রয়োজনীয় কিছু কেনাকাটার স্বাধীনতা অথবা বিশেষ সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমানর ব্যবস্থা। এই পাঁচ বছরের শেষে, কারাজীবনের ১১ বছরের মাথায় ছুটির টিকিট—সেল্‌ফ সাপোর্টার। ১৮৭৪ সাল থেকে জনসংখ্যার লিখিত পরিসংখ্যান রাখার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯০১ সালের একটি হিসেব ঃ অপরাধী নয় এমন মানুষের সংখ্যা ছিল—সরকারী পদে ১০০, স্থলবাহিনীতে ৪৬৬, নৌবাহিনীতে ৭০, পুলিসে ৫৩২, মোট সংখ্যা ১১৬৮। এ ছাড়া ছোটোখাটো ব্যবসা ও অন্যান্য কাজে যাঁরা এসেছিলেন, পুরুষ মহিলা, ছেলেমেয়ে সব মিলিয়ে তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ২৯৯১। অপরাধীদের সংখ্যা ছিল ১৬,১০৬। সেলফ সাপোর্টারদের সংখ্যা ছিল পুরুষ ১৭৬৮, মহিলা ৩৪৯, ছেলে ২১৫, মেয়ে ১৮৯।

এই মহিলা নিয়েই সেটলমেন্টের আর এক সমস্যা। মানুষ সৃষ্টিকর্তার এক পরম কৌতুক। মৃত্যুর মিছিলে বসেও কাম যায় না। এমনই এক অদমনীয় ভাইরাস। সেলুলার জেলে তখন সবে ৪০০ খুপরি তৈরি হয়েছে। পাথরের মেঝেতে শুয়ে বসে দিন কাটছে ঘিনঘিনে যন্ত্রণার মত। ভাইপার দ্বীপে চেনে বাঁধা কুখ্যাতরা শিকল বাজিয়ে, বেত খেতে খেতে পশুমোচনের সাধনা করছে। ব্যারাক থেকে রোজ বন্দীরা পালাতে গিয়ে জঙ্গলে আদিবাসীদের হাতে মরছে। রাত ভোর হলেই গাছে গাছে ঝুলছে শুকনো দেহ। তবু নারী চাই! প্রজননের নেশা। শরীর নেই, অর্ধমৃত, ক্ষতবিক্ষত তবু রাত্রি আসে কালো ওড়না উড়িয়ে। উলঙ্গ ইচ্ছা আসে। দেহ চাই! ওয়াকার কলকাতায় চিঠি লিখলেন—তেল, চাল, ডাল, নুন যেমন পাঠাচ্ছ পাঠাও, সঙ্গে পাঠাও মহিলা। এখানকার ২৫ জন বাঙালী আসামী তাদের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে চায়।

সেই ২৫ জন স্ত্রীলোকের হাতে পায়ে ধরা হল। চল তোমাদের স্বামীর কাছে। জায়গা জমি পাবে, চাষবাস করবে। কেউ রাজি হল না। মরদ পাপ করে মরছে মরতে দাও। তাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক! আমরা বেশ আছি। বিবাহিত জীবন গেছে যাক, কালাপানি পেরিয়ে জাত খোয়াতে রাজি নই। তখন ব্যবস্থা হল ইচ্ছুক মহিলা আসামীদের আন্দামানে পাঠান হবে। আসামী হলেও মেয়েছেলে তো! ১৮৬০ সালে প্রথম ৩৫ জন মহিলা অপরাধী আন্দামানে এল দ্রৌপদী হতে। পুরুষদের সামনে তারা মিছিল করে হেঁটে গেল। স্বয়ম্বর সভা। যার যাকে মনে ধরে। টোপর মাথায় না দিয়েই বিলিতি কায়দায় বিয়ে। এই ভাবে শ' চারেক মহিলা এল।

এইভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দ্বীপে এসেছিল কুকুর। দিশী কুকুর—মাদী মদ্দা। তিন হাজারের মত সেলফ সাপোর্টার পুরুষ, শ চারেকেরও কম মহিলা। সন্ধেবেলা কাঁচের চুড়ির রিনিঝিনি শুনে উপবাসী পুরুষদের খিদে আরো বেড়ে যেত। একটা খুন করে এসেছি, আর একটা করতে আপত্তি কি! সকালে দেখা গেল একটি কিশোরের মৃতদেহ পড়ে আছে। ছেলেটি ছিল অনেকেরই রাতের সঙ্গী। সে-রাতে কোন এক অপরাধীর সঙ্গে রাত কাটাতে রাজি হয়নি। তারই শাস্তি মৃত্যু। গুরুদাস খুন হল। তার নতুন বিয়ে করা বৌ তার অনিচ্ছায় ভাড়া খাটতে গিয়েছিল অন্য এক অপরাধীর ঘরে। রমেশ খুন করেছে তার স্ত্রীকে কারণ তার চালচলন কুকুরের মত। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মার্ক হেড কোয়ার্টারে চিঠি লিখছেন—১৯০৪ সাল:

There was a horrible state of immorality in the sttlements.

কড়া হাতে আমি কিছু করতে গেলেই ওয়াকারের মত মার খেয়ে মরতে চলার দাখিল হবে। কারুরই মন টিঁকছে না এই দ্বীপে। সকলেই পালাতে চায়। পুরোনো জীবনে ফিরে যেতে চায়। রক্ত চায়, খুন চায়।

এদের শান্ত করার জন্যে জাহাজ ভরে মেয়েছেলে পাঠাও। বাংলায় দালাল ঠিক কর—লালা মুণ্ডম সিং। উত্তর-পশ্চিম ভারতের জন্যে বসাও লালা রাম দয়ালকে। মাসে মাসে মাস মাইনে ৫০ টাকা। প্রতি মেয়ে পিছু কমিশন দু টাকা। ধরে ধরে, ভরে ভরে মেয়ে পাঠাও। এদের পোড়া শরীরে রক্তের শোরগোল!

তবু এদের হাতেই তৈরি হল আজকের আন্দামান—আইল্যাণ্ডস অব দি মেরিগোল্ড সান। এখন সেই মরা বাঘের গায়ে পা রেখে, পাশে রাইফেল দাঁড় করিয়ে হাসি হাসি মুখে ছবি তুলে অন্যের বীরত্বে নিজেকে মিছেই সাজিয়ে তুলছ, ওহে আনারস-বাজ অফিসার! যারা জানে তারা হাসবে। তুমি কি ডেভালাপমেণ্ট দেখাচ্ছ! যা হবার তা সে যুগেই হয়ে বসে আছে। তোমরা সেই হওয়া জিনিস নিয়ে খেলছ।

টাকার শ্রাদ্ধ করছ। ত্যাগের নামে ভোগ করছ। পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে ছাড়ছ! চাকাচাকা আনারস চলছে। ফালাফালা পেঁপে। একেই বলে পরের পয়সায় টিংচার আইডিন। কাপ কাপ চায়ের পর, টক মিষ্টি আনারস। চায়ের সঙ্গে যেটুকু দুধ পেটে গেছে নির্ঘাত ছানা কেটে বসে থাকবে। আনারসের আবার রাজা, রানী আছে। রানী আনারস একটু বেশী মিষ্টি। সরকারী মাউথপিসের মাউথে রসাল আনারস। মুখ জোড়া তাই কথা এখন বেরোচ্ছে না। এই ফাঁকে প্রশ্নটা করা যেতে পারে।

খুব তো কফি কফি করছেন কিন্তু চায়ের চাষটা গেল কোথায়! ১৮৯৫ সালের শেষে ৫৮৫ একর জমিতে চা বাগিচা ছিল। বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১,২১,৬৪১ পাউণ্ড তৈরি চা। বার্মা কমিসারিয়েট ডিপার্টমেণ্টকে সাত আনা পাউণ্ড দরে ৫২,৫৫০ পাউণ্ড চা বিক্রি করা হয়েছিল ৯৪-৯৫ সালে। পরের বছর, তারও পরের বছর ওই একই পরিমাণ চা একটু কম দরে ব্রহ্মদেশে চালান করা হয়েছিল। ব্রিটিশ রিপোর্ট বলছে—চা বেশ ভালই হতে পারে। উৎপাদন আরো বাড়তে পারে যদি আরো শ্রমিক পাওয়া যায়। এখন চা-বাগানে যারা খাটছে তারা সবাই আসামী শ্রমিক। সেই চা-বাগানটা আপনারা কোথায় লোপাট করে দিলেন?

কোনো উত্তর নেই।

এর পর আপনার বহু ঘোষিত কফি পর্বে আসা যাক। তখন থেকে জিরকাটাং জিরকাটাং করে মাথা খারাপ করে দিয়েছেন। পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় শখানেক কিলোমিটার উত্তরে জিরকাটাং বলে জারোয়া অধ্যুষিত এলাকায় মশলা আর কফির একটা ২০ হেকটারের পরীক্ষামূলক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে খুব কেরামতি চলেছে। খুব ভাল কথা। আন্দামানের চাষীদের ধান চাষের পাশাপাশি মহামূল্য মশলা আর কফির চাষে উৎসাহী করে অবস্থা ফেরানো হবে। কিন্তু দাদা, ব্রিটিশরা যে অনেক আগে, আপনার মত মুখে বাঘ মারা কর্মবীরের জন্মের আগেই ওসব ফলিয়ে গেছেন। তখনকার সেই ৫০ একরের কফি বাগানটা কোথায় গেল!

উত্তর নেই।

তখন অপরাধীদের দিয়ে ১০,১৪০ একর জমি পরিষ্কার করানো হয়েছিল। আর সেই সামান্য জায়গাতেই যে সব জিনিসের চাষ হত, তা হল: ধান, ভুট্টা, হলুদ, ডাল, আখ, গ্রীষ্মের সবজি, চা, কফি, কোকো, কারারবার মুসাটেকস্থটিস যার আঁশ থেকে তৈরি হত ম্যানিলা রোপ। এ সব তথ্য চেপে রেখে ৬ পাতার একটা 'নিউ এগ্রিকালচারাল স্ট্র্যাটেজি' হাতে ধরিয়ে দেবার কি মানে হয়। যার পাতায় পাতায় শুধু এই করলে হয় ওই করলে হয়! ব্রিটিশরা একদল খুনে, 'মারাকুটাইপের' লোক নিয়ে হাজার অসুবিধের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ যেভাবে চালিয়েছিলেন, তার চেয়ে হাজার গুণ লোক লস্কর নিয়ে লক্ষ গুণ অর্থ বরাদ্দ হাতিয়ে আপনারা মশাই কি করলেন! শুধু লিখলেন, চাষবাসের প্রধান অসুবিধে, স্থানীয় বাজারে চাষের জিনিসের বড়ই অভাব। কি দিয়ে কৃষিকর্ম হবে। সবই আনাতে হয় তামিলনাড়ু আর কেরালা থেকে। আনার খরচ যেমন বেশি তেমনি চুরির হিড়িক। দুটো লাইনেই পথ মেরে দিলেন।

সরকারী গণেশ পুজোর সেই একই মন্ত্র!

আমি আর ফটো অফিসার প্রদ্যোতবাবু ওপরের ডেকে চলে এলুম। কাঁচ কেটে কেটে জাহাজ চলেছে নীল আইল্যাণ্ডের দিকে। মানুষের কাছ থেকে ধাপ্পা ছাড়া কি আর পাব! বরং প্রকৃতি আমাদের কি দিতে পারে দেখা যাক!

॥ ৪ ॥

ওপরের ডেকে জাহাজের পেছন দিকে গদি আঁটা খানকয়েক চেয়ার যেন কনফারেন্স করছে। ঝকঝকে আকাশ, ঝলমলে রোদ। ডাঙা হলে ঝলসে দিত, জল বলে বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না, ভিজে গেছে। জল সব উত্তাপ টেনে নিয়ে নরম করে দিয়েছে। জল বলে জল! চরাচর ব্যাপ্ত করে কালাপানি। ভীষণ কালো। বোতলে ভরলেই 'ব্লু-ব্ল্যাক ইঙ্ক'। সমুদ্র গভীর বলেই জলের রং নীল-কালো নয়। এর নাকি একটা অন্য কারণও আছে। কারণটা হল অর্বুদ অর্বুদ অ্যালগী বা শেওলা। এককোষী সূক্ষ্ম প্রাণী। জলের রঙে সূক্ষ্ম প্রাণের খেলা। এক একটি কোষ ভেঙে ভেঙে কোটি অণুজীবনে বিভক্ত হচ্ছে। বিভিন্ন জাতের প্রায় ১৮ হাজার রকমের শেওলা পৃথিবীর জল-ভাগে খেলা করছে। সাধারণত অগভীর জলই এদের বিচরণ ক্ষেত্র। কোন কোন জাতের অ্যালগী সমুদ্রের ৪০০ ফিট গভীরে ক্ষীণ আলোতেও থাকতে পারে, বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে। সবুজ ক্লোরোফিলের শরীর। কেউ ছড়িয়ে দিচ্ছে লাল রঙ, কেউ নীল, কেউ বাদামী, কেউ হলদে। প্রকৃতির নিজস্ব রঙের কারখানায় তৎপর সব কেমিস্ট। জাপানই বোধহয় প্রথম—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে অ্যালগী থেকে তৈরি করেছিল অ্যাগার অ্যাগার। মানুষের খাদ্য! ওষুধে যার ব্যবহার। অ্যালগী কোষের বাইরে জেলীর মত পদার্থের আবরণ। সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মিকে ছেঁকে ফেলে প্রয়োজনীয় আলো আর উত্তাপটুকু সংগ্রহের ব্যবস্থা। বাইরের আবরণ থেকেই অ্যাগারের উৎপাদন। ব্লু-গ্রীন অ্যালগীর সমবেত চেষ্টায় এই সমুদ্রের জল এত কালোনীল-কালাপানি।

একজন নিঃসঙ্গ স্বাস্থ্যবান মানুষ জলের দিকে তাকিয়ে ডেকে বসে আছেন। কেবিন দখলের লড়াইয়ে এঁকে দেখিনি। চা, আনারস, পেঁপের ককটেলেও এঁকে দেখতে পাইনি। জাহাজের কোন কর্মী! না, তাহলে তো এই ভাবে বসে থাকার ফুরসত মিলত কী! প্রদ্যোতবাবু আর আমি দুটো চেয়ারে বসে দেখতে লাগলুম, জাহাজ কিভাবে লিগের পর লিগ সমুদ্র এক মুখ দিয়ে গিলে অন্য মুখ দিয়ে উগরে ফেলছে। ডেকের রেলিঙের দুপাশে দুটো নাইলনের সুতো বাঁধা। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে জল কেটে কেটে আসছে।

এটা আবার কি কেরামতি!

প্রদ্যোতবাবু বলতে পারলেন না। বললেন অপরিচিত ভদ্রলোকটি। মাছ ধরার কায়দা। বহুদূর অবধি সুতোটা চলে গেছে। মাথায় বাঁধা আছে সরু ধারাল হুক। টোপ হিসেবে—কলকে ফুলের কায়দায় বাঁধা লাল আর নীল কাপড়ের টুকরো। সমুদ্রের বোকা মাছ রঙের মোহে কপ্ করে এসে ধরে। তারপর বোকামির মাসুল। নীলের সাম্রাজ্য ছেড়ে ডেকের ডিজেল মাখা কাঠের পাটাতনে চিৎপাত। মুক্তির জন্যে বারকতক ধড়ফড়। মুহূর্তে রুপোলী শরীর স্থির। লালের গোলে চাঁদের টিপের মত চোখ মৃত্যুর চেয়ে স্থির উদাসীন।

একটু বসুন এখনি দেখতে পাবেন মাছের চেহারা।

ভদ্রলোকের নাম বি পি সোনী। উত্তরপ্রদেশের মানুষ। 'ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সঙ্ঘের' কর্মী। স্ট্রেট দ্বীপে মাত্র ২২ জন আন্দামানিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিযুক্ত। দীর্ঘকাল একা একা আদিম জাতি, আদিম অরণ্য আর সমুদ্র নিয়ে থাকতে থাকতে ভেতরে এক ধরনের শান্ত গভীরতা এসেছে। জীবনের তুচ্ছতা বোঝার ক্ষমতা জন্মেছে।

হঠাৎ নিচের ডেকের এক তরুণ ছুটে এসে রেলিঙের ডানদিকে বাঁধা সুতো ধরে টানতে লাগল। সোনী বললেন—নিন দেখুন, মাছ পড়েছে। দেড় কি দু হাত লম্বা রুপোর তৈরি ঝকঝকে একটা মাছ, পাটাতনে পড়ে মৃত্যুকে গিলে নিল। অভ্যস্ত হাতে হুকটা খুলে নিয়ে আবার হত্যাকাণ্ডের জন্যে জলে ফেলে দেওয়া হল।

কী মাছ!

সোনী বললেন—সুরমাই। খুব মিষ্টি মাছ। ভেরি টেস্টফুল!

মাছ যখন ধরা পড়েছে মধ্যাহ্ন ভোজনের পাতে নিশ্চয় পড়বে, তখন দেখা যাবে কিরকম টেস্ট। তবে চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ইলিশের বড় সংস্করণ। প্রচুর তেল বেরোবে। কডলিভারের গন্ধ। খাবার আগে দশবার ভাবতে হবে, পাকস্থলীতে পাচার করার পর পরিণতি কি হবে! কটা অ্যাণ্টাসিড আর অ্যাণ্টি-অ্যামিবিক ট্যাবলেট লাগবে! ভাবতে ভাবতেই বাঁ দিকের সুতোয় আবার মাছের টান। আর এক মূর্খের মহানিপাত যোগ ঘনিয়েছে। সুতো ধরে টানাটানি। এ আবার কি মাছ। জীবনে এমন মাছ তো দেখিনি। প্রকৃতই বিশাল এবং প্যাণ্ট পরা। এক ঠ্যাঙের ট্রাউজার। নড়েও না চড়েও না, স্থির। এটা কি মাছ মিঃ সোনী! আজ্ঞে মাছ নয়। ট্রাউজারের ছেঁড়া একটা পা। কোথা থেকে এল, এই মাঝ সমুদ্রে! কিছুক্ষণ গবেষণা হল। মৃত্যুর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এর ভেতরে নিশ্চই মানুষ ছিল। হয় গলে বেরিয়ে গেছে, না হয় চলে গেছে হাঙরের পেটে! কল্পনার জোর থাকলে একটা ট্রাউজারের পা থেকে

কত কি তথ্য পাওয়া যায়! এইভাবেই মানুষ গোয়েন্দা হয়ে ওঠে। মালিকের ন্যাশান্যালিটি ঠিক হয়ে গেল—ম্যালেশিয়ান। পেশা আন্দামান সমুদ্রে মাছ চুরি। জলে ডুবে মৃত্যুর কারণ—ছোটো মাছ চুরির ট্রলারের ডেকে ফুরফুরে হাওয়ায় ঘুমুচ্ছিল। রোলিঙের সময় গড়িয়ে ঝপাং করে জলে পতন এবং সব শেষ।

ফুটফুটে চেহারার রেডিও অফিসার, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, চেক চেক লুঙ্গি, স্যাণ্ডো গেঞ্জি। কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করা হয় নি। তিনি একগাল হেসে বললেন—আরে, এটা তো আমার প্যাণ্টেরই ছেঁড়া অংশ। নিচের ইঞ্জিনরুমে ছিল। কেউ তেলকালি মুছে জলে ফেলে দিয়েছে। এক ফুঁয়ে গবেষণার বাতি নিবে গেল। আমরা আমাদের চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লুম। সামনে সমুদ্র। কোথাও কোনো ডাঙার চিহ্ন নেই। অপরিচিত আকাশ। ভালও যেমন লাগছিল, খারাপও লাগছিল। কী ভয়ঙ্কর অসহায় পরাধীন অবস্থা। কেবিন থেকে ডেক, ডেক থেকে কেবিন, টলতে টলতে ঘুরে বেড়াও। মাঝে মাঝে ক্যাপটেনের বাইনকিউলার চোখে লাগিয়ে দেখার চেষ্টা কর—অদৃশ্য কোন স্থলভাগ ধার করা দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়ে কি-না।

ধরা পড়ল মাছ। এবার প্রকৃতই মৎস্য। সোনী বললেন—কোকারি। এই মাছটার বেশ রাগী-রাগী চেহারা। বেঁচে থাকলে নির্ঘাত কামড়ে দিত। যে জলে এত অজস্র মাছ, সে দেশের মানুষের চাকরি বাকরির কী প্রয়োজন। সুতো ফেলে বসে থাক, খাদ্য খেলে-খেলে চলে আসবে। 'লোটাস ইটার্স' আইল্যাণ্ড!

বড় দ্বীপ, টুকরো দ্বীপ আর ভাসমান পর্বত সব মিলিয়ে সংখ্যা ৫৫০। ১২০০ কিলোমিটার তটরেখা। মেনল্যাণ্ডের প্রায় একের তিন অংশ। চারপাশে খোলা পড়ে আছে ১,২৯,৬০০ নটিক্যাল মাইল সমুদ্রসীমা। সেই গভীর সমুদ্রে খেলা করছে অন্তত দুশো ধরনের মাছ, চিংড়ি মাছ, হাঙর, বড় বড় কচ্ছপ, ঝিনুক, কড়ি। কোনো কোনো ঝিনুকের বুকে মুক্তো লুকোনো আছে।

ভারত মহাসাগরে বিষুবরেখার ৫ ডিগ্রি এপাশে আর ওপাশে টুনা-মাছের সুন্দর বিচরণ ক্ষেত্র। তার মানে নিকোবারের নাকের তলায় টুনাদের রঙ্গ-জলভূমি। তিনরকমের টুনা—স্কিপ জ্যাক, ইওলো ফিন আর বিগআই। বঁড়শিতে যে মাছ পড়ে সেই হিসেব থেকেই বলা হয়েছে, ডিসেম্বর আর জানুয়ারির মধ্যেই ২৫০০০ টন টুনা মাছ ব্যবস্থা থাকলেই ধরা সম্ভব। টুনা ছাড়াও টুনার মত অন্যান্য মাছ আছে। আছে সার্ডিন, ম্যাকারেল, শেলফিশ, শোর্ডফিশ। গণ্ডাকতক হাঙর আছে—টাইগার, উল্‌ফ, হ্যামারহেড। লোভনীয় চিংড়ির ছড়াছড়ি—চাররকম গলদা, দুরকম বাগদা। সেণ্ট্রাল

মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের ডিরেকটার ডঃ ই জি সিলাস সম্প্রতি নতুন ধরনের চিংড়ির খোঁজ পেয়েছেন আন্দামানের জলে। বর্তমান চিফ কমিশানার এস এম কৃষ্ণার্তীর নামানুসারে নাম রেখেছেন—মেটাপেনেইআস কৃষ্ণার্তী। কৃষ্ণার্তী এখন জলে খেলা করছেন, বড় বড় দাড়া নিয়ে, এরপর চালান হবেন বিদেশে—ফ্রায়েডপ্রন, প্রনপাকোড়া উইথ জার্মান বিয়ার কিম্বা স্কচ হুইস্কি।

টন টন মাছ আছে, মেছো অফিসারের ছড়াছড়ি—ডেপুটি সেক্রেটারি ফিশারিজ, ডেপুটি কমিশনার, ডিরেক্টার, ইণ্টেগরেটেড ফিশারিজ প্রোজেক্ট, ডিরেক্টার প্রি-ইনভেস্টমেণ্ট সার্ভে অফ ফিশিং হারবারস, রিসার্চ অফিসারস। দুটো ট্রলার পড়ে আছে অকেজো হয়ে। ঢাউস একটা পরিকল্পনা কমিশনারের দপ্তরে পোকায় কাটছে। কনফারেনসে ঘুরছে চারটে পরিকল্পনা—গ্রেট নিকোবারের চারপাশে টুনা আর টুনাজাতীয় মাছ ধরার ব্যবস্থা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চারপাশে হাঙর আর পার্চফিশারি, প্রন আর লবস্টার, অন্যান্য যেমন সামুদ্রিক ঝিনুক, বিচডেমার, কড়ি ইত্যাদি।

সব আছে, নেই কেবল মাছ ধরার লোক। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে 'আরকি-পেলাগো'র এখন লোকসংখ্যা এক লাখ পনের হাজার। এদের মধ্যে জাত-জেলে কেউ নেই। মাছের গতিবিধি বোঝেন একমাত্র সরকারী বিশারদরা। নিকোবারের নিকোবারিজরাই একমাত্র ভরসা। সাতশো কি সাড়ে সাতশো অধিবাসীর মাছটাছ ধরার একটু জ্ঞানগম্মি আছে। যা করছে তারাই করছে। এদিকে সুদূর তাইওয়ান থেকে বিদেশী জেলেরা রাতের অন্ধকারে মাছ-ধরা জাহাজে এসে আমাদের এই সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফাঁক করে দিলে। গত ষোল বছরে ৪৮টা দস্যু-জাহাজ আন্দামান সমুদ্রে ধরা পড়েছে।

এই শ-সাতেক মাছ ধরিয়ে মানুষ গত পাঁচ বছরে যা করেছে তার একটা হিসেব নিলেই বোঝা যাবে সমুদ্র সম্পদের সিকির সিকিও উদ্ধার করার চেষ্টা হয় নি। '৭২ সালে ৭৮০ টন মাছ ধরা পড়েছিল, মূল্য প্রায় বিশ লক্ষ টাকা। '৭৩ সালের 'ক্যাচ' ৮৫৪ টন, মূল্য প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা। '৭৪-এ ৯২০ টন, মূল্য ২৮ লক্ষ টাকা। '৭৫ সালে ১১০৩ টন, মূল্য ৩৩ লক্ষ টাকা। '৭৬ সালে, ১৩৩৮ টন, মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা। ঝিনুক বেচে বছরের আয় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। মুক্তোর কথা ছেড়েই না হয় দিলুম। লাখ লাখ টাকা জলে খলবল করছে। অন্য দেশ হলে বড়কর্তাদের ঘুম চটকে যেত। আন্দামানের ঘুম কিন্তু ভাঙে না। সবই স্বপ্নে। বাস্তবে শুধু পেপারস, ফাইলস, মিটিংস, কমিটিস, একসপার্টস

অ্যাণ্ড অফিসারস।
প্রদ্যোতবাবু বসে বসেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। একঘেঁয়ে জল আর জল। ইঞ্জিনের একটানা শব্দ। সবুজ চরিত্রহীন আকাশের তলপেট। ছবিটবি তুলুন কিছু। প্রদ্যোতবাবু করুণ হেসে বললেন—এখানে ছবি নেই। এ যেন কাপড়ের কল। হনহন করে সমুদ্র পেছনে হেঁটে চলেছে। এদিকে সুরমাই আর কোকারির বারোটা বেজে গেল। কাটাকুটি করে, নুন মাখিয়ে নিচের ডেকের তেরপলের ছাদে রোদে শুকোতে দিয়ে গেছে। আঁষটে গন্ধ আসছে। ওই দিকেই একটা ছোটো চিমনি, বিকট শব্দে ডিজেলের ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করেছে। রোদের ঝিমঝিম তাপও এবার মালুম হচ্ছে। ডেকে আর বসা চলে না। নিদ্রাতুর প্রদ্যোতবাবুকে চেয়ার থেকে তুলে খাবার ঘরে যাওয়াই ভাল। সমুদ্রের হাওয়ায় কলকাতার পোড়খাওয়া পেটেও খিদে চনচন করছে। টাল খেতে খেতে খাবার ঘরে আসা গেল। জাহাজে হাঁটাচলারও একটা কায়দা আছে। বেকায়দা হলেই রেলিং টপকে জলে। সাইকেল চালাতে জানলে ব্যালেনসটা মনে হয় থাকে।
খাবার টেবিলে প্লেট পড়েছে। একটা দুটো খাদ্যবস্তুও চোখে পড়ছে। মজার একটা কথোপকথন কানে এল। সাপ্তাহিক হিন্দুস্থানের অলোক মেহেতার ফর্সা মুখে লাল লাল হামের মত কি বেরিয়েছে। অলোক বলছেন, কলকাতার সরকারী অতিথিনিবাসের মশা মুখটা দাগারাজি করে দিয়েছে! সারা রাত মশার কামড়, অনিদ্রা, হরিব্‌ল! ব্র্যাণ্ডো একগাল হেসে বললেন—আমার কোনো অসুবিধে হয় নি। আই হ্যাভ এ ফাইন নেট। কী চমৎকার ঘুম! স্বপ্ন, স্বপ্নও দেখলাম। ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো, বিউটিফুল ড্রিমস!
আমরা সকলেই প্রায় থ' হয়ে গেলুম। এ রকম নিষ্ঠাবান স্বার্থপর খুব কম দেখা যায়।
জাহাজী খানা শেষ হল। শেষ পাতে আবার আনারস। প্রচুর আনারস ফলছে এই দ্বীপে। ছোট একটা কারখানাও হয়েছে—মহিলা পরিচালিত। বোতলে ভরা আনারসের রস খুব সস্তা।
তিনটে বাজার কিছু আগেই আমরা নীল দ্বীপে পৌঁছে গেলুম। এখানে একটা জেটিও আছে। জাহাজ জেটির গায়ে ভিড়ল। আন্দামান সমুদ্রের মজাই হল—গভীরতা। আসলে পুরো দ্বীপটাই তো জলের তলায় বসে যাওয়া পর্বতশৃঙ্গ। ডাঙা মানেই খাড়াখাড়া পাহাড়ের চুড়ো। তীরে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছেন।

বাঁপাশে ঘোড়ার খুরের মত সাদা সমুদ্রবেলায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বিশাল একটা গর্জন গাছ। শিকড় দেখে অবাক হতে হয়। মাটির ওপর গর্জনের দাঁড়িয়ে থাকাটা বড়ই অপলকা। হাত দুয়েকের বেশি শিকড় নামাতে পারে কিনা সন্দেহ! তবু কী বিশাল! দুটো মৌসুমী ধাক্কা সামলাতে হয়। যখন একেবারেই অপারগ তখন এইভাবেই শয়ন।

ডানদিকের তটভূমি ধনুকের মত ঢুকে গেছে ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে। শিকড়ের স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করানো সারি সারি গাছ। তলা দিয়ে জল চলে গেছে। দ্বীপের রক্ষিবাহিনী। শিকড়ের জাল দিয়ে ভূমিক্ষয় আটকে রেখেছে। ম্যানগ্রোভ সমুদ্রস্নান বড় ভালবাসে। সপরিবারে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। ছোট ছোট ডাল হাত পা নেড়ে, আমাদের ডাকছে, না বলছে তফাত যাও—বোঝা মুশকিল।

বিশাল একটা টিনের শেড তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাঁপাশ দিয়ে পথ চলে গেছে দূরে এঁকেবেঁকে। কিছুটা জায়গা কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া। কাঠের একটা গেট। দুদিকে দু হাত মেলে পড়ে আছে সেটলমেণ্ট। কোথাও কোন গোলমাল নেই। অতি শান্ত জনপদ। শেষ বেলার রোদে নেশাগ্রস্ত। গোটা কতক শীর্ণ কুকুর পায়ের ফাঁকে ন্যাজ গুটিয়ে একপাশে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আন্দামানের কুকুরের চেহারা বড় বিসদৃশ। বেশ তাগড়া জোয়ান কেলোভুলো ধরনের কুকুর চোখেই পড়েনি। সরু ছুঁচোলো মুখ। চোরের মত চোখের দৃষ্টি। কাছে গেলে সরে যায়। ডাকতেও যেন কষ্ট। ছুটতেও চায় না। দ্বীপের আলসেমি পেয়ে বসেছে।

পাখিও তেমন নেই। কোথায় তীরের কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে গাঙচিল উড়বে! মাছরাঙা ছোঁ মেরে আসবে! গাছের মাথায় ঝাঁঝাঁ করে উড়বে টিয়া। টিনের চালে বসে খাখা করে কাক ডাকবে! কোথায় কি! একটা পাখির কণ্ঠস্বরও কানে এল না। জজ সাহেব হাতুড়ি ঠুকে 'সাইলেনস' বলে সেই যে চলে গেছেন, সেই থেকে এজলাস স্তব্ধ! প্রাণী আছে প্রাণ নেই।

নীলের জেটিটা ভীতু মানুষকে ভয় দেখাবার জন্যেই যেন তৈরি। জলের ওপর দিয়ে কোয়ার্টার মাইল চলে ডাঙায় গিয়ে মিশেছে। খানিকটা আছে খানিকটা নেই। মাঝখানে কাঠ উড়ে গেছে। সারি সারি বিম। সার্কাসের খেলোয়াড়দের মত যে কোন একটা কাঠ ধরে এই পড়ি, এই পড়ি করতে করতে এগিয়ে যাওয়া। নিচের দিকে তাকালেই মাথা ঘুরে যায়। নিজের ভয়কে বোঝালুম—মনে কর তুমি

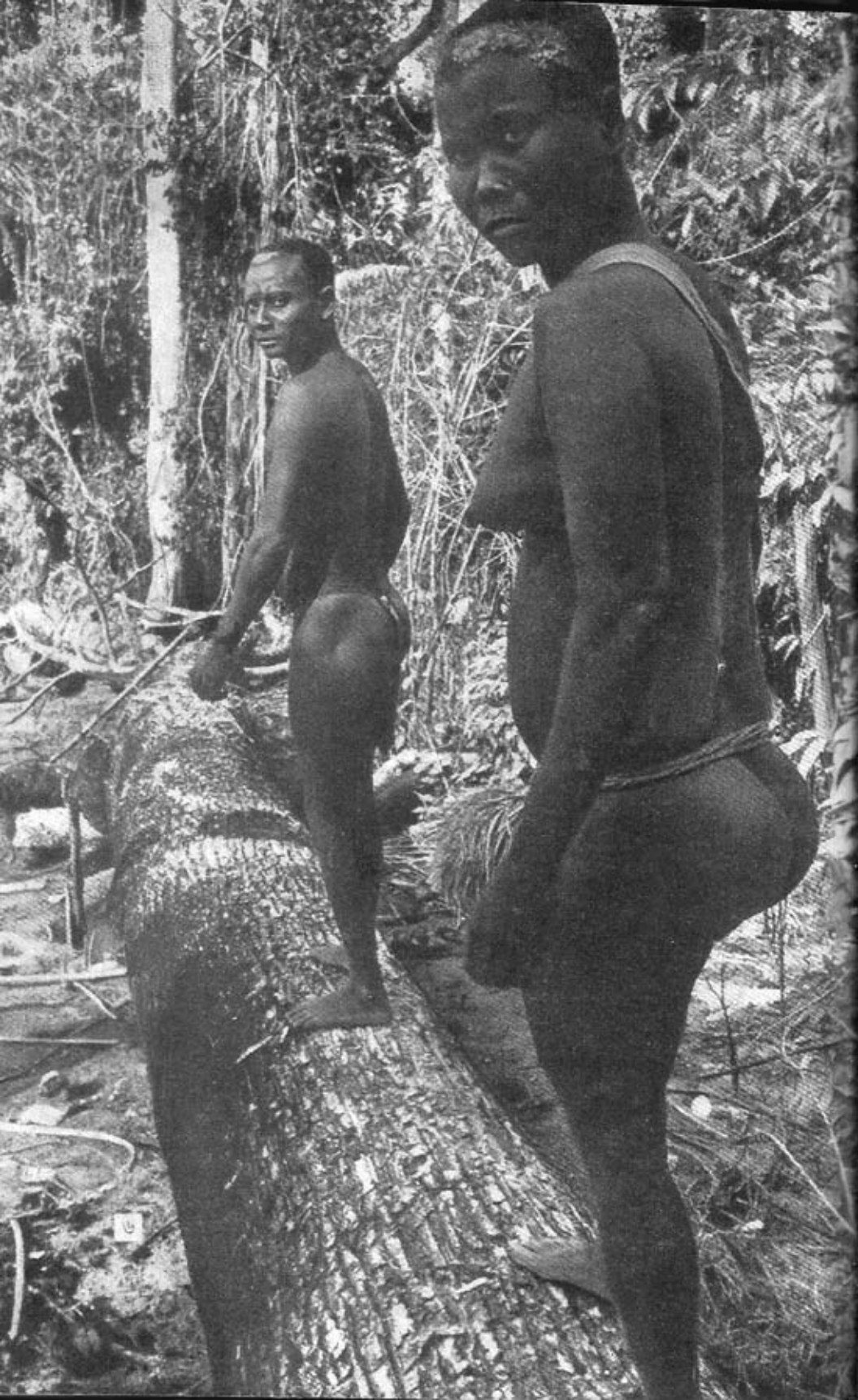

মরেই গেছ, ধরে নাও তুমি পড়েই গেছ। পড়ে গেলে কি হতে পারে! বিশ তিরিশ ফুট নিচে ঝপাং করে পড়বে। সাঁতার তো জানাই আছে। খাপুস খুপুস করে তীরে গিয়ে উঠবে। নিজেকে মেরে ফেলতেই ভয়টা একটু কমে গেল।

তীরে আসতেই হাসি হাসি মুখ একটি যুবক পরিষ্কার বাংলায় বললে—আসুন। স্মার্ট, স্বাস্থ্যবান, বড় বড় চুল। ব্যানলনের লাল গেঞ্জি, তলাফুলো প্যান্ট। রঙটা রোদে পুড়ে তামাটে। চমৎকার ইংরেজী বলে। নির্ভুল অ্যাকসেন্ট। নিশ্চয়ই দক্ষিণ কলকাতার ছেলে। আমার অনুমান নির্ভুল। চাকরির জন্যে কলকাতার জীবন ছেড়ে সস্ত্রীক এই দ্বীপে নির্বাসন। ছ-বছর হল। কৃষি উন্নয়ন অফিসার। নীল দ্বীপের কৃষির ভবিষ্যৎ এই ছেলেটির হাতে। কোনো দুঃখ নেই। জীবনকে মেনে নিয়েছে খেলোয়াড়ী ঢঙে।

প্রথম প্রশ্নই হল জেটিটা ওই রকম বিপজ্জনক হয়ে আছে কেন? উত্তরে জানা গেল '৭৬ সালের প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে সমুদ্র জেটিটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। দ্বীপের সিকি ভাগ গাছ উৎপাটিত। অর্ধেকেরও বেশি বাড়ি ভেঙে চুরমার। জেটি সারানোর কাজ চলেছে শম্বুক গতিতে।

জেটির ওপর দিয়ে টলমল করতে করতে পুরো দলটা এসে পড়েছে। প্রদ্যোতবাবুর দু কাঁধে দুটো ক্যামেরা ঝুলছে। আজ ছবি তুলে ফাঁক করে দেবেন। শ্রীমতী গোড়বোলে দলছাড়া হয়ে বাঁদিকের সমুদ্রতট ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন। চটি দুপাটি একপাশে উল্টে পড়ে আছে। ভদ্রমহিলা সমুদ্র ভীষণ ভালবাসেন। সরকারী কচকচানিতে কাবু হয়ে পড়েছেন।

দূর থেকে এতক্ষণ যে উঁচু গুদামের মত ঘরটা দেখছিলাম তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। সাইনবোর্ড ঝুলছে—এগ্রিকালচারাল প্রকিওরমেণ্ট সেণ্টার। দরজায় একটা বিশাল তালা। নীল হল আন্দামানের প্রধান কৃষি উৎপাদক অঞ্চল। প্রচুর সবজি জন্মায়। তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের এখানে বসান হয়েছে। সবাই কুমিল্লার মানুষ। প্রথমে উঠেছিলেন মানা ক্যাম্পে। মানা থেকে এখানে। মোট একশোটি পরিবার এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছেন। এই দ্বীপের বর্তমান লোকসংখ্যা—১৩৬৭। প্রতিটি পরিবারকে ৫ একর কৃষি জমি আর বসতবাটির জন্যে এক একর করে জমি দেওয়া হয়েছে। পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ—৭২২৫ টাকা, অনুদানের পরিমাণ—৪৫০ টাকা। একটা ডিসপেনসারি, একটি মাধ্যমিক ও একটি প্রাথমিক স্কুল, পোস্ট অফিস, সরবরাহ কেন্দ্র, পাওয়ার হাউস, তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র, সাধারণের ব্যবহারের জন্যে কূপ বসানো হয়েছে। ১০ একর জমির ওপর স্থাপন করা

মরেই গেছ, ধরে নাও তুমি পড়েই গেছ। পড়ে গেলে কি হতে পারে! বিশ তিরিশ ফুট নিচে ঝপাং করে পড়বে। সাঁতার তো জানাই আছে। খাপুস খুপুস করে তীরে গিয়ে উঠবে। নিজেকে মেরে ফেলতেই ভয়টা একটু কমে গেল।

তীরে আসতেই হাসি হাসি মুখ একটি যুবক পরিষ্কার বাংলায় বললে—আসুন।

স্মার্ট, স্বাস্থ্যবান, বড় বড় চুল। ব্যানলনের লাল গেঞ্জি, তলাফুলো প্যান্ট। রঙটা রোদে পুড়ে তামাটে। চমৎকার ইংরেজী বলে। নির্ভুল অ্যাকসেন্ট। নিশ্চয়ই দক্ষিণ কলকাতার ছেলে। আমার অনুমান নির্ভুল। চাকরির জন্যে কলকাতার জীবন ছেড়ে সস্ত্রীক এই দ্বীপে নির্বাসন। ছ-বছর হল। কৃষি উন্নয়ন অফিসার। নীল দ্বীপের কৃষির ভবিষ্যৎ এই ছেলেটির হাতে। কোনো দুঃখ নেই। জীবনকে মেনে নিয়েছে খেলোয়াড়ী ঢঙে।

প্রথম প্রশ্নই হল জেটিটা ওই রকম বিপজ্জনক হয়ে আছে কেন? উত্তরে জানা গেল '৭৬ সালের প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে সমুদ্র জেটিটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। দ্বীপের সিকি ভাগ গাছ উৎপাটিত। অর্ধেকেরও বেশি বাড়ি ভেঙে চুরমার। জেটি সারানোর কাজ চলেছে শম্বুক গতিতে।

জেটির ওপর দিয়ে টলমল করতে করতে পুরো দলটা এসে পড়েছে। প্রদ্যোতবাবুর দু কাঁধে দুটো ক্যামেরা ঝুলছে। আজ ছবি তুলে ফাঁক করে দেবেন। শ্রীমতী গোড়বোলে দলছাড়া হয়ে বাঁদিকের সমুদ্রতট ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন। চটি দুপাটি একপাশে উল্টে পড়ে আছে। ভদ্রমহিলা সমুদ্র ভীষণ ভালবাসেন। সরকারী কচকচানিতে কাবু হয়ে পড়েছেন।

দূর থেকে এতক্ষণ যে উঁচু গুদামের মত ঘরটা দেখছিলাম তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। সাইনবোর্ড ঝুলছে—এগ্রিকালচারাল প্রকিওরমেণ্ট সেণ্টার। দরজায় একটা বিশাল তালা। নীল হল আন্দামানের প্রধান কৃষি উৎপাদক অঞ্চল। প্রচুর সবজি জন্মায়। তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের এখানে বসান হয়েছে। সবাই কুমিল্লার মানুষ। প্রথমে উঠেছিলেন মানা ক্যাম্পে। মানা থেকে এখানে। মোট একশোটি পরিবার এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছেন। এই দ্বীপের বর্তমান লোকসংখ্যা—১৩৬৭। প্রতিটি পরিবারকে ৫ একর কৃষি জমি আর বসতবাটির জন্যে এক একর করে জমি দেওয়া হয়েছে। পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ—৭২২৫ টাকা, অনুদানের পরিমাণ—৪৫০ টাকা। একটা ডিসপেনসারি, একটি মাধ্যমিক ও একটি প্রাথমিক স্কুল, পোস্ট অফিস, সরবরাহ কেন্দ্র, পাওয়ার হাউস, তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র, সাধারণের ব্যবহারের জন্যে কূপ বসানো হয়েছে। ১০ একর জমির ওপর স্থাপন করা

হয়েছে—সয়েল কনজারভেসান রিসার্চ কাম ডিমনস্ট্রেশান ফার্ম।
আমরা দাঁড়িয়েছি সেই কৃষি সরবরাহ কেন্দ্রের সামনে। সরকারই ক্রেতা আবার বিক্রেতাও। শাকসবজি কেনেন, দ্বীপবাসীদের বিক্রি করেন, অন্যান্য দ্বীপে চালান দেন। মেনল্যাণ্ড থেকে আনান সেই সব জিনিস যা এই দ্বীপে উৎপন্ন হয় না কিন্তু দ্বীপবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে লাগে।
এইবার শুরু হল শুটিং। ডিরেকটার, দিল্লির মার্লোন ব্র্যাণ্ডো। ক্যামেরায় প্রদ্যোত-কুমার। অংশ গ্রহণে চারজন নাম-না-জানা অভিনেতা। সহ-পরিচালক সিসির অফিসের সেই সবজান্তা বাবা। আমরা হুজুকে দর্শক মাত্র।
দৃশ্য পরিকল্পনাটা এই রকম : একটি লোক তালা খুলছে। উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি জমায়েত। বিতরণ কেন্দ্র খোলা হলেই তারা যেন নানারকম জিনিসপত্র পাবে। দিল্লির সেই অফিসার নির্দেশ দিচ্ছেন—রেডি ক্যামেরা। প্রদ্যোতবাবু সব সময়েই প্রস্তুত। সারা জীবন এই ধরনের কত প্রহসনের ছবি তুললেন। কত তুলবেন! যে লোকটি তালা খুলছিল, সে বারে বারে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ফেলছিল। তেমন পাকা অভিনেতা নয়। ডিরেকটর ধমকে উঠলেন, একদম তাকাবে না। তাকালেই চাকরি চলে যাবে। পাশ থেকে একজন বলে উঠল—ও চাকরি করে না সাহেব।
—কেয়া বোলা!
সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী তর্জমা হয়ে গেল। মুখ দেখে মনে হল ভদ্রলোক খুব বিপদে পড়েছেন। যে সরকারী চাকরি করে না তাকে আর কি সাজা দিতে পারেন। জমি কেড়ে নেবেন, কি ঋণ বন্ধ করে দেবেন সে ক্ষমতাও নেই। ও তো রাঁচী স্যার!
—সে আবার কি!
আবার ব্যাখ্যা। এই দ্বীপে যারা কায়িক পরিশ্রম করে তারাই রাঁচী। ইংরেজ আমল থেকেই শক্ত শক্ত কাজের জন্যে অন্য কোনো জায়গার লোক পাওয়া যেত না। মজুর আসত রাঁচী থেকে। এখনও সেই একই ধারা চলছে।
বকুনি খেয়ে লোকটি খানিকটা ধাতে এসেছে। সে আর ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছে না। এইবার দ্বিতীয় নির্দেশ, তালা খুলবে, কিন্তু দরাজাটা হাট করে খুলবে না। তাহলে সত্য বেরিয়ে আসবে। ঘরতো খালি। শূন্য বিতরণ কেন্দ্র—ফককা ফাঁক। ক্লিপ, ক্লিপ ছবি উঠল গাদাখানেক। ওপরের সাইন বোর্ড থেকে ক্যামেরা প্যান করে নিচের দিকে নেমে আসছে।
ওদিকে শ্রীমতী গোড়বোলে হাঁটু জলে নেমে গেছেন। সমুদ্র সম্মোহন করে গভীরের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। ওরে ওকে বাঁচা। জীবিত অবস্থায় পুনায় ফেরত

পাঠাতে হবে যে। দিদিমণি আর নামবেন না। তিন রকমের হাঙর—হ্যামার হেড, উলফ, পালিয়ে আসুন। পালিয়ে আসুন।

দলবল সামনে এগিয়ে চলেছে। এ যেন আর এক আফ্রিকা। চারপাশে জঙ্গল। মাঝখানে সমুদ্র ঘেঁষে জনবসতি, চাষবাস। সোজা রাস্তা। প্রথম দিকে, দুপাশে সারি সারি কাঠের বাড়িতে সরকারী অফিস, থানা, ডিসপেনসারি, ওয়্যারলেস স্টেশান, কৃষি, তথ্যকেন্দ্র। বোগেনভ্যালিয়ায় চারদিক লালে লাল।

এর পরই সেটলমেণ্ট। চণ্ডীমণ্ডপ, বাজার, সার সার দোকান, খেলার মাঠ। দরজায় দরজায় উৎসুক মহিলাদের মুখ। মজা দেখছেন। এই রকম উৎপাত তাঁদের জীবনে মাঝে মাঝেই আসে। অভ্যস্ত, গা-সওয়া ব্যাপার। শিশুদের কৌতূহলই বেশি। পাশে পাশে, দূরে দূরে ঘুরছে। ভাল ভাল জামা কাপড় পরা এই লালু লালু পর্যাপ্ত ভোজী জীবগুলো পরিবেশে বড় বেমানান। একটি শিশুকে ধরে ফেললুম। শরীরে মেদের বড়ই অভাব। প্রোটিনের অভাবে ভুগছে। প্রাচুর্যের মধ্যে কেন এই দারিদ্র! কার অপরাধ। নামটা ভারি আধুনিক, প্রসূন। প্রাথমিক স্কুলে পড়ে। খেলাধুলো করে না। ভাল লাগে না। কেমন যেন প্রবীণ প্রবীণ ভাব।

একটা ছবি তোলার ইচ্ছে হচ্ছিল। ছেলেটিকে বলব—তুমি একটু হাস, পোকা লাগা দাঁত বের করে। প্রদ্যোতবাবু ঝট করে ক্যামেরায় দৃশ্যটা ধরে নিন। ক্যাপশন হবে—সুখের শৈশব। ছেলেটি হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে, চা, পান, মিষ্টির দোকানের সামনে এসে পড়েছি। নীল দ্বীপের বাজার অঞ্চল। সব রকম দোকানই আছে। শখানেক শরণার্থী পরিবার, কিছু সরকারী কর্মচারী, কিছু ব্যবসায়ী, কিছু রাঁচী, এই এক মুঠো জনসংখ্যার জন্যে যে রকম বাজার হওয়া উচিত তার চেয়ে বড় নয়। দরজির দোকান, মুদিখানা, সাইকেল মেরামতের ব্যবস্থা। মিষ্টির দোকানে বেশ বড় বড় রসগোল্লা, রসে হাবুডুবু খাচ্ছে। মালিক হুগলী জেলার লোক। গলায় তুলসীর মালা।

আন্দামানের পান সুবিখ্যাত। পাতলা, মুচমুচে, ছোটো ছোটো, মিঠে সবুজ রসে সরস। খেতেই হবে। গোবিন্দবাবুর মিঠে পান, খিলি খিলি উড়ে গেল। কৃষি অফিসার সেই সদা খুশি তরুণ বললেন, আপনাদের জন্যে আমার অফিসে একটা মিটিং ডেকেছি। দ্বীপের সবাই আসবে। আপনাদের কিছু জিগ্যেস-টিগ্যেস করার থাকলে করবেন। তার আগে চলুন, চট করে আমরা কয়েকটা বড় কৃষকের ঘর দেখে আসি।

—উসমে ক্যা দেখনে হায় ভাই!

হিন্দীওলাদের বাঙালী-বিদ্বেষ খুবই প্রকট। বাঙালী আবার মানুষ! তাদের আবার

দেখতে হবে! তাদের কথা শুনতে হবে। আমরা কি তেমন বুড়বাক!
—চলো ভাই, স্কুল দেখাও।
শ্রীমতী গোড়বোলে কানে কানে বললেন, চাটুয্যে ওদের যেতে দিন। আমরা পেছন পেছন ল্যাংবোটের মত যাব না। আমরা যাবো যে কোনো একজন বাঙালীর বাড়িতে। দেখব, কিভাবে তারা আছে! কেমন তাদের ঘরসংসার!
ইনভেডরের দল ডান দিকে চলে গেল। আমরা দুজন ছ্যাঁচাবেড়া খুলে একটি বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালুম। সেই লাউ মাচা, গোয়ালঘর, প্রশস্ত উঠান, চারপাশে টিনের ঘর, তুলসীতলা, অযত্নে বেড়ে ওঠা ফুল গাছ। একটা বাচ্চা ছেলে তারস্বরে কাঁদছিল, রেগে মাঝে মাঝে পা ছুঁড়ছিল। আমাদের সম্মানে সে তার বায়নাটা তখনকার মত স্থগিত রাখল, তুলে রাখল। মহিলারা একটু দূরে দূরে সরে গেলেন, হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, যুবকও নয় বৃদ্ধও নয় এমন একজন মানুষ। পরনে 'ন হাতি' ধুতি, খোলা গা। অপ্রশস্ত বুকের ওপর আড়াআড়ি প্রশস্ত স্বাস্থ্যবান পৈতে।
আসেন, আসেন, কী ভাইগ্য।
তিন ভাইয়ের জমজমাট সংসার। ভট্টাচার্য পরিবার। বড় অমূল্য, মেজো পরিতোষ, ছোট যীশুতোষ। সামনে দাঁড়িয়ে পরিতোষবাবু। অমূল্যবাবু অন্য কোথাও ব্যস্ত। যীশুতোষ ছাত্র। পরিতোষবাবু বয়সের তুলনায় ছেলেমানুষ। সাদাসিধে। কিসের একটা অপ্রাকৃত আনন্দে মশগুল। সমুদ্র বিশাল আর অনন্ত হলেও সমুদ্রের ধারের মানুষ শুনেছি একটু উগ্র প্রকৃতির হয়। পরিতোষ কিন্তু একেবারেই বিপরীত স্বভাবের। পরিতোষের পেছনেই ছোট একটা টিনের ঘর। দরজা খোলা। ছোট্ট একটা টেবিলের ওপর পরিপাটি করে বইপত্তর সাজানো। ঘরের কথা থেকেই যীশুতোষের কথা এল। ওটা যীশুতোষের তপোবন। যে ছেলে নিজের বইপত্তর এত সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে পারে, তাকে চোখে না দেখলেও তার স্বভাব আন্দাজ করা যায়। অষ্টম শ্রেণীতে যীশু পড়ে। ভীষণ ভাল ছেলে। প্রতিবার সে প্রথম হয়ে ক্লাসে ওঠে। ইংরেজী আর অঙ্কে সব চেয়ে বেশি নম্বর পায়। এই দ্বীপে অষ্টম শ্রেণীর পর আর পড়ার ব্যবস্থা নেই। এরপর উঁচু ক্লাসে পড়তে হলে তাকে যেতে হবে পোর্টব্লেয়ারে। অনেক খরচের ধাক্কা! যীশুর ঘরে বসে আছি, পরিতোষ গেলেন জামা গায়ে দিতে। কাঠের চৌকির ওপর কাঁথার বিছানা। একটা আধময়লা জামা ঝুলছে দেয়ালে। পরিতোষরা কৃষক হিসেবে এই দ্বীপে আসেননি। এসেছেন সরকারী আমন্ত্রণে পুরোহিত হয়ে। পুরোহিত ছাড়া বাঙালীর চলে কি করে! বিশপ ছাড়া খ্রীষ্টানের চলে না, মৌলবী ছাড়া মুসলমানের চলে না।

॥ ৫ ॥

পরিতোষের বাবা ছিলেন কুমিল্লার বড় পণ্ডিত। দেশ বিভাগের পর কলকাতা। সেখান থেকে মানা। মানা থেকে এখানে। পরিতোষ এসেছেন সব শেষে ৭৩ সালে। আসার আগে পর্যন্ত কলকাতার এক ছাপাখানায় পরিতোষ ছিলেন কমপোজিটার। কমপোজিটার থেকে এখন আচার্য। দাদা অমূল্য অবশ্য এখানে চাষবাস করেন। সেই হিসেবে জায়গাজমিও পেয়েছেন।

পরিবারের সকলেরই চেহারায় তেমন স্বাস্থ্য নেই। পরিতোষ বললেন, থাকবে কি করে। সকলেই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। কোঁকোঁ করে জ্বর আসে। কুইনিনেও আর বাগ মানছে না। উঠোনের পাশে একটা আটচালায় পর্বতপ্রমাণ লাউ আর কুমড়ো। এত মাল যাবে কোথায়! খাবে কে! পরিতোষ বললেন—সরকারী স্বব্যবস্থায় এই অবস্থা। আজ এক মাস হয়ে গেল লেখালেখি করেও পোর্টব্লেয়ার থেকে কোনো জাহাজ আসেনি। প্রায়ই এই রকম্ হয়। এর পর সব ফেলে দিতে হবে সাগরের জলে। শুনে মনে হল এই ধরনের একটা হেড লাইন মন্দ হবে না:

নীলের ফসল সাগরের জলে। সমুদ্র-পুজোর পাকাপাকি আয়োজন। দেবোত্তর করা জমিতে সমুদ্র-দাস, ভক্ত কৃষক। প্রকৃতিতে, নিস্বার্থ প্রকৃতি-পুজো। এখানে পথের ধারে সবজি পচছে। ওদিকে পোর্টব্লেয়ারে আড়তদারদের মুখে স্বর্গীয় হাসি। ইয়া মোটা বোগড়া চাল ২ টাকা ৬০ পয়সা কেজি। বাসমতী ৬ টাকা। মুরগীর ডিম ৬০ পয়সা, হাঁস ৭০ পয়সা। পাঁঠার মাংস ১২ টাকা, মুরগীর মাংস ১৩ টাকা, শূকর ৯ টাকা, হরিণ ৮ টাকা, গরু ৫ টাকা। মাছ তুলনায় কম দাম। চিংড়ি ৫ টাকা। অন্যান্য মাছ ৩ থেকে ৫ টাকার মধ্যে। টোম্যাটো ৪ টাকা ৫০ পয়সা। বাঁধাও ওই এক দাম। ফুল কপি ৭ টাকা কেজি। আলু ১ টাকা ৬০ পয়সা। পেঁয়াজ ১ টাকা ৪০ পয়সা। ঢেঁড়স ১ টাকা ৩০ পয়সা থেকে ৫০ পয়সা। আনারস ৮০ পয়সা কেজি। টকটকে লাল কলা, ১ টাকা থেকে ৩ টাকা কেজি। ডাঁটা ১ টাকা ৫৫ পয়সা কেজি। কোথায় গেলেন আন্দামান প্রশাসকের সেই বাক্যবাগীশ মহাবীর।

একটা প্যান্ট সেলাই করার মজুরী ৩০ টাকা। জামার ৭ টাকা ৫০ পয়সা। ব্লাউজের ৫ টাকা। বেসরকারী স্কুলের মাইনে ২০ টাকা। বাস ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ৫ পয়সা। বিদ্যুৎ ৫০ পয়সা প্রতি কিলোওয়াট আওয়ার। জল প্রতিদিন আধ ঘণ্টা

করে সরবরাহের জন্য মাসিক খরচ ৬ টাকা ৭৫ পয়সা।
জীবন ধারণের সব খরচই বড় চড়া পর্দায় বাঁধা। পরিতোষবাবুর মুখের হাসি তাই কি এত বেপরোয়া। জীবনের জ্বালা ভুলে থাকার জন্যেই কি ক্রমশ শিশুর মত হয়ে যাচ্ছেন। প্রতি মুহূর্তে একটা করে বিস্ময় খুঁজে নিচ্ছেন। রসগোল্লা দেখেছেন! কী বড় বড়! রাত্তির বেলায় এই এত বড় একটা কড়ায় অক্ষয়দা যখন রসে ফোটায়, সে এক দেখার জিনিস! কড়াটা আসার সময় অক্ষয়দা কলকাতা থেকে কিনে এনেছে। অত বড় কড়া! জাহাজ ডুবে গেলেও ওই কড়ায় চেপে অক্ষয়দা চলে আসতে পারত! কি বলেন! পরিতোষের প্রাণখোলা হাসি। খান না একটা রসগোল্লা।
—এই মাত্র একপেট খেয়ে আসছি ভাই। আর একদিন খাব।
—আর কবে আসবেন! আর কি আসবেন আপনি! এই এলেন যখন দুটো রসগোল্লা খেতেই হবে।
—আচ্ছা পেটটা একটু কমে যাক। সন্ধের দিকে খাব। রাত এগারোটার আগে তো নড়ছি না এখান থেকে।
—ঠিক বলছেন!
পরিতোষকে কথায় কথায় পরিতুষ্ট করতে করতে কৃষি দপ্তরের বারান্দায় এসে উঠেছি। উল্টোদিকে পুলিস স্টেশন। তার পেছনে ঢেউভাঙা সমুদ্র। দলের আর সব কোথায় জানি না। ঘরদোর সব হাট করে খোলা। এখানে চোর ডাকাত নেই। এখানেই হবে সেই বিকেলের মিটিং। বাইরের বেঞ্চিতে বসে বসে পরিতোষের বকবকানি শুনছি।
—সাপের বাবা বুঝলেন।
—কে সাপের বাবা!
—এই যে ছাখেন—এই এক হাত লম্বা। গাটা চকচক, চকচক করে। পা আছে। দাদাকে একবার কামড়েছিল। উঃ দুদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল। দুদিন। বেঁচে গেল। বাচ্চাদের কামড়ালে—সিওর ড্যাথ।
—ছাখেন এই এত বড়। লাল যেন চুলার আগুন।
—সেটা আবার কী!
—বাগান-কাটা কাঁইচি দ্যাখসেন। মুখের দুপাশে দুটো। ধরলে রক্ষা নাই।
—ব্যাপারটা কী!
—কাঁকড়া। লালও হয় আবার নীলও হয়। নীল কাঁকড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাবেন না। ওই কাঁকড়া আপনাকে খেয়ে ফেলতে পারে।

—দেখেছেন আপনি !

পরিতোষের মুখে শিশুর মত হাসি। দেখেছে সে। নারকেল গাছের মাথায় বসে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নারকেল খেতে দেখেছে।

—আর দ্যাখেন।

দেখতে হল তাকিয়ে। না তাকালে পরিতোষের দেখার জগৎ ছোটো হয়ে যাবে।

—দ্যাখেন, এই এত বড়, এই এত বড়।

দুটো হাতে কুলোচ্ছে না। এত বড় ! পরিতোষকে উঠে দাঁড়াতে হল। পা মেপে মেপে দেখাল। বারান্দার এ-পাশ থেকে ও-পাশ।

—ভেসে এল সেদিন। ওই পাহাড়ের ধারে।

—পাহাড় আছে নাকি !

—ওই তো সমুদ্রের বাঁক ঘুরলেই ছোটো মত পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে এসে আটকাল। মরা।

—জিনিসটা কি !

—মাছ। প্রকাণ্ড মাছ। সাতদিন ধরে কুড়ুল দিয়ে কেটে কেটে সবাই নিয়ে গেল। কী মাছ রে বাবা। নিশ্চয়ই সেই ওলডম্যান অ্যাণ্ড দি সির মাছ !

আরও কোনো বিস্ময়কর ব্যাপারের কথা হয় তো পরিতোষের স্টকে ছিল ; কিন্তু শোনার সুযোগ পাওয়া গেল না। এই বিশাল চেহারার এক মহিলা এলেন। বিধবা কিন্তু বৃদ্ধা নন। কুচকুচে কাল রঙ। তেল চুক-চুক চুলে টান টান খোঁপা। ফের্তা দিয়ে পরা থান-ধুতি। আধুনিক কাটের ব্লাউজ। কালো গ্র্যানাইটের মত বুকের ওপর সরু সোনার হার চিক চিক করছে। এক হাতের ওপর বাহুতে সোনার তাগা আর একহাতে লাল সুতোয় বাঁধা মাদুলি। মুখে পান। হাতে ধরা পানের বোঁটায় চুন। ভদ্রমহিলা বেশ দাপটের সঙ্গে কমপাউণ্ডে প্রবেশ করে পরিতোষকে প্রায় ধমকে উঠলেন,

—সময়ের দাম নাই।

পরিতোষের হাসির ভোল্টেজ একটু কমে গেল, বললে—তা একটু আছে।

লাল জিভ বের করে টুক করে একটু চুন ছুঁইয়ে বললেন,—একটু কী ! একটু কী ! মণির মার সময়ের পুরা দাম আছে। জিগাও সবাইরে।

ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, জোয়ানমত একজন লোক যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক,

—অধর, অধর।

অধর থমকে দাঁড়াল। তারপর কাছাকাছি এগিয়ে এল বেশ একটু ভয়ে ভয়ে।
—কি কও?
—মিটিং হওনের সময় কডা কইছিল?
—চারটা টারটা হইব।
—অহন কয়ডা?
—ঘড়ি দেহি নাই।
মণির মার এইবার আমার দিকে নজর পড়ল। ঈষৎ হলদেটে চোখে কি ভাব খেলছে!
—ঘড়িডা ছাহেন তো মশয়।
—পাঁচটা দশ।
মণির মা ফেটে পড়লেন। প্রথমে হল সরকারের বাপান্ত। তারপর হল সেই অদৃশ্য মানুষটির, যে বলেছিল তিনটের সময় মিটিং হবে। এই নিয়ে মণির মার তৃতীয় বার আগমন। মিটিঙের মুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে মণির মা দুম দুম করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আরো তিনজন মহিলা এসে গেলেন। সধবা কমলালেবু রঙের শাড়ি। মনে হয় শান্তশিষ্ট। এঁরা খবর এনেছেন, মিটিন হবে। হবেই হবে। তবে একটু বিলম্বে। সায়েবরা ওদিকপানে গেছেন।
সত্যিই মিটিং হল। দিল্লির সেই প্রভুকে সবাই মন্ত্রী ভেবেছেন, ভেবেছেন ক্ষমতার মোড়ক এনেছেন। অনেক সমস্যা। এইবার বুঝি সব চাওয়া ইনি হাত ঝাড়লেই পাওয়া হয়ে দাঁড়াবে। ঘর ভরে গেছে। বয়স্ক মানুষের দল। শক্ত শরীরের গঠন। রোদে তামা পোড়া। জীবনের সঙ্গে লড়াই চলেছে। সকলেরই গলায় কণ্ঠী। বৈষ্ণবের সংখ্যাই বেশি। শাক্ত বোধ হয় নেই।

প্রথমেই একজন তেরিয়া হয়ে উঠলেন—টাকা কই! কোথায় সেই টাকা! গুপ্তধন বা লটারি নয়। '৭৬ সালের ঝড়ে দ্বীপ ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় চিফ কমিশনার এসে দরাজ গলায় বলে গিয়েছিলেন—ভাঙাবাড়ি খাড়া করার জন্যে টাকা দেওয়া হবে। বছর ঘুরে গেল টাকা রয়ে গেল ফাইলে। সঙ্গে সঙ্গে আর এক তোপ—দ্বীপে সরকারীভাবে একশ পরিবার জায়গাজমি পেয়ে চাষবাস করছেন, ওদিকে দেড়শো পরিবার বেআইনীভাবে জঙ্গল সাফ করে বসে গেছে। প্রথমে সরকার বলেছিলেন, জমি হিসেব করে দেখে তাদের আইনী করা হবে। সাত বছর হয়ে গেল তাদের ভাগ্য আজও নির্ধারিত হল না। কেন হল না। দ্বীপে কি কম জায়গা আছে! জবাব চাই, জবাব চাই।

পাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রায় ভেঙচি কাটার গলায় বললেন—চাষ কর, চাষ কর। ধার শোধ কর ঠিক সময়ে। এদিকে জলের কি করছেন, মশাইরা। চাষের জন্যে মিষ্টি জল কোথায়। নোনা জলে চাষ হয় বড়দা!

দিল্লীশ্বর বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন সভাসদ নিয়ে। এইবার বড় ফাঁপরে পড়েছেন। এতো চিকেনের ঠ্যাং চিবোনো নয়। গরম গরম সব অভিযোগ। এইবার আর এক প্রশ্ন—ফসল ফলিয়ে হবেটা কি! এখানে খাবার লোক নেই। পথের পাশে ঢেঁড়স, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙ্গে পচে যাচ্ছে। তিনের চার জলে যাচ্ছে। জাহাজ আসে না। চালান যায় না।

কেয়া তাজ্জব পরিকল্পনা!

—ম্যালেরিয়ার কি করছেন? ডাক্তার কোথায়?

—গত সাতদিন দ্বীপে একছিটে তেল নেই, নুনও নেই। মেনল্যাণ্ড থেকে সাপ্লাই আসেনি। প্রদ্যোতবাবু একটু আগে সাপ্লাই সেণ্টারের একগাদা ছবি তুলেছেন। লাউ দোলাদোল মাচার ছবি তুলেছেন। সম্পন্ন নীল দ্বীপের নানা ছবি। যে ছবিতে সেই সব ছবি নেই—শিশু জ্বরে বেহুঁশ। মা বসে আছে মাথার কাছে, কপালে জলের পটি। মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মত মাটি খুঁড়ে বিন্দু বিন্দু জল শুষে নিচ্ছে। ডাঁই করা ফসল—উৎপানের ছবি নয়, সংযোগহীন দ্বীপে মানুষের শ্রমের, অর্থের অপচয়ের, সরকারী অব্যবস্থার ছবি।

দিল্লীশ্বর বললেন—ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়। সব কুছ হো যায়েগা। এখন তোমাদের সারাদিনের কথা বল। সকাল থেকে সন্ধের জীবন! এ বলে তুমি বল, ও বলে তুমি বল। নিবারণ তুমিই বল। তুমি বেশ বলিয়ে কইয়ে।

পাঞ্জাবি পরা, কণ্ঠীধারী, ভব্যসভ্য একজন মানুষ সামনে এগিয়ে এসে মাটিতে থেবড়ে বসে পড়লেন। বিবর্ণ একটি ছাতা পাশে শোয়ানো হল। দু হাঁটুর ওপর দুটো হাত। একবার কেশে নিয়েই গড়গড় করে বলতে লাগলেন:

ভোর পাঁচটায় উঠে পায়খানা করি। তারপর হাতমুখ ধুই। তারপর চায়ের জন্যে বৌয়ের পায়ে তেলমারি। তারপর মার সঙ্গে ঝগড়া করি। তারপর চা দিয়ে কুইনিন খাই, তারপর পান খাই। তারপর ক্ষেতে যাই। তারপর চান করি ভাত খাই। তারপর ঘুমোই। তারপর সন্ধেবেলা বসে বসে কীর্তন করি। তারপর ঢুলতে থাকি। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি।

সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন। দিল্লীর অফিসারের মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। ভীষণ রেগে গেছেন।

রসিকতা হচ্ছে আমার সঙ্গে! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সব হটাও। তোমাদের সঙ্গে প্রেস কনফারেনস চলে না। এ সব বস্তু সামলানো চিফ কমিশনারের কর্ম নয়। সবার আগে দিল্লীতে গিয়ে একটা পোস্ট তৈরি করাতে হবে—কমিশনার সিভিলাইজেশান। এদের সুসভ্য করতে না পারলে মিটিং কনফারেনস কিছুই করা যাবে না। কোনো স্টাডি রিপোর্ট লেখা যাবে না। প্রথম লাইনেই এই লেখা হবে নাকি—আমি সকালে উঠে পায়খানায় যাই। কোথায় বলবে—সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি। আদেশ করেন যাহা মোর কমিশনারে, আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।

—এই তোমরা যাও, সায়েব রেগে গেছেন।

জমায়েতের কে একজন ফোড়ন কাটলেন—পাঁচ পয়সার সায়েবের ছ পয়সার রাগ। একমাস এখানে ধরে রেখে দাওনা মণ্ডলদা, সব রাগ জল হয়ে যাবে। মণির মা দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে খ্যানখ্যানে গলায় চিৎকার করে উঠল—সুমুন্দিরে জিগাও টাকা কবে আইব। আমাগোর পোলাপানের কি হইবো!

হাতে হাতে চায়ের গেলাস ঘুরে গেল। একটু চা খেয়ে যান স্যর। রাগ করে আর যাবেন কোথায়। স্থলপথে দ্বীপের ভেতর কয়েক কিলোমিটার যেতে পারেন। পালাবার পথ একটাই—জলপথ। সেও তো জাহাজ ছাড়বে রাত একটায়।

পরিতোষ বাইরে সেই একইভাবে বসে আছেন। কেউ চা দেয়নি। একটা গেলাস এনে হাতে দিলুম। লজ্জায় না না করে প্রায় মাটিতে মিশে যাবার উপক্রম। খান তো মশাই অত লজ্জা করলে এদের সঙ্গে পেরে উঠবেন! আপনাকে সেই তিন একর জমি দেবে বলেছিল, পুরোহিত বলে এখনো টালবাহানা করছে। এই মহাভারতে সূচ্যগ্র ভূমির জন্যেও কৌরবপক্ষের সঙ্গে লড়তে হবে না!

—ঠিক কইসেন। পরিতোষের মুখে একগাল হাসি।

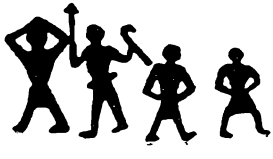

॥ ৬ ॥

চাঁদ উঠেছে নীল দ্বীপের মাথার ওপর। এতখানি গোল চাঁদ। দুদিন বাদেই দোল পূর্ণিমা। বরজিন্দর বলছেন—সাততাড়াতাড়ি জাহাজের খোলে ঢুকে কি হবে! চলো দক্ষিণের ওই সমুদ্রতীর ধরে যতদূর যাওয়া যায় চলে যাই। এমন রাত কি আর আসবে জীবনে!

যেতে আপত্তি নেই,—কিন্তু। দুটো 'কিন্তু'র পীড়া। একটু ভাল চা খেতে বড়ই ইচ্ছে করছে। জাহাজে না গেলে মনের মত চা পাব না। দু নম্বর 'কিন্তু' ওই জেটি। একবার কোন রকমে পেরিয়ে এসেছি। বেশি রাতে ওই রোপট্রিক কি আর সম্ভব হবে! কে আমায় পার করে দেবে! অব মেরে নইয়া পার কর গে। চল আগে জাহাজে যাই। চান করে, চা খেয়ে নামা যাবে আবার।

অলসের শহুরে যুক্তিতে জলন্ধরের মানুষটি টলল না। সে শুধু দুটো কাগজের মালিক, সম্পাদক নয়, তার খেত-খামার আছে। ট্র্যাকটর চালায়। তার কাছে চায়ের আকর্ষণের চেয়ে প্রকৃতির আকর্ষণ হাজার গুণ বেশি। ভুজুং-ভাজাং দিয়ে জেটির মুখ পর্যন্ত এনেছিলুম। আর রাখতে পারলুম না, পালিয়ে গেল। জীবন দেখে জীবনধর্মী কাহিনী লিখবে।

সমুদ্রে ভাঁটা পড়ে বাঁ-দিকের ঝোপের মধ্যে হলুদ বালির তীর জেগেছে। সাদা সাদা কোরাল, তার ওপর স্নিগ্ধ চাঁদের আলো। সাহস থাকলে, জুতো খুলে ওই পথে এগিয়ে যেতুম। পরিতোষের পাহাড় ওই দিকেই আছে বোধ হয়। মাছের কঙ্কালটা হয়ত এখনও পড়ে আছে!

জেটির সেই কাঠ-খোলা জায়গাটায় এসে কাঁদতে ইচ্ছে করল। তখন হাওয়া ছিল না, এখন তেড়ে হাওয়া দিচ্ছে। বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা। পাঁচজনে পারে যাহা তুমিও পারিবে তাহা। কেবল নিচের দিকে তাকিও না। উটমুখো হয়ে চল। কাঠের গোঁজে হোঁচট খেয়েছ কি মরেছো। মরতে মরতে মরণটারে, এসে গেছি, এসে গেছি, একেবারে জাহাজের ছাদে—এম ভি তারমুগলি।

চায়ের দোকান বসেছে। ফুটফুটে চাঁদের আলোর রাত। জাহাজের ঝলমলে আলো। কুঁচোকুঁচো কথা। একেবারে ওপরের ডেকে তাস পড়েছে। রান্নাঘরের বাইরে টেবিলের ওপর পালক ছাড়ানো একটা মুরগী মশলাদার হবার অপেক্ষায় পড়ে আছে।

শোনা গেল আলুভাজা সহ আর এক রাউণ্ড চা হবে। পলিথিনের পর্দা ঝোলানো শাওয়ার ফিট করা বাথরুমে ধরা-বৃষ্টির জলে স্নান করে সারাদিনের পর বেশ ঝরঝরে লাগছে। এখন একবার তীরে যাওয়া যায়। রসগোল্লা খাওয়া যায়। পরিতোষের সঙ্গে আরও গল্প করা যায় ; কিন্তু ওই জেটি !

নিচে সামনের ডেকে চুপচাপ বসে থাকাই ভাল। নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো। এতক্ষণে জঙ্গলের দিক থেকে রাতচরা পাখির শব্দ আসছে—টির টিক, টির টিক। এত বড় বিশাল একটা জঙ্গল, না আছে শেয়াল না আছে হায়না, এমন কি একটা বেরাল পর্যন্ত চোখে পড়ল না। শুধু গোটা কতক কুকুর। গড ফরশেকেন ল্যাণ্ড !

জাহাজের মাস্টার এসে পাশে বসলেন। একটু অবসর পেয়েছেন। জাহাজের ডবল ইঞ্জিন বিশ্রাম নিচ্ছে। সমুদ্রের ওপর বসে সমুদ্রের কথাই এসে গেল। কী ভাবে রাতের বেলা ম্যালেশিয়া থেকে পাইরেট জাহাজ এসে আন্দামান সমুদ্র থেকে মাছ চুরি করে সরে পড়ে ! এই ভদ্রলোক নিজে দুটো জাহাজ ধরেছেন। অনেকটা গানস অফ ন্যাভারোনের কায়দায়। কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই, স্রেফ ভয় দেখিয়ে ধরেছিলেন দুটো জাহাজ। পুরস্কারও পেয়েছেন এই বীরত্বের জন্যে। পাকা সাহসী নাবিক !

সমুদ্র-সম্পদে ভরপুর। অগাধ জলে অনন্ত ঐশ্বর্য ! কয়েকটা প্রশ্ন মনে উসখুস করছিল। যেমন, পৃথিবী যখন সুপ্ত তখনও আপনি জাহাজের হাল ধরে রাতের পর রাত সমুদ্রের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঘোরাফেরা করেন, কখনো কি 'ফ্লাইং ডাচম্যান' চোখে পড়েছে !

ভদ্রলোক একটু হাসলেন। অলৌকিক 'ফ্লাইং ডাচম্যানের' কথা শুনেছেন বোঝা গেল। কিন্তু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন। বললেন অন্য কথা। বললেন, সমুদ্রে অনেক সময় গান শোনা যায়। অপার্থিব সংগীত। অনেকটা অরগ্যানের মত কিংবা অসংখ্য শাঁখের মত। জল থেকে আকাশের দিকে উঠছে সমবেত প্রার্থনার মত। মাঝে মাঝে নীল আগুন উঠতে দেখেছেন। গোল বলের মত, একের পর এক আকাশের দিকে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে ! ঢেউ-এর উপর ফসফরাসের হাসি নয়। নীল আগুনের গোলা। আজ রাতে একটা নাগাদ জাহাজ ছাড়বে, সারা রাত চলবে, আমার সঙ্গে রাত জেগে দেখুন না। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ কিভাবে শেষ রাতে সমুদ্রের জলে খেলা করতে নামে ! কিভাবে সূর্য লাফিয়ে ওঠে জল থেকে আকাশে ! বলা যায় না, ফ্লাইং ডাচম্যানও এসে যেতে পারে।

জাহাজের চালক বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। একবার ডাঙায় যাবেন। নীলের

বাজারে। হয়ত কিছু কেনাকাটার আছে। পাশে এসে বসলেন প্রদ্যোতবাবু। শিল্পী মানুষ। নিজের ভাবে একটু চুপচাপ থাকতেই ভালবাসেন। পৃথিবীর সব কিছু তিনি ক্যামেরার চোখে দেখায় অভ্যস্ত। ক্যামেরা রাতে অচল। তা না হলে এমন চাঁদিনী রাতে চুপ করে বসে থাকতেন না। সূর্য তাঁর অ্যাসিসটেন্ট। এখন সূর্য নেই বলে চুপচাপ বসে থাকবেন তা তো চলবে না। একটু চিন্তা ঢুকিয়ে দি।

ডকটর ডেভিস আর আলটেভেগটের নাম শুনেছেন! আশ্চর্য! শুনেছেন। প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ, অবসর সময়ে হিমালয় নিয়ে, সমুদ্র নিয়ে লেখাপড়া করেন! অদ্ভুত অদ্ভুত অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে পৃথিবীর আধখানা ঘোরা হয়ে গেছে। রঘু রাইয়ের সঙ্গে ছবি তুলতে গিয়ে হিমালয়ের ভেড়া গুঁতিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দিচ্ছিল তবু ক্যামেরা হাতছাড়া হয়নি। বুকের ওপর ভেড়া, শুয়ে শুয়ে ভেড়ার পেছনের পায়ের ফাঁক দিয়ে ক্যামেরা চালিয়ে দিলেন। অত ক্লোজআপে ভেড়ার এত ন্যাচারাল স্টাডি! প্রাণ যায় যাক, শুধু থাক ছবি!

আলটেভেগট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাঁকড়াবিদ, ৭৩-৭৪ সালে মানস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখানে এসেছিলেন, দস্যু-কাঁকড়া নিয়ে গবেষণার জন্যে। সঙ্গে ছিলেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিট্যুটের বিখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডকটর ডেভিস।

কলকাতার বাজারে কাঁকড়া দেখেছি, বিশাল বিশাল কচ্ছপ দেখেছি। মানুষের নৃশংসতা দেখেছি। হাত-পা বাঁধা কচ্ছপ চিত হয়ে পড়ে আছে। বাজারে। সেই জ্যান্ত কচ্ছপের শরীর থেকে খাবলা খাবলা মাংস খুবলে নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। সব শেষে পড়ে থাকছে নিরীহ মুণ্ডু। তখনও তাতে প্রাণ লেগে আছে। মানুষের চেয়ে নৃশংস কী বাঘ, সিংহ, গণ্ডার! না বোধহয়।

আন্দামান সমুদ্রের গ্রীন টার্টল এইভাবেই কলকাতার বাজারে মরতে যায়! সারা ভারতে কলকাতাই হল কচ্ছপের সবচেয়ে বড় বাজার। কচ্ছপের সবচেয়ে বড় ডিমপাড়ার জায়গা 'সাউথ সেনটিন্যাল আইল্যাণ্ড'। জাহাজের মাস্টার পাশে থাকলে এখুনি হেঁকে উঠতেন 'ডিরেকশান', ইলেভন ডিগ্রি নর্থ, নাইনটি টু ডিগ্রি ইস্ট, হাণ্ড্রেড কিলোমিটার সাউথ অফ পোর্টব্লেয়ার।

সেনটিন্যাল ও সেনটিন্যালিজ দুটো শব্দই আতঙ্কজনক। দুটো দ্বীপই, নর্থ আর সাউথ সভ্য মানুষের অগম্য। নর্থ সেনটিন্যালে বাস করে সেনটিন্যালিজরা। এরা এখনও ক্যানিবলস। দক্ষিণ সেনটিন্যাল হল এদের শিকারভূমি। নর্থ থেকে সাউথের দূরত্ব কম নয়। সমুদ্রের পরোয়া এরা করে না। ছোট ছোট ডিঙি আছে।

সাউথ সেনটিন্যাল, সমতল একটি প্রবাল দ্বীপ। গোলাকার। চারপাশে ছয় কিলোমিটার সমুদ্র সৈকত। পৃথিবীর আর কোথাও এত সুন্দর সৈকত নেই। হলে কি হবে, সারা দ্বীপে একফোঁটা মিষ্টি জল নেই। মিষ্টি জল ছাড়া যে রকম মানুষই হোক বাঁচে কি করে! ১৯০৫ সালে প্রথম এই দ্বীপে এসেছিলেন, এ অ্যালকক। তারপর আর কারুর সাহসে কুলোয়নি। তারপরই এই দুই সাহেব! জ্ঞানের তৃষ্ণা মৃত্যু ভুলিয়ে দেয়।

রবার ক্র্যাব আর গ্রীন টার্টলের খোঁজে জীবন তুচ্ছ করে ছুটে গেলেন সাউথ সেনটিন্যালে। আমাকে বললে আমিও যেতুম। প্রদ্যোতবাবুও যেতেন। কম উত্তেজনা নাকি! পৃথিবীতে এখনও এমনি সব খাঁজ-খোঁজ আছে যেখানে সৃষ্টির রহস্য বহুপঠিত বইয়ের মত ছিঁড়েখুঁড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যায় নি। বিশাল বিশাল কচ্ছপ মানুষের উৎপাতের বাইরে জলকেলি করছে। এক একটার ওজন সাড়ে সাতশো কেজি। সব চেয়ে স্বাস্থ্যবানটির ওজন বারোশো কেজি হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রকৃতই কূর্মাবতার। সবুজ খোল। চর্বি ফিকে সবুজ। সবুজ বলেই, সবুজ কচ্ছপ নাম। বিশ্বের বাজারে সুপ টার্টল বলে কত আদর! বাঙালী ছাড়া ভারতবর্ষের কূর্মভোজী মানুষের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। কলকাতার গোটা পঞ্চাশ বাজারে কচ্ছপের কাটতি। বছরে দশ হাজারের মত কচ্ছপ কলকাতার ওই সব বাজারে হত্যা করা হয়। অ্যামেরিকা, ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, আরো অন্যান্য দেশে কচ্ছপ-পাগল মানুষের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। অতি সুস্বাদু প্রোটিন ও স্নেহখাদ্য। বিশ্বের অন্যতম প্রধান এবং প্রথম টার্টল ফার্ম—আমেরিকার ম্যারিকালচার লিমিটেড। ক্যারিবিয়ার গ্যাণ্ড কেমান দ্বীপের এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বড় বড় জলাধারে সমুদ্রের জল ভরে ডিম থেকে কচ্ছপ জন্মে, বড় করে, মানুষ করে, সারা পৃথিবীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। টিনে ভর্তি স্যুপ, পলিথিনে মোড়া স্টিক। কচ্ছপ ধরার বিশাল কারবার ফাঁদা হয়েছে কিউবা, য়ুকাটান, মেকসিকো, কোস্টারিকা এবং নিকারাগুয়ায়। বংশবৃদ্ধিতে কচ্ছপ মানুষের ওপর যায়। মাতা কচ্ছপ ডিম পাড়ার সময় ভাসতে ভাসতে তীরে চলে আসে। থাবাথাবা পায়ে বালি খুঁড়ে এক একবারে টেবিলটেনিস বলের আকারে ১৩৭টার মত ডিম পেড়ে যায়। সব ডিমই ফোটার অবসর পায় না। কিছু চলে যায় এক ধরনের লোভী সরীসৃপের পেটে। তার নাম 'মনিটার লিজার্ড'। ঠিক সন্ধান পায়। ওত পেতে বসে থাকে রাতের অন্ধকারে বালিতে শরীর ঢেকে। মানুষও কম লোভী নয়! চীনারা ভীষণ ভক্ত।

সেনটিন্যালিজের দস্যু-কাঁকড়া মানুষ খুন করতে পারে। পরিতোষ ঠিকই বলেছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো কোনো দ্বীপেও এই ধরনের কাঁকড়া আছে। বৈজ্ঞানিক নাম —বিরগাস ল্যাটরো। রাতের বেলা এরা নারকেল গাছের মাথায় চড়ে। নারকেল পেড়ে নিচে নেমে আসে। খোলা ছাড়িয়ে নারকেল ভেঙে জল আর শাঁস খেয়ে ভোরবেলা জঙ্গলে পালায়! এদের কাণ্ডকারখানার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। অসাধারণ শক্তি আর বুদ্ধির খেলা। চার্লস ডারইন তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখছেন —একটা লোহার কৌটোয় একটা বিরগাসকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কাঁকড়াটা ধারালো দাড়া দিয়ে কৌটো কেটে পালিয়েছিল। ১৭০৩ সালের অসাধারণ একটি ঘটনার বিবরণ আছে রামফিয়াসের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। জাহাজের রেলিঙে এই রকম একটা কাঁকড়া বেঁধে রাখা হয়েছিল। সেই জাহাজে কিছু ছাগলও ছিল। একটা ছাগল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কাঁকড়াটা দুটো দাড়া দিয়ে ছাগলটাকে তুলে রেলিঙ টপকে জলে ফেলে দিয়েছিল। সাংঘাতিক দুটো দাড়া দিয়ে মানুষের গলা চেপে ধরলে, ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে যাবে। গত বিশ্বযুদ্ধের আগে যে কোনো পর্যটক এই রকম একটা কাঁকড়ার জন্যে পঞ্চাশ টাকা মূল্য ধরে দিতেও ইতস্তত করতেন না। কারণ, এই কাঁকড়ার তলপেটের ঘৃতাক্ত পদার্থটি কাঁচা খেলেই অফুরন্ত যৌনশক্তির মালিক হওয়া যায়। খাবেন না কি প্রদ্যোতবাবু! কত আর খরচ! তখন ছিল পঞ্চাশ, এখন একশো হোক। অনুমতি দেন তো পরিতোষকে গিয়ে ধরি। প্রদ্যোতবাবু বেরসিক মানুষ! চাঁদের আলোয় কাঁকড়ার ঘিলু খেয়ে ডন জোয়ান হবার কোনো ইচ্ছেই দেখা গেল না। অসীম যৌবন নিয়ে দিল্লিতে ফিরতে পারতেন! হল না। বললেন, অ্যালার্জি হবে। কি যে অ্যালার্জি এসেছে!

ভাগ্য ভাল যে সাইথ সেনটিন্যালে মানুষ যেতে পারে না। তা না হলে, এত দিনে সব মেরে খেয়ে ফাঁক করে দিত। যজাতির যৌবনরস টিনে প্যাক হয়ে শহুরে দোকানে চড়া দামে বিক্রি হত। কচ্ছপের সুস্বাদু ডিম চলে আসত নিউ-মার্কেটের স্টলে। প্রকৃতির বিবর্তন পরীক্ষাগারের মত বঙ্গোপসাগরের জলে ভেসে থাক মনুষ্য-বর্জিত দ্বীপ। একটু যত্ন নিলে এই দ্বীপ গ্যালাপ্যাগো দ্বীপপুঞ্জকে ছাড়িয়ে যাবে। যেখানকার ভুবনবিখ্যাত বেলাভূমিতে সারা রাত সবুজ কচ্ছপমাতা রবারের বলের মত রাশি রাশি ডিম পেড়ে যাবে। ওত পেতে বসে থাকবে মনিটার লিজার্ড। বিরগাস উঠবে নারকেল গাছের মাথায়।

খেতে বসে শিপ-মাস্টারকে বললুম, চলুন না একপাক ঘুরে যাই সেনটিন্যাল দ্বীপটা। করুণ মুখে বললেন, উপায় নেই, সাহস নেই, অনুমতি নেই। সে পারতেন ক্যাপটেন ডেনিস বিল, যিনি ডেভিস সাহেবদের ৭৩ সালে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর পারেন

ভক্তোয়ার সিং।

হঠাৎ বরজিন্দর বিজয়ীর মত খাবার টেবিলে এসে হাজির হলেন। কপালে একটা চন্দনের টিপ। গলায় ফুলের মালাটাই যা খালি নেই। কেয়া ভাই সাদী হো চুকা! নেহি। সর্দারনী চেলাকাঠ মেরে শেষ করে দেবে। বহুত পেয়ার হুয়া। চায়ের দোকানে বসে চা খেয়েছে। রসগোল্লা উড়িয়েছে। দেবস্থানে গিয়ে কপালে টিপ পড়েছে। সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে এমন জায়গায় গেছে যেখানে মানুষ নেই। চুপ করে বসে বসে ঢেউ নিয়ে ঝিনুকের খেলা দেখেছে। আর এমন একটা জিনিস দেখেছে যা আমরা কোন দিন দেখতে পাব না। একটি পাগল। গর্জনগাছের তলায় চুপ করে বসে আছে। শরীরটা অন্ধকারে, পা দুটো সামনে ছড়ানো চাঁদের আলোয়। দু-হাত দূরে ঢেউ ভাঙছে। হাতে একটা নোটবুক।

টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার লালাজী বললেন, "হি মাস্ট বি এ রিপোর্টার।"

আর একটু যোগ করুন, কি রকম রিপোর্টার! আমাদের মতই, কত বছর আগে কে জানে, আমলাদের সঙ্গে এই দ্বীপে এসেছিলেন হয়তো! তারপর সেই আমলারা চিকেন লেগ চিবোতে চিবোতে জাহাজ নিয়ে সরে পড়েছেন। সেই থেকে বেচারা রবিনসন ক্রুসোর মত তীরে বসে আছে। এখানে তো না নিয়ে এলে আসা যায় না। না নিয়ে গেলে যাওয়া যায় না।

বড় আমলা, মুখটা গামলার মত করে রেগে উঠে গেলেন। অবশ্য খাওয়া না ফেলে। চর্ব, চুষ্য শেষ করেই গেলেন। আমরা হয় তো খাবার ঘরে বসেই আর একটু আড্ডা দিতুম, হঠাৎ কোথা থেকে অপূর্ব বাঁশির সুর ভেসে এল। উদাস করা বাউলগানের সুর! কে বাজায়! নিশ্চয়ই কোনো বাঙালী, নাকি কোন সমুদ্রকন্যা। পুরো দলটাই হই হই করে ডেকে চলে এল। সেই গান, মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি যে আর বাইতে পারলাম না।

বরজিন্দর বললে, সেই পাগলটি যেখানে বসে ছিল, সেই দিক থেকেই সুরটা ভেসে আসছে, সমুদ্র ছুঁয়ে, হাওয়ার ওঠাপড়ায়। সমুদ্র যেন নদী হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গের নদী। মানোয়ারী নৌকো চলেছে, সার সার। হাঁসের পালকের মত সাদা সাদা ভরা পাল। গলুইয়ে বসে মাঝি বাঁশি বাজাচ্ছে। শ্রীমতী গোড়বোলে অপূর্ব সুরেলা গলায় হঠাৎ গান ধরলেন—রাধা কে শ্যাম, মীরা কে শ্যাম।

সুরে সুরে নিজেদের ভরপুর করে আমরা যে যার কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। গম্ভীর ভোঁ বাজিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। পোর্টহোলের বাইরে সমুদ্র সুইস, সুইস শব্দ করছে। চরাচর ব্যাপ্ত করে চাঁদের আলো সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর অলস ভঙ্গীতে শুয়ে

আছে। কেবিনের মাথার ওপর গোল গোল ফানেলের ভেতর দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। একটাকে ফিট করলুম পায়ের দিকে, একটা পেটে, একটা মাথায়। ধিকিধিকি ইঞ্জিনের শব্দ। নীল দ্বীপ তার সুখদুঃখ নিয়ে ভোজবাজির মত দিগন্তে হারিয়ে গেল। মায়ের ঠাণ্ডা হাতের মত হাওয়া খেলা করছে মাথার চুলে। ঘুম, ঘুম, ঘুম আসছে। সারি সারি মুখ—অমূল্য, যীশুতোষ। পরিতোষ যেন বলছে—এত করে বললুম, একটা রসগোল্লা খেয়ে গেলেন না। আর কি কখনও দেখা হবে।

শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে বুঝতে পারিনি কোথায় আছি। পোর্টহোলে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলুম। পশ্চিম আকাশে এত বড় গোল একটা ঠাণ্ডা চাঁদ জলের কিনারায় নেমে এসেছে। একটা কোণ একটু একটু করে গলতে শুরু করেছে। বিদায়ী চাঁদ। এত ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, একটা গায়ের চাদর হলে যেন ভাল হয়। সমস্ত জাহাজটা দোলনার মত দুলছে। ফুর ফুরে সাদা সাদা ফেনা ভেসে চলেছে। নীচের বাঙ্কে সর্দারজী চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

চলন্ত জাহাজে দাড়ি কামানো বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা। ব্লেডটা গালে চেপে ধরে কখনো বাঁ দিকে কখনো ডানদিকে টাল খাওয়া। এক একবার সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার প্রবল ইচ্ছা। নাচতে নাচতে দাড়ি কামানো। সর্দারজীর বেশ মজা! দাড়ি কামাবার ঝামেলা নেই। মুখে পট্টি বেঁধে বসে থাক। সারা দিনে একবার বিশেষ কায়দায় তৈরি কালো রঙের গঁদের আঠা মেখে দাড়ির একতা বজায় রাখো। আমি একটু চুলে মেখে পরীক্ষা করেছিলুম। বেশ জমাটি ব্যাপার। সারা মাথায় চুলেদের একান্নবর্তী পরিবার।
স্নানের বেশ মজা! প্ল্যাসটিকের পর্দা লাগানো পাশাপাশি দুটো স্নানাগার। মাথার এক ইঞ্চি ওপরে শাওয়ার। তলার দিকে একটা কল। মেঝেতে কাঠের পাটাতন। নড়বার চড়বার জায়গা নেই। তার ওপর জাহাজের দুলুনি। জলের তোড়ে মাথা ছেঁদা হয়ে যাবার দাখিল। চতুর্দিকে নানা রকম ফিটিংস। একটু বে-টক্কর হলেই রক্তপাত। এত নরম জল, সাবান মেখে যতই ধোও গায়ের হড়হড়ানি যেতে চায় না। জাহাজ বাসস্থান হিসেবে মন্দ নয়, কেবল সকালের গোটাকতক প্রাকৃতিক কাজ নিয়েই একটু কৌশল ও মাথা খাটাবার প্রয়োজন হয়।

সারা রাত জাহাজ চল্লিশ কিলোমিটারের মত পথ পাড়ি দিয়েছে। ওই দেখা যাচ্ছে আশ্চর্য এক দ্বীপ। স্ট্রেটস আইল্যাণ্ড। ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর নামল জলে। কী শোভা! আড়াইশো, তিনশো ফুট উঁচু উঁচু গর্জন, ধূপ, বাদাম গাছের তরল ছায়ায় ঢালু সোনালী তট। একের পর এক ঢেউ পিলপিল করে এগিয়ে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে। একটা পথ তীর থেকে গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। একটা তোরণ মত কী চোখে পড়ছে। ছোট্ট একটা ডিঙি তালে তালে দুলছে। এমন কিছু বড় দ্বীপ নয়। বাঁ থেকে ডানে প্রসারিত পুরো তটভাগটাই চোখের সামনে। এক দৌড়ে এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে যাওয়া যায়। ডানদিকের শেষ মাথায় তেঠ্যাঙা একটা ম্যানগ্রোভ গাছ জলের ওপর একলা দাঁড়িয়ে আছে। মৌন জঙ্গল এত গম্ভীর, বর্তমানের চপলতার এত উর্ধ্বে, গর্জন এমনই এক সন্ন্যাসী, তাকালেই মনে হয়, সময়কে, ক্ষণকালের আয়ুকে জয় করে বলতে চাইছে—সব ছেড়ে চলে আয়, চলে আয়, জীবন, নলিনী দলগত জলমিব তরলং নয়, অনন্ত অপার। কায়দাটা খালি শিখে যা। খুব কম দিনই প্রভাত জীবনকে এত বড় বিস্ময়ের সামনে থমকে দাঁড় করায়।

দুটি শিশু তীরে বালি নিয়ে ঝিনুক নিয়ে খেলা করছে। সোনী বললেন, আমার ছেলে মেয়ে। এক মাস পরে বাড়ি ফিরছি। আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কী ভাগ্যবান শিশু! শৈশব থেকেই বিশালের পায়ের তলায়। কোথাও এতটুকু সঙ্কীর্ণতা নেই। ওখানে কেন তপোবন নেই! সামগান নেই! কামধেনুর মত এই দ্বীপেই তো ভার্গব মুনির আশ্রম থাকা উচিত।

সোনী বললেন, আপনারা চা খেয়ে আসুন, আমি একটু আগে যাই।

আপনি চা খাবেন না!

আমি বাড়ি গিয়েই খাব। সোনী একটু উতলা। স্নেহের টান সকালের চায়ের টানের চেয়ে শক্তিশালী! আলোছায়া ঘেরা, সমুদ্রস্নাত বেলাভূমি, দুটি নিষ্পাপ শিশু, একটি ছোট্ট কুটির, কঠোর প্রশাসকের মত উদ্ধত কিছু গাছ সোনীকে ডাকছে। জাহাজের স্পীড বোট ভটভট শব্দে সোনীকে নিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিছু পরেই এল আমাদের যাবার পালা। জাহাজ থেকে বোটে নামাটাই একটা অভিযানের মত। জাহাজ দুলছে, পাশের সিঁড়িটা দুলছে লগবগ করে, তার গায়ে লাগানো বোটটাও দুলছে। কোনটাই এক সঙ্গে নয়। প্রত্যেকেরই স্বাধীন, স্বতন্ত্র দুলুনি। এই অবস্থায় জলে না পড়ে লটবহর সমেত বোটের খোলে নিজেকে ফেলতে হবে। যাক বিনাপতনে বোটে পা রাখা সম্ভব

হল। সামনে আধ মাইলের মত সমুদ্র, তারপর তটভূমি। নিজেকে বেশ সোলজার, সোলজার লাগছিল।

মনে হল রূপকথার তীরে এসে উঠেছি। যার কোণাটা শুধু বাস্তব একটু ছুঁয়ে গেছে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধা। একটা মোটা নারকেলগাছের শোয়ানো গুঁড়ির ওপর বসে আছেন—রাজা আর রানী। রাজা লোকা। রানী জীরা। আসল আন্দামানী। রাজার বয়স হবে নব্বই বছর। দেখলে অবশ্য তা মনে হয় না। রাজবেশ হল খাঁকি হাফপ্যাণ্ট, ছাপা হাওয়াই শার্ট, পায়ে তালতলার চটি। চোখ দুটো লাল জবা ফুল, কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। রানীর বেশ, মেমসায়েবদের মত ছাপা কাপড়ের গাউন। বয়স ষাট কি পঁয়ষট্টি হবে। কপালে, গালে সাদা এক ধরনের মাটির প্রলেপ। ববছাঁট চুল। রাজার মাথায় আফ্রিকানদের মত একমাথা গুঁড়ি গুঁড়ি চুল। দুজনে বসে বসে সমুদ্র দর্শন করছেন। পেছনেই শ'খানেক গজ দূরে রাজমহল।

তোরণটা প্রকৃতই তোরণ। বাঁশের তৈরি। শুকনো লতাপাতা ঝুলছে। যেন মন্ত্রীর আসার জন্যে তৈরি হয়েছে। আন্দামানীদের রাজত্বে প্রবেশের জন্যে সাদর আমন্ত্রণ। রাজার রাজত্বে জনসংখ্যা মাত্র বাইশ। রাজ্যসীমা বিশাল। তবে তিনের চার অংশে শুধু জঙ্গলই রাজত্ব করছে। এই দ্বীপের আসল রাজা প্রকৃতি। মানুষ প্রজা মাত্র। গত বছরেও সংখ্যা ছিল তেইশ। এই বাইশটি মানুষের একটি সম্প্রদায়কে বাঁচানোর কী আপ্রাণ প্রচেষ্টা। প্রথম থেকেই সভ্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করে এরা একটু একটু করে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। তীরধনুক নিয়ে অন্যান্য প্রজাতির মত রুখে দাঁড়ালে এই অবস্থা হয়তো হত না। ইংরেজ আমলে পেয়েছে সভ্য ব্যাধি আর নেশা করার প্রবণতা। জাপানী আমলে পেয়েছে অকথ্য অত্যাচার, ইংরেজের গুপ্তচর সন্দেহে। এখন অবলুপ্তির শেষ ধাপে এসে পাচ্ছে জামাই-আদর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন—আর কী হবে, ড্যামেজ হ্যাজ অলরেডি বীন ডান।

এখন কুড়িয়ে বাড়িয়ে সকলকে এনে জড়ো করা হয়েছে এই স্বর্গীয় দ্বীপে। সুন্দর সুন্দর কুটির তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। মাসহারার ব্যবস্থা হয়েছে। ফ্রী-রেশন, ফ্রী জামাকাপড়, ওষুধপত্তর, চিকিৎসা, অল্পস্বল্প শিক্ষার সুযোগ। পুরো ব্যাপারটাই যেন বড় বেশি কৃত্রিম—হট হাউসে ক্যাকটাসের চাষের মত। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে বাইশটি হার্টের রুগী।

জীরা কপালে, নাকে, গালে, রসকলি করে, গাউন পরে নিজেকে রানী বলে দাবি করলেও সে নাকি আসল রানী নয়। রাজা লোকার স্ত্রী বহু দিন মারা গেছে। জীরা

একজন ডিভোর্সী। এই দ্বীপে সরকারী ব্যবস্থাপনায় বসবাস করতে আসার আগে এরা সকলেই থাকত পোর্টব্লেয়ারে, ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা জাপানী বাঙ্কারে। নেচে, গেয়ে, জুয়া খেলে যা রোজগার হত তাই দিয়ে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা। সেই নর্তকী জীরা এই ষাটোত্তর বয়সে আধা-উন্মাদ। সারা দিন সমুদ্রের ধারে বসে থাকে। অতীতের দিন যদি পিছু হটে সরে আসে!

সভ্যতার প্রথম শিকার এই প্রজাতির বাঁচার আশা খুবই কম। মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে মাথার ওপর। প্রত্যেকে অসুস্থ। বংশানুক্রমিক সিফিলিসের জীবাণু রক্তে। যক্ষ্মায় ফুসফুস জীর্ণ। ম্যালেরিয়া। তার ওপর ড্রাগ অ্যাডিকসন। দ্বীপের নাম রাখলে হয়—ওপিয়াম আইল্যাণ্ড। আফিং খেয়ে খেয়ে এদের আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। প্রজনন শক্তিও লোপ পেয়েছে। অথচ সরকার চান, নৃতাত্ত্বিকরা চান এরা বংশ বৃদ্ধি করুক। করুক বললেই তো আর করা যায় না। বাইশটি প্রাণীর মধ্যে সাতজন বয়স্কা নারী, আটজন বয়স্ক পুরুষ। সাতজন মহিলার মধ্যে মাত্র ছজনের সন্তানধারণের বয়স আছে। বাকি সকলের সে বয়স পেরিয়ে গেছে। ইলফা আর বোরো সব চেয়ে আদরণীয় দম্পতি। যদিও মেয়েটিকে ঠিক খাঁটি আন্দামানী বলা যায় না। রক্তে কিছু মিশেল আছে। তাহলেও এরা দুটি ছেলে একটি মেয়ের জন্ম দিয়েছে। দুটি মাত্র মহিলার ওপর এদের থাকা না থাকা নির্ভর করছে। এ যেন দুরূহ এক টেস্ট ক্রিকেট। দুজন ব্যাটসম্যানের স্কোরের উপরে নির্ভর করছে জয়-পরাজয়। দ্বীপটা হল নিষ্কর্মার দ্বীপ। সারা দিন কোন কাজ নেই। এরা মাছ ধরতে জানে না, চাষ-আবাদ জানে না, রাঁধতে জানে না। একপাল কুকুর আছে, মোটা মোটা সাদা কুকুর। বনে আছে নানা রকম শিকার। ছোট বড় হরিণের ছড়াছড়ি। কুকুর যদি কোনো দিন কোনো শিকার মেরে এনে দেয় তাহলে একটু মাংসমুখ হতে পারে। তা না হলে সরকারী হাতে লাগানো, নারকেল, পেঁপে, লাল কলা, কাঁঠাল, আম দিয়ে সাত্ত্বিক ফলাহার। সরকারী রেশান তো আছেই। চাষবাস শেখাবার চেষ্টা হয়েছিল। ধুর মন লাগে না। কে অত খাটে! মাঝে মাঝে নগদ বকশিশের লোভ দেখিয়ে নারকেলগাছ ঝাড়ানো কি কলাগাছের গেঁড় তোলানোর ব্যবস্থা হয়।

সিকি বর্গমাইল জায়গায় এই বসতি। সমুদ্রতীর থেকে পিচের রাস্তা সোজা উঠে ধাক্কা খেয়েছে কমিউনিটি সেণ্টারে। সোনীর কোয়ার্টারে। তারপর বাঁয়ে বাঁক নিয়ে, নারকেল, কলা, আর পেয়ারা গাছের সারির ভেতর দিয়ে কয়েক ফার্লং এগিয়ে গিয়ে একটা ইঁদারায় এসে শেষ হয়েছে। রাস্তার বাঁদিকে সমুদ্রের ধার ঘেষে ছোটো ছোটো কাঠের বাংলো, একটু করে বাগান করার জায়গা, খোলা একটু করে

বারান্দা। প্রতিটি বারান্দায় একটা করে ইজিচেয়ার। এক-কামরার বাংলো। বেশ প্রশস্ত। ভেতরে কাঠের তাকটাক আছে। বাঁশের মাচায় শোবার ব্যবস্থা। রাজা লোকার একটা ট্রানজিসটার আছে। পদমর্যাদায় লোকার পরে যে, তারও একটা রেডিও আছে। রেডিও পোর্টব্লেয়ারের অনুষ্ঠান বেশির ভাগ ইংরেজী আর হিন্দিতে। এরা হিন্দি ভালই জানে। দু-চারটে ইংরেজীও বলতে পারে যেমন, ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার, হনি, ফিস, ফ্রুট ইত্যাদি।

কয়েকদিন আগেই বোয়ান দেবতার উৎসব ছিল। গাছের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় লতাপাতার শিকল বাঁধা। গাছের গায়ে গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ নারকেলপাতার ঝালর। খোলা পূজামণ্ডপে লতাপাতার বাহার। বেদী আছে, দেবতা অদৃশ্য। সুপুরিগাছের একটা মোটা বাকল দুটো কাঠের গোঁজের ওপর ঢেঁকির মত পড়ে আছে। অবহেলায় ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলেও এই সামান্য জিনিসটির ভূমিকা অসামান্য। এটি একটি বাদ্যযন্ত্র।

প্রতিটি ঘরেই ঝুলছে নাচের পোশাক। সমুদ্র থেকে কুড়িয়ে এনে সুতোয় গাঁথা গোছা গোছা শামুক আর ঝিনুকের ঝুমকো। নূপুর, কোমরবন্ধনী, টায়রা। পরার জামাকাপড় একপাশে দলাপাকানো। কোন ঘরে আধখানা বেগুন শুকোচ্ছে। কোথাও পড়ে আছে ধুলোমাখা আলু কিংবা লাউ। জীবনের যাবতীয় কর্মে কি অপরিসীম অবহেলা। একটা বাড়ির বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারে একটা ঘেও কুকুর মনের সুখে ঘুমোচ্ছে। কুকুরদের মধ্যে এত সদ্ভাব পশ্চিমবঙ্গে চোখে পড়েনি। দেখা হলেই খেয়োখেয়ি, তালগোল পাকানো লড়াই নেই। এত যত্নে তৈরি সমস্ত বাংলোই খালি। কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। যাদের জন্যে তৈরি তাদের এ সব ভজঘট ভাল লাগে না। কেউ কেউ থাকার জন্যে নিজেদের কায়দায় চারপাশ খোলা আদি অকৃত্রিম ঝুপড়ি বানিয়ে নিয়েছে। জনপদ ছেড়ে সবাই গিয়ে বসে আছে সমুদ্রের ধারে উবু হয়ে। সমুদ্র এদের কি যে দেবে, এরাই জানে। মাছ খেলে যাবে, ধরতে পারবে না। কচ্ছপ ভেসে উঠবে, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে। সারা দিন ঢেউ গোনা ছাড়া আর কি কাজ থাকতে পারে! পাগলী জীরা আবার সমুদ্রের ধারে দোকান দিয়েছে। দোকানে মালের চেয়ে খালি টিনই বেশি। সব মরচে ধরা। সিগারেট আছে, বিড়ি আছে, চা আছে। সোনী বললেন, চা নাকি ভালই বানায়। মজার ব্যবসা। 'এলিস ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের' এলিস দেখলে খুশী হত। বাইশ জন মানুষের জন্যে জীরার ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। টাকা গোল হয়ে ঘুরছে। লোকা হেডম্যান হিসেবে

সরকারের কাছ থেকে দেড়শ টাকা মাসহারা পায়। দ্বিতীয় হেডম্যান বিরা পায় একশো টাকা। বাকি সকলে পঞ্চাশ টাকা। প্রতিমাসের দশ তারিখের মধ্যেই সোনীর অফিস থেকে টাকা পেয়ে যায়। এর চেয়ে সুখের জীবন আর কি হতে পারে! তবু কেন সুখ নেই। আসলে এদের শরীরটাই গেছে। সকলেই ধুঁকছে!

তবু সরকারী নির্দেশ। নাচতে হবে গাইতে হবে। ফটো তোলা হবে। নব্বই বছরের বৃদ্ধ লোকা কানে আবার কম শোনে, সামনে ঈষৎ ঝুঁকে নাচিয়ে-গাইয়েদের কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনতে চলল। সাজ-পোশাকে কিছুটা সময় গেল। মেয়েরা সামনে পা ছড়িয়ে বসে, তালি বাজিয়ে গান ধরল, বাজিয়ে যে, সে উপুড় করে রাখা সুপুরিগাছের বাকলটার ওপর অনবরত পা ঠুকে চলল, আর পুরুষরা হপস্টেপ জাম্পের মত লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে এগোতে লাগল। আর ফটোগ্রাফাররা নানা ভাবে দৃশ্যটাকে ধরে রাখার জন্যে, বসে, লেংচে, কাত হয়ে শাটার টিপতে লাগলেন। ভারি করুণ দৃশ্য। বেচারারা পারছে না, তবু বারে বারে, ফিরে ফিরে নাচের হুকুম। আওর এক দফে আওর এক দফে। ওরা নাচছে না, ওদের নাচাচ্ছে টাকা। গান একটা অব্যক্ত আর্তনাদের মত। সুরটা 'হরি দিনতো গেল সন্ধ্যা হল, পার কর মোরে'র মত। বার কতক নাচানাচির পর নাচিয়েরা ধুলোর ওপর শুয়ে পড়ল। এরপর মারধোর করলেও আর নাচবে না।

ইদারার পারেই জঙ্গল। সোনী বললেন, ঢুকবেন না, দিক ভুল হয়ে সারা জীবন ঘুরতে হবে। একেবারে ভার্জিন ফরেস্ট। হাজার হাজার বছর ধরে বেড়ে ওঠা, গর্জন, প্যারিসিয়া, সিমোয়া, বাদাম, ধূপ গাছ। গাছের বাট্রেস রুট দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। যেমন তার অদ্ভুত গঠন, তেমনি তার উচ্চতা আর শক্তি। একজন গাইড নিয়ে বেশ কিছু দূরে গেলুম। কোনদিন সূর্যের আলো ভূমি স্পর্শ করে না। চতুর্দিকে হিলিবিলি, লয়ালয়া শিকড়। নিচের দিকে অন্যমনস্ক হলে ল্যাং, ওপরদিকে অন্যমনস্ক হলে মাথায় মোটা মোটা গাছের ডালের গাঁট্টা। বিভিন্ন মাপের, বর্ণের হরিণ ছুটে ছুটে পালাচ্ছে। মনে হল আর কিছু দূর গেলেই কুম্ভকর্ণ কি ঘটোৎকচকে দেখতে পাব। গাইডই ভয় পেয়ে গেল, ফলে আমার আর লিভিংস্টোন হওয়া হল না। ফেরার সময় নিজে নিজে দিক ঠিক করতে পারি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে গেলুম। ডাহা ফেল। সম্পূর্ণ উল্টোদিকে চলে যাচ্ছিলুম, যেদিকে কি আছে কেউ জানে না। থাকো বাছা অরণ্য, তুমি তোমার মত থাক। আমরা চলি।

ফেরার পথে কমিউনিটি সেণ্টারে একটু ঠেক খেলুম। ইয়ে বড়ি সুন্দর একসপেরিমেণ্ট।

এখানে সবাই আসবে, বসবে, হাসবে, খেলবে, রেডিও থেকে উপচে পড়া ইংরেজী গান শুনবে :

ফিড্‌ল ডি ডি, ফিডল ডি ডী
দি ফ্লাই হ্যাজ ম্যারেড দি আম্বল বী।

সোনী, সোনীর স্ত্রী, তিন ছেলেমেয়ে, একজন বাঙালী কমপাউণ্ডার, ২২ জন আন্দামানী, পোর্টব্লেয়ার থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরের এই দ্বীপে নির্বাসিত। সোনী তিন মাস মাইনে পাননি। তিনি সরকারী কর্মচারী নন। সরকারের সহযোগী সংস্থা, ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সঙ্ঘের একজন সেবক। ওদিকে চিফ কমিশনার একটি সংস্থা পত্তন করেছেন—আন্দামান আদিম জন জাতি সেবক সমিতি। কে থাকে কে যায়। তবু সোনী হাসছেন, সোনীর স্ত্রী ইলফার চুল বেঁধে দিচ্ছেন। বোরোর ঘায়ে মলম লাগিয়ে দিচ্ছেন। আন্দামানীদের সঙ্গে মহিলা গায়ে-গায়ে মিশে গেছেন। কোনো দ্বিধা নেই। এঁদের ত্যাগ আর কষ্ট দেখলে নিজেকে বড় সঙ্কীর্ণ মনে হয়।
সমুদ্রে জোয়ার এসে গেছে। নারকেল গাছের যে গুঁড়িটার ওপর আসার সময় জীরা আর লোকা বসেছিল তার ওপর সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে। অজস্র জলকণা হাওয়ায় ভেসে ভেসে মাঝে মাঝে রামধনু তৈরি করছে। রাবণের দ্বীপে রামের ধনুক। আমাদের জাহাজটা দূরে সরে গেছে। না দূরে সরেনি, সমুদ্র বহরে বড় হয়েছে। যে ডিঙিটা বাঁধা ছিল, শ্রীমতী গোড়বোলে তার ওপর বসে দুপাশে দুটো হাত ঝুলিয়ে দিয়েছেন। লালাজী প্যাণ্ট গুটিয়ে হাঁটু জলে নেমে ডিঙিটাকে মাঝে মাঝে ঠেলে দিচ্ছেন। পাগলের মত ডিঙিটা ভাসছে, দুলছে, ঘুরছে, কাত হচ্ছে, ফিরে আসছে। দড়িটা একবার খুলে গেলেই, গোড়বোলের কণ্টিকি একসপিডিসান হয়ে যাবে।

তটভূমি হারিয়ে গেছে। এখন জাহাজের স্পিড বোটে ওঠার কসরতটা এইরকম হবে —আমরা ডিঙিটায় উঠব প্রথমে। সেটা লাফাতে থাকবে, হেলতে-দুলতে থাকবে, আমরা গেল গেল শব্দে টাল খেতে থাকব, তারপর ওই দামাল মোচার খোলা থেকে তিড়িং করে লাফ মারব অধিকতর সংযত চরিত্রের বোটে। বাবারে, কি মুশকিলে পড়েছি! চন্দনচর্চিত জীরার মুখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি না বলতে ইচ্ছা করল —বল, বল, হরে কেষ্ট হরে রাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম!

বিকেলের দিকে আমরা পোর্টব্লেয়ারে ফিরে এলুম। সেই খাঁখাঁ রোদ। সেই সাদা

ঝলসানো জাহাজঘাটা। তীরের দিকে সবুজ বদ্ধ জলে একটা পচাপচা গন্ধ। শ্যাওলাধরা সৈকতে তাইওয়ানের দুটো দস্যু জাহাজ। অদ্ভুত আকৃতি। অবিকল মধ্যযুগের জলদস্যুদের জাহাজের মত। দুপুরের রোদে পোর্টব্লেয়ার নিঝুম। তবু ভিজে ভিজে হাওয়া বইছে। সোঁদা গন্ধ। কাঠ, সিমেণ্ট, আলকাতরা, দড়ি, টায়ার লাইফবয়, শ্রমিক, পান, লরি, একদিকে সারি সারি ওয়্যারহাউস, হার্বার মাস্টারের অফিস, ওয়্যারলেস মাস্ট, অন্যদিকে নীল সমুদ্র, সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ বন্দরের ছবি। আন্দামান প্রশাসকদের কাছ থেকে আমরা যে ব্যবহার পেয়েছি তার কোন তুলনা হয় না। সিনিয়র সিনিয়র অফিসাররা তটস্থ। স্বয়ং চীফ সেক্রেটারি কখনো ছুটে আসছেন রেস্ট হাউসে, কখনো বন্দরে। সদা হাস্যমুখ ইনফরমেশান অফিসার শ্রীনামবিয়ারের ব্যবস্থাপনায় কোন ছিদ্র নেই। গাড়ি চাই গাড়ি, জাহাজ চাই জাহাজ জল, জল, চা, চা, পান, পান। বিশেষত সেই সময়ে যে সময় একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অতিথি হয়ে এসেছেন। অন্য কোন জায়গা হলে মন্ত্রীকে নিয়েই সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতেন, আমাদের মত লেস ভি আই পিদের বরাতে জুটত কাঁচা কদলী।

একটু পরেই নামবে সন্ধ্যা। আন্দামানের সন্ধ্যা যেন প্রকৃতির মন্দিরে বিশালের নীরব আরতি। আকাশের চাঁদোয়া ঘন বেগুনী থেকে ক্রমশ কালচে হয়ে আসছে। দিগন্তের আগুনে লাল একটু একটু করে কমলালেবুর রঙ ধরে তলার দিকে কালচে লালের পাড় তৈরি করছে। বাড়ি ঘর, গাছ, জাহাজের মাস্তুল, জেটি, লাইট হাউস, টিলা, পাহাড়ের চূড়া ক্রমশ জমাট কালো হয়ে দিগন্তের দিকে সরে যাচ্ছে। একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে হাতজোড় করে তাকিয়ে অর্গানের সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছে করে—আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

টপ করে একটা গোল চাঁদ আকাশে লাফিয়ে উঠে পশ্চিমে অস্ত-সূর্যের আয়োজনটাই পণ্ড করে দিলে। জুড়িগাড়ি লোক-লস্কর নিয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হল। যাব সমুদ্রের ধারে—করবিনসকোভে—এ গ্রেট অ্যাট্রাকসান ফর দি ট্যুরিস্ট। অশ্বক্ষুরাকৃতি তমালকুঞ্জ পরিবেষ্টিত সমুদ্র সৈকত।

সেই রস আইল্যাণ্ডের আন্দামান হোমের প্রতিষ্ঠাতা, পোর্টব্লেয়ারের চ্যাপলেন রেভারেণ্ড এইচ করবিনসের নামে করবিন কোভ। অ্যাবারডিন বাজার ঘুরে, জঙ্গলীঘাটের পাশ দিয়ে আমাদের মিনিবাস হু হু গতিতে ম্যারিনার সামনে হাজির হল। ম্যারিনা সমুদ্রের ধারে সাদা পাঁচিল ঘেরা একটি পার্ক। এখানেই প্যারেড গ্রাউণ্ড। এখানেই শহীদ স্তম্ভ! এখানেই ঋজু একটি হাত তুলে নেতাজী দাঁড়িয়ে আছেন দৃপ্ত ভঙ্গীতে। দোল পূর্ণিমার আগের দিনের পূর্ণচন্দ্র আকাশে। সমুদ্র উদার, শৈশবের প্রশান্ত

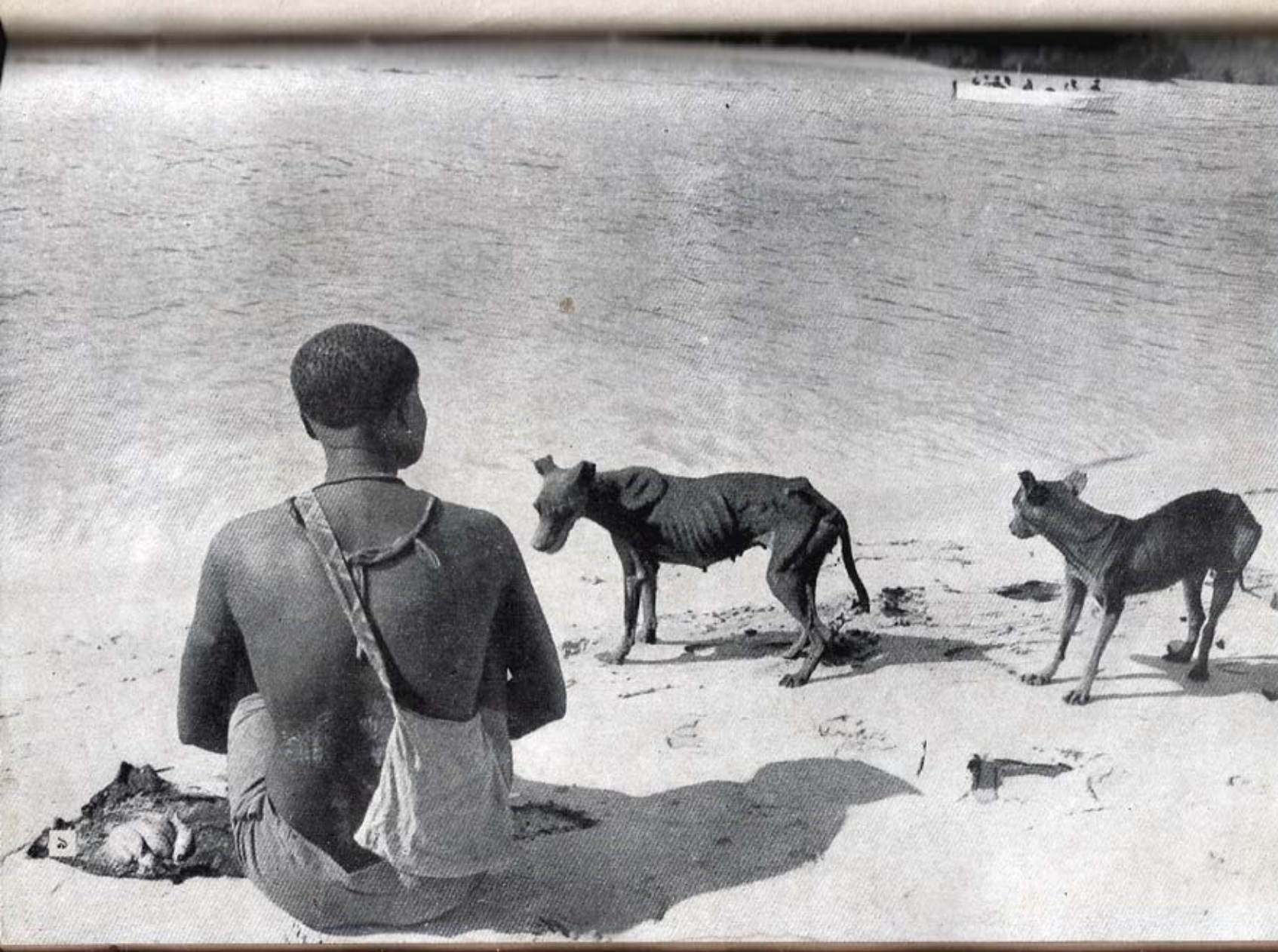

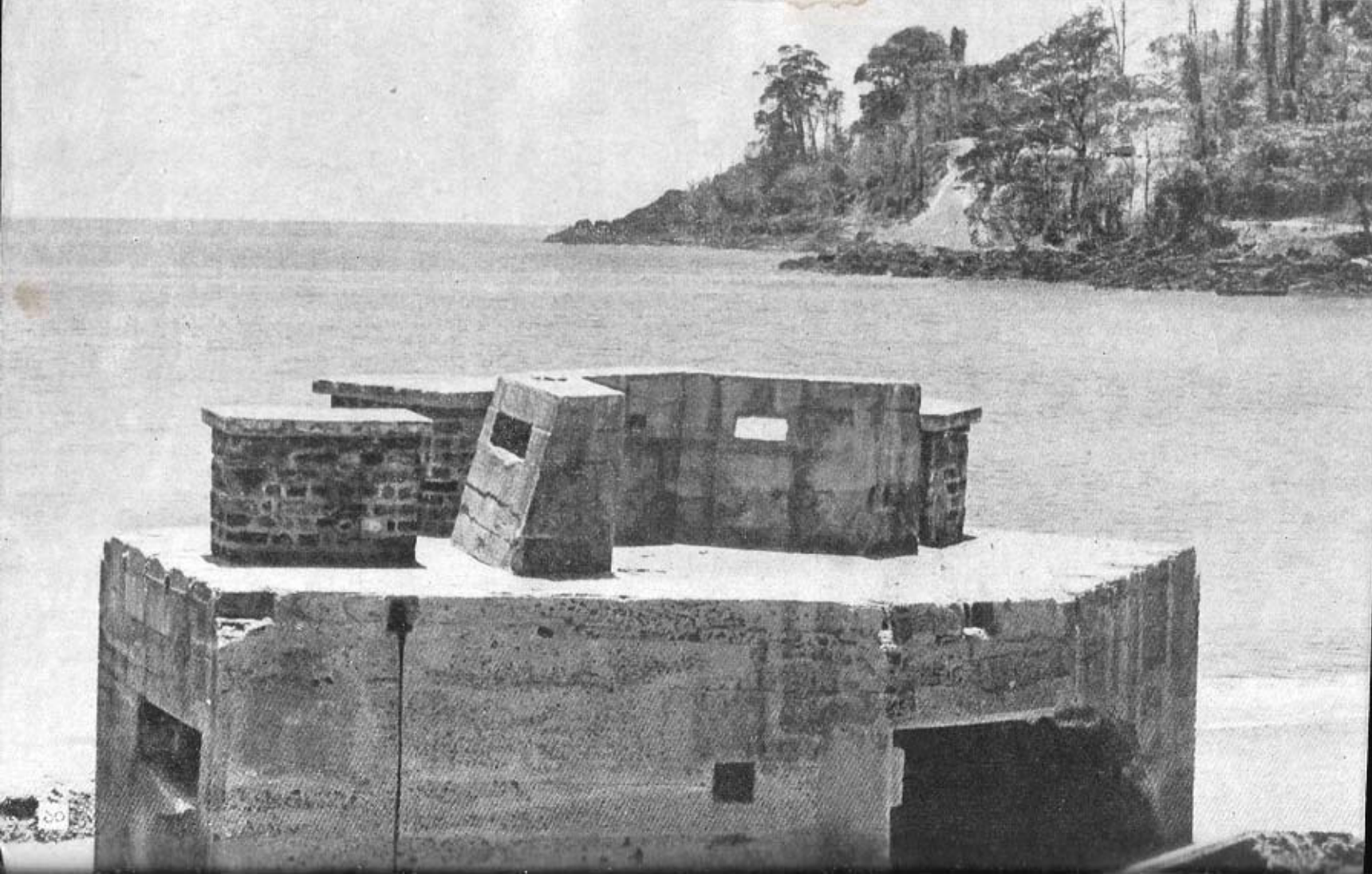

মনের মত। সিক্ত বাতাস। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে পাঁচিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন কিছু নরনারী। যুবক-যুবতী। প্রেম হয়ত আছে তবে দীঘা বা পুরীর মত বেলেল্লাপনা নেই। চারদিক এত ঝলমল করছে, মনে হচ্ছে অসংখ্য রুপোর সুতো ঝুলছে আকাশের চাঁদোয়া থেকে। মনে হচ্ছে সব সময় এই দ্বীপে যেন বিশালের উৎসব চলেছে। সমুদ্র যেন অনন্ত ভৃঙ্গার থেকে সুগন্ধী শান্তির জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। লালাজীর স্টক থেকে পান বেরোল। আন্দামানের মিঠে পান। ভদ্রলোকের হাসিমুখে ঠিক সময়ের জন্যে সঠিক রসিকতা। ঠিক অনুষ্ঠানের জন্যে সঠিক অনুপান। এত বড় একটা মন-ভোজনের পর এক খিলি মিঠেপানের বড়ই প্রয়োজন ছিল। বিশেষত শ্রীমতী গোড়বোলের পাতলা ঠোঁটের জন্যে একটু প্রাকৃতিক অনুরাগ আরও বেশি চাঁদের চরিত্র এনে দিল।

তবে আমাদের সমস্ত চপলতা নেতাজীর পদতলে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল। সুউচ্চ বেদি থেকে এই মুহূর্তে নেতাজী যেন বলছেন : কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও। / তারি রথ নিত্যই উধাও। জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয় স্পন্দন / চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন। ওগো বন্ধু, সেই ধাবমান কাল / জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল।

১৯৪১, জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটেন আর আমেরিকার বিরুদ্ধে। নেতাজী নিরুদ্দেশ। জার্মানীতে হিটলার। পার্ল-হারবার জ্বলছে। সিঙ্গাপুরে জাপানী সৈন্য মার্চ করছে। মে, ১৯৪২, বার্মার পতন। বাঙালীরা হাঁটাপথে পালিয়ে আসছে। কলকাতায় বোমা পড়ছে। ভারত মহাসমুদ্রে জাপানী যুদ্ধ জাহাজ টহল দিচ্ছে। আন্দামান ছেড়ে ইংরেজ পালাতে শুরু করেছে। কলকাতার রাস্তাঘাট জনশূন্য। ২৩শে মার্চ ৪২ সাল, জাপানী যুদ্ধ জাহাজ, বিমান পোর্টব্লেয়ারে এসে নেমেছে। রস আইল্যাণ্ডে একজন মাত্র ইংরেজ অফিসার পড়েছিলেন সেই অফিসারকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। সেলুলার জেলের সমস্ত বন্দী মুক্ত। সাতটা উইংয়ের চারটে জাপানীরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। খাদ্য নেই, পানীয় নেই। লুঠ চলছে। গাছে গাছে মৃতদেহ ঝুলছে, বুকে আঁটা ফলকে লেখা—আই ওয়াজ এ স্পাই, ওয়াজ এ লুটার। পোর্টব্লেয়ারের চারপাশে জাপানী বাঙ্কার। জঙ্গলে জঙ্গলে বিমানধ্বংসী কামান। বিমানবন্দরের মাথার ওপর মুখ উঁচিয়ে আছে কামান। সে কামান এখনও আছে, অতীতের সাক্ষী। কালের রথ শুধু চরিত্রদের তুলে নিয়ে চলে গেছে।

নেতাজী একটি ডুবো জাহাজে করে জার্মানী থেকে জাপানে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর

পুরোভাগে। নভেম্বর ৬, ৪৩ সাল, তোজো নেতাজীকে সমর্পণ করছেন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। ডিসেম্বর ৩১, ৪৩ সাল, নেতাজী এসে দাঁড়িয়েছেন ম্যারিনা পার্কের এই জায়গায় এমনি ভঙ্গীতে। দ্বীপের নাম হয়েছে, শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ। জাপানী অত্যাচার বন্ধ। সুশাসন ফিরে আসছে। চাবুক নেই, হত্যা নেই, নখের মাথায় গরম ছুঁচ পুরে দেওয়া নেই। সেলুলার জেলের দিকে তাকিয়ে আছেন নেতাজী। রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।

মনে পড়ে, সেই উত্তাল দিনে, গভীর রাতে, সাবেক আমলের ঢাউস রেডিওর সামনে, বড়দের সঙ্গে আমরাও বসে আছি, সিঙ্গাপুর স্টেশন থেকে ভেসে আসবে নেতাজীর কণ্ঠস্বর। বড়রা বলছেন, ভল্যুমটা একটু নিচু করে দাও হে। রাস্তার দিকের জানলা সব বন্ধ করে দাও। ওপাশে রায় বাহাদুরের বাড়ির দিকের জানলাগুলোও বন্ধ করো। বিশ্বাস নেই! সরকারী চাকরি করিতো! বারান্দা দিয়ে গলা বাড়িয়ে রাস্তাটা একবার দেখা হল। বলা যায় না, সি আই ডির লোকটোক থাকতে পারে। ভেসে এল সিঙ্গাপুর শব্দ তরঙ্গে—প্লিজ স্ট্যাণ্ড বাই ফর নেতাজী বোসেস স্পিচ। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমাদের বই, খাতায়, সর্বত্র রবার স্ট্যাম্পে নেতাজীর সৈনিক মুখ, তলায় লেখা—জয়হিন্দ্। মেয়েরা ফিসফিস করে কথা বলছিলেন—বড়রা ধমকে উঠলেন, একদম চুপ। নেতাজী বলছেন :

For Indians the return of the islands represents the first territory to be liberated from the British yoke. By the acquisition of this territory, the provisional Government has now become national entity in fact as well as in name.

কী আনন্দ, আন্দামানে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়ছে। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর আট হাজার সৈনিককে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নেতাজী। তিনদিন তিনি আন্দামানে ছিলেন। লেফটন্যাণ্ট কর্নেল লোকনাথ নির্বাচিত হয়েছেন আন্দামানের চিফ কমিশানার। সিঙ্গাপুর রেডিও থেকে নেতাজী বলছেন :

The last objective which still remains to be achieved is the delivering of the fatal blow to the enemy in cooperation with our Allies.

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচার রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি। কোথায় গেল সেই সাত হাজার জাপানী সৈন্য। শেষ চেষ্টা সফল হল না। পূর্ব সীমান্ত জাপানের পঁচিশ হাজার সৈনিক, আজাদ হিন্দ বাহিনীর আট হাজার সৈনিক, সমর

সম্ভার, শেষ মুহূর্তের দাবার চালে ধোয়া হয়ে উড়ে গেল।

শ্রীমতী ছায়া গোড়বোলের চোখে জল। বড় সংবেদশীল মহিলা। বরজিন্দর স্তম্ভিত। ছায়াকে সামলাবার জন্যে বললুম, কান পেতে শুনুন, নেতাজীর মর্মর কণ্ঠস্বর : মোর লাগি করিও না শোক, / আমার রয়েছে কর্ম আমার রয়েছে বিশ্বলোক / মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই / শূন্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই। মাই ইটারন্যাল মটো ইজ টু ফিল দি ভ্যাকুয়াম। হিয়ার মাই গিফটস আর মেজারড ইন ড্রপস।

॥ ৭ ॥

করবিন কোভস। পথে পড়ল গোটা কতক জাপানী বাঙ্কার। অলোক, বরজিন্দর, লালাজী, ঢালু পথ বেয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করতে করতে ওপরে উঠে গেলেন অতীতকে দেখতে। পেছন থেকে নামবিয়ারের জিপ এসে আমাদের গাড়িবাহিনীতে যোগ দিল।

করবিন কোভস, চাঁদের আলোয় আমাদের মত হুমদোদের জায়গা নয়। প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিচরণভূমি। মাঝরাতে জল থেকে 'মারমেড' উঠে আসতে পারে। 'প্যান' এসে বাজাতে পারে বাঁশি। সামনে ধবধবে বেলাভূমি। পেছনে ছায়া-ছায়া নারকেল কুঞ্জ। পথ চলে গেছে দূরগ্রামে। পথের ওপারে আধুনিক স্নানাগার। সমুদ্র স্নানের পর কলের জলে স্নান করার পৃথক ব্যবস্থা! দু দিক থেকে চওড়া দুটো সিঁড়ি গোল ছাদে গিয়ে উঠেছে।

সমুদ্রের সেই এক খেলা! দুধের মত সাদা ঢেউ ফোঁস করে ফেনিল হয়ে উপছে পড়ছে আবার গুটিয়ে নিচ্ছে আঁচল। বাঁ পাশে একটা বাঙ্কার সেই ৪৩ সাল থেকে থেবড়ে বসে আছে বেলাভূমির বালিতে। এক একটা বড় ঢেউ দুঃসাহসী হয়ে সেই বাঙ্কারের অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে খলখল করে হেসে উঠছে। ডান দিকে বেশ কিছুটা দূরে একটি ছেলে, একটি মেয়ে গায়ে গা লাগিয়ে দূর থেকে দূরে হেঁটে চলেছে। ইতিমধ্যে বরজিন্দর যথারীতি হারিয়ে গেছে। তার জুতো দুপাটি পড়ে আছে। সারা ভ্রমণপথে আমরা প্রত্যেকেই মাঝে মাঝে এত হারিয়ে যাচ্ছি, ভয় হয় সকলে শেষ দিনে ফিরতে পারব তো!

হঠাৎ একটা ট্যুরিস্ট বাস এসে দাঁড়াল। এতক্ষণের নির্জনতা, সমুদ্রের সঙ্গে নির্বাক আলোচনা ভেঙে গেল। একগাদা বউদি, এক গোছা ঠাকুরপো, সমান সংখ্যক শুনছো পিলপিল করে নেমে এল। স্নানাগার সংলগ্ন রেস্টরুমের দরজা খুলে গেল। ওরে, হ্যাজাক জ্বাল। বউদি, বউদি, প্রেসার কুকারটা নামিয়েছো তো। নন্দা, নন্দা। বাঙালীদের দলবল। চাঁদের আলোয় ঘষা ঘষা গায়ের রঙ।

অন্যমনস্ক দাঁড়িয়েছিলুম, পেছন থেকে প্রশ্ন—বেঙ্গলী। ঘুরে বললুম—ইয়াপ। মি টু। বেশ স্বাস্থ্যবান মধ্যবয়সী এক বাঙালী ভদ্রলোক। হাসছেন। দাঁতগুলো বড় স্পষ্ট। হোয়্যার ফ্রম। কালকুত্তা। অক্যুপেশান? পেন ফিডলিং। হোয়াট ইজ দ্যাট?

আজ্ঞে কলম নিয়ে নাড়াচাড়া। হে, হে, হে, হে। খুব খুশি হয়েছেন ইংরেজী শুনে। আমাদের মুনলাইট পার্টিতে জয়েন করতে পারেন। কর্ডিয়েল ইনভিটেশান। ভদ্রলোকের কথা শেষ হল না। এক বউদি এসে সারা মুখে আবীর মাখিয়ে দিয়ে, বললেন, হোলি হো। ব্যাস ঠাকুরপো, বউদি হাত-কাড়াকাড়ি, খামচাখামচি করতে করতে কোমর জলে। অন্ধকারের জটলা থেকে একজন চিৎকার করলেন—রুনু, ম্যাকসি পরে জলে নামবে না বলে দিচ্ছি। চাঁদের আলোয় মুঠো মুঠো আবীর উড়ছে। ওদিকে শুরু হয়েছে রবীন্দ্র সংগীত—জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।

আবার প্রশ্ন—কোথা থেকে? এবারে আরও মোটা, আরও লম্বা এক ভদ্রলোক। আজ্ঞে কলকাতা থেকে। বেড়াতে? না, প্রেস। আ, আপনাদের তো খুঁজছি। লিখতে হবে, তেড়ে লিখতে হবে। কী লিখতে হবে? হিয়ার আর দি পয়েন্টস : ভদ্রলোক আমাকে ভেতরের খবর কিছু দিলেন। চিফ কমিশনারের সঙ্গে আমার লড়াইয়ের হাত একটু মজবুত হল! একেই বলে ব্রিফিং। চাঁদের আলোর হুল্লোড়ে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সকলেই এখানকার চাকুরিজীবী, মধ্যবিত্ত বাঙালী। বাঙালীরা অনেকটা ছাতারে পাখির মত। সশব্দে অবতরণ। অকারণ ক্যাঁচোর-ম্যাঁচোর। যে-কোনো জায়গার গভীর, গম্ভীর আয়োজন নিমেষে চুরমার করে দেবার অপরিসীম ক্ষমতা। এমন কি মহাশ্মশানেও এঁরা শব্দমুখর।

করবিন কোভসের নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে ফালা ফালা করার জন্যে এঁদের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের সরে পড়াই সাব্যস্ত হল। কিন্তু এই মুহূর্তে দুজন মিসিং। জুতো আছে, জুতোর মালিক বরজিন্দর নেই। আর নেই শ্রীমতী ছায়া। ছায়াকে আবিষ্কার করা গেল মহিলা মজলিসে। বেশ জমিয়ে বসে রবীন্দ্রসংগীত শুনছেন। বরজিন্দরও ফিরে এলেন, হাতে ভিজে আণ্ডারওয়্যার। দক্ষিণ প্রান্তের নির্জন তটে সর্দারজী এতক্ষণ মনের আনন্দে সমুদ্র স্নান করছিলেন। যে যার তালে আছেন।

ট্যুরিস্ট লজে ফেরার পথে আমরা অ্যাবারডিন বাজারে এলুম। দেখা যাক কেনাকাটার কী আছে! কয়েক বছর আগে নতুন তৈরি গান্ধী মার্কেট সেদিন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন বাজার উঠছে। মাউন্ট ব্যাটেন সিনেমার শেষ শো ভেঙেছে। শেষ শোনা গানের কলির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সারি সারি মানুষ ঘরে ফিরে চলেছেন। এখানকার অধিকাংশ ব্যবসা, সিনেমা হাউস, পেট্রল পাম্প সবই আকুজিদের হাতে। ধনতন্ত্র এমন জিনিস, এমন এক সাধনা যা তন্ত্রের পথেই কব্জা করতে হয়। আকুজিরা সেই তান্ত্রিক।

সাগরধনের মালিকের সঙ্গে লালাজীর খুব খাতির জমে গেল। শাঁখের ঝিনুকের,

প্রবালের সুন্দর সুন্দর কাজ। দামও তেমনি। মাদার অফ পার্লসের অলঙ্কার-সেট, দেড়শো, দুশো টাকা দাম। টার্বোসেলের সুদৃশ্য টেবল ল্যাম্প তিরিশ চল্লিশ টাকা দাম। ঝিনুক বসানো আঙটির দাম সাত আট টাকা। লোভনীয় বস্তুর ছড়াছড়ি, পয়সা থাকলে উজাড় করে কেনা যায়; কিন্তু হাওয়াই জাহাজে নিয়ে যাওয়াই শক্ত। সাগরধনের পাশেই একটা বেকারী। রুটি, কেক, প্যাটিস কাঁচের শো কেস থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দোতলায় বারান্দায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। কোমর ঝুলিয়ে বিদেশীদের উচ্ছ্বাস দেখছেন। লালাজীর মধ্যস্থতায় সকলেই কিছু কেনাকাটা করলেন। তারপর প্রায় নির্জন অন্ধকার-অন্ধকার রাস্তা ধরে আমরা ফিরে এলুম ট্যুরিস্ট লজে। পোর্টব্লেয়ার বন্দরে তখন আলোর মালা জ্বল জ্বল করছে। রস আইল্যাণ্ডের কোণের লাইট হাউস চমকে চমকে আলোর ইশারা পাঠাচ্ছে আকাশে। চারদিক বড় শান্ত। রাস্তাঘাট জনশূন্য। অন্য কোন শহর হলে, পান সিগারেটের দোকান থাকত। তারস্বর রেডিও ঢেলে দিত হিন্দি ছায়াছবির গানের অমৃতধারা। সমুদ্রের ধারে দার্শনিক চিন্তা নিয়ে বসতে গিয়েছিলুম। কয়েক হাজার লাল পিঁপড়ের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লুম। তা ছাড়া রাতের দিকে পোর্টব্লেয়ার বড় শীতল।

পোর্টব্লেয়ারে ইংরেজী হোলি। খুব ভোরে আমরা আর একবার করবিনস কোভ ঘুরে এসেছি। চাঁদের আলোয় একরকম। প্রভাত সূর্যের কিরণে আর এক রকম। স্নান করতে করতে, ঢেউ খেতে খেতে ছেলেবেলার অভ্যাসটা ঝালাই করার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল। সামনেই স্নেকস আইল্যাণ্ড ফণা তুলে আছে। মনে হল সাঁতরে গিয়ে সাপের মত উঠি। দেখে আসি কটা ডিম পাড়া আছে। ক'শো সাপ কিলবিল করছে। না, সাহস ভাল, দুঃসাহস ভাল নয়। স্নানটা বেড়ে হল। এখন রঙের আক্রমণ বাঁচিয়ে ফিরতে পারলে হয়!

ফেরার পথে কিছু ভদ্র রঙ ছোঁড় দেখা গেল। তবে তাঁরা রাস্তায়, আমরা গাড়িতে। ট্যুরিস্ট লজে ইংরেজী হোলি শুরু হয়েছে। বোতল আর আবীর। আমাদের ঘরের বাঁ পাশে এক দক্ষিণী দম্পতি। ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার। কোলড স্টোরেজ তৈরির কাজে সরকারী অতিথি। ডান দিকের ঘরে দুই বাঙালী বৃদ্ধ। ওদিকে বেশ বড় এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। এখানে এসেছেন মাছের কারবার ফাঁদা যায় কিনা দেখতে। কয়েকজন মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। দুজন বৃদ্ধ বাদে, বাইরে টেবিল বিছিয়ে সকলে গোল হয়ে বসেছেন। সারা মুখে লাল, নীল আবীর। শুধু ঠোঁট

দুটো পরিষ্কার। ওই পথে ঢুকু ঢুকু চলছে। রেডিও ইংরেজী পপ সংগীত বিলি করছে। মাঝে মাঝে জড়ানো গলায় এক একজন চাপা স্বরে বলছেন—হোলি হ্যায়। এঁদের মধ্যে একজন কেবল হেসেই চলেছেন। কেন হাসছেন নিজেই জানেন না। আর একজন অনবরতই বলে যাচ্ছেন—আলবাৎ, আলবাৎ।
আমরা দূর থেকে হোলি দেখলুম। যদিও আমাদের জন্যে সাইক্লোস্টাইল করা সরকারী প্রোগ্রামে লেখা—২৫শে মার্চ শনিবার, স্টে অ্যাট পোর্টব্লেয়ার অ্যাণ্ড সেলিব্রেটিং হোলি। আমাদের এখনও পর্যন্ত দৌড় আন্দামানের পান অবধি, অন্য পান দোষ কারুর মধ্যে চোখে পড়েনি, কাউকে সন্ধের দিকে উসখুস করতেও দেখিনি।

রোদের তেজ তখনও তেমন কমেনি। নামবিয়ার এলেন গাড়ি-বাহিনী নিয়ে। আমরা যে কদিন ছিলুম, আমাদের আবদার আর উৎপাতে ভদ্রলোকের ঘুম চলে গিয়েছিল। তবে ঘুম গেলেও মুখের হাসি যায়নি। কত রকমের সভ্য উৎপাত! শ্রীমতী ছায়া একঝুড়ি বড় ছোট সামুদ্রিক ঝিনুক কুড়িয়েছেন, তার মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে মজাদার নামবিয়ারের জিম্মায়, পালিশ করিয়ে দিতে হবে। আমার সঙ্গে দেখা হলেই, কি হল মশাই। আমার প্যাডকের ছড়ি। সব হবে, সব হবে। এখন চলুন বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে চিড়িয়াখানা, তারপর সেলুলার জেল।
এরকম দর্শকহীন নির্জন চিড়িয়াখানা দেখা যায় না। এই দ্বীপে যেসব জন্তু জানোয়ার পাওয়া যায় তাদেরই সমবেশ। কয়েক প্রকার বাঁদর। কাশীর বাঁদর নয়। বেশ ভব্যসভ্য। গায়ের রঙও অন্য রকম। দেখলেই মনে হয় এদের বাঁদরামি একটু অন্য জাতের। ছোটো ছোটো 'পিগি ব্যাঙ্কে'র মত জ্যান্ত শূকর। কয়েক ধরনের পাখি। সবই বেশ বড় আকারের। আমাদের কলকাতার পায়রাকে ভিটামিন খাওয়ালে যে রকম বড় হবে, সেই রকম আকারের বোম্বাই পায়রা। সবচেয়ে দর্শনীয় প্যাঁচা। এক একটা টুলের মত উঁচু। গম্ভীর মুখ। চোখের তারা দুটো অকারণে বন বন করে ঘুরছে। ভীষণ রেগে আছে। একটা কালো রঙের ভল্লুক অনবরত ওঠ-বোস করছে। ভুলেই গেছে, এটা চিড়িয়াখানা, জিমন্যাসিয়াম নয়। বড় বড় হিরণ, পা ফেলতে গিয়ে অনবরতই বোধ হয় হিসেবের ভুল হয়ে যাচ্ছে। কারণ একটা পা তুলে অত ভাবার কি আছে! অনেক ভেবে চিন্তে তোলা পা মাটিতে ফেলে, আর একটা পা তুলে সেই একই ভাবনা। আগের জন্মে বোধ হয় প্যারেড মাস্টার ছিল! লেফট রাইটের হিসেব মিলছে না। এইভাবে যদি বেড়াতে বেরোয়, এ পাখি কোনদিন কি ঘরে ফিরতে পারবে! দুটো শজারু পালা করে কাঁটা খাড়া করে, এ ওকে দেখাচ্ছে, ও

একে দেখাচ্ছে। এই দেখ আমার কাঁটা। ও বলছে রাখ রাখ, আমারটা দেখ। আমাদের দলে ট্যুরিস্ট লজের এক ভদ্রলোক ঢুকে পড়েছেন। সেই ভদ্রলোক, যিনি মাছের ব্যবসার ফ্যাকট ফাইণ্ডিং-এ এসেছেন। পাঞ্জাবী, তবে পাগড়ি বাঁধার কায়দা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। সারা সকাল হোলি করেছেন। মুখে সেই সুবাস। পরিষ্কার বাংলা বলেন। গতরাতে এভারেস্টে উঠতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গিয়েছিলেন। চোখের নিচে দগদগে ক্ষত। রাস্তা ছেড়ে, ট্যুরিস্ট লজ যে টিলার ওপর, পেছন দিক থেকে সেই টিলায় ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। সামিট আর কয়েক ফুট মাত্র, এমন সময় ল্যাণ্ডস্লাইড। বেস ক্যাম্পে গড়াতে গড়াতে পতন। সারমন—এ ক্লাইম্বার শুড নেভার বি এ হার্ড ড্রিঙ্কার। ইচ্ছে ছিল মাছের কথা জিগ্যেস করব। কিন্তু এখন ভদ্রলোক যে জলে আছেন, সে জলে ছিপ ফেললে রঙিন মাছ উঠবে।

চিড়িয়াখানায় আর বেশি সময় দেওয়া যায় না। চিড়িয়াই নেই তো চিড়িয়াখানা। এর চেয়ে এই দ্বীপের আর একটি দ্বীপ চিড়িয়াটাপু ঢের ভাল। পশুদের দেখে ভীষণ ক্লেশ হল। পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি জীবিত থাকলে, একদিন সদলে এসে, খাঁচা খুলে খুলে সব মুক্ত করে দেওয়া যেত।

আর না, এবার আমরা সেলুলার জেলের পথে। ছিলুম একটা উপত্যকার মত জায়গায়। এইবার উঠছি ঠেলে ওপর দিকে। সেলুলার জেল অনেকটা উঁচুতে। উঁচুতে করার কারণ—বন্দীরা পালাতে চেষ্টা করলে দেখতে পাওয়া যাবে। ফায়ার! বলে চিৎকার করে ধরাশায়ী করে দেওয়াও সহজ হবে।

খেলার মাঠ, কোয়ার্টার, কুচকাওয়াজের জায়গা সব ছেড়ে ক্রমশই আমরা ঊর্ধ্বগামী। প্রতি মুহূর্তেই আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝছি—আন্দামানে ভাল নাবিক আছেন, ভাল ড্রাইভার নেই। হাত এবং পা দুটোর ওপরেই দখল কম। কিংবা আমার হাতে হাতল, আমি যা খুশি তাই করব। এই ভাব। বিশাল একটা পিপুল গাছের পাশ দিয়ে আমরা এমন একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়লুম, যে জায়গাটাকে ইতিহাসের কুখ্যাত নরক বলে ঘৃণা করব, না এখনকার সুখ্যাত স্বর্গ বলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকব, বুঝতে পারলুম না। গাড়ির গতি কমতে কমতে স্থির হয়ে এল। ফটোগ্রাফাররা তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। সামনেই সেই বিশাল লোহার দরজা। মাথার ওপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফলক—সেলুলার জেল। ১৮৯৬ সালের গেট। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবু নুয়ে পড়েনি। বেশ শক্ত আছে। বহু তাজা প্রাণ এই পথে চলে গেছে, তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করতে কিংবা জয় করতে। আমরা কিছু শৌখিন মানুষ বেড়াতে এসেছি আজ। সেদিনের দৈত্যপুরী

আজকের ইমারত।

যে পাহাড়ের ওপর সেলুলার জেল, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা ৬০ ফুট। দ্বীপের বিভিন্ন সীমা থেকে ভাল মাটি এনে ইট তৈরি হয়েছিল। লাল ইট। প্রবাল পোড়ানো চুন। কয়েদীদের হাতে তৈরি কয়েদখানা। প্রধান ফটক দিয়ে আমাদের প্রবেশ পথ নয়। রাস্তা ঘুরে গেছে বাঁ দিকে। একটু ঢালু হয়েছে। ডান পাশে তৈরি হয়েছে নতুন হাসপাতাল।

আমাদের সেই নতুন পরিচয়, চোখের তলার ক্ষত চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে ঢুকলেন। আমরা দাঁড়ালুম তালা বন্ধ লোহার [illegible] সামনে। সেলুলার জেল যেন একটা অক্টোপাসের মত। মাঝখানে সেন্ট্রাল টাওয়ার। সাত দিকে সাতটা বাহু। এখন অবশিষ্ট আছে তিনটে। চারটে জাপানীরা ভেঙে মাঠ করে দিয়ে গেছে। ভেতর থেকে শেকলের প্যাঁচ আর তালা খুলে একজন সেপাই বেরিয়ে এলেন, পেছনেই বর্তমান জেলার শ্রী হর্সে। মহারাষ্ট্রের মানুষ। একবারে খটখটে, ঝনঝনে, বেতের মত চেহারা। লম্বা। এমনভাবে অভ্যর্থনা করলেন, যেন বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছি। ঢোকার দরজাটা এমন কায়দায় তৈরি, মাথা উঁচু করে ঢোকার উপায় নেই। শুরুতেই, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার অত্যাচারের পদতলে। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারদের বদমাইশি বুদ্ধির কোন তুলনা নেই। মানুষকে প্যাঁচে ফেলার কত কায়দাই যে জানা ছিল!

টাওয়ারের নিচের ঘরটা জেলারের অফিস। অফিসটাই ইতিহাস। শখানেক বছরের পুরোনো টেবিল, চেয়ার। এত অন্ধকার যে আলোগুলোও ম্লান মনে হচ্ছে। ঘরটাকে একটু চিয়ারফুল করার কোনো চেষ্টাই নেই। কেন থাকবে! এ যে সেই কালাপানির কুখ্যাত সাইকোলজিক্যাল জেল। দেহের ওপর মনের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যেই তৈরি। প্রতিটি খিলানের তলাতেই উঁচু মাথাকে নিচু করাবার জন্যে মোটামোটা লোহার সিক। জেলার সাহেব কেবলই সাবধান করছেন—মাথা বাঁচাও। বেশ খুশি খুশি মেজাজে মাথাটা সামান্য একটু ঠুকতে পারলেই পাশের সরকারী হাসপাতালে। তালার পর তালা খুলে আমরা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। জীবনে অত বড় বড় বোম্বাই তালা কখন দেখিনি। বোধ হয় মোম্বাসায় তৈরি, স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে।

দোতলায় টাওয়ারের নিচে বেশ বড় গোল একটা টেবিলে জেলের মডেল। সাতদিকে সাতটা উইং। যে কোনো উইংয়ের সামনে আর একটার পেছন। পাশেই সমুদ্র। কিন্তু এমন কায়দায় তৈরি, নির্জন সেলে বসে সমুদ্র দেখে, কি শব্দ শুনে, কি কাব্য করে মেয়াদ শেষ করবে সে উপায় নেই। প্রবাল চুনের সাদা দেয়াল, সাদা মেঝে। বারো

বাই সাত কি আট ফুটের এক একটি সেল। বহু উঁচুতে একটি করে ঘুলঘুলি। অতি স্বাস্থ্যবান লোহার সিক লাগানো হাতিখেদা দরজা। হুড়কোটা ঢুকেছে দেয়ালে। তালা ঝুলবে দেয়ালে ফিট করা আঙটার সঙ্গে। ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে খোলার উপায় নেই। ভাঙার উপায় নেই।

লম্বা করিডরের এক পাশে সারি সারি এই ধরনের চরিত্রহীন নির্জন প্রকোষ্ঠ। সেল থেকেই সেলুলার। আমার মত একটি প্রাণী, যে ইংরেজ আমলের প্রায় শেষ ভাগে জন্মেছে, গল্পের মত স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পড়েছে, আর স্বাধীনতার পাকা ফলটি টুপ করে গাছ থেকে পড়ামাত্র, কিছু মানুষকে হুটোপুটি, লুটোপুটি করে এগিয়ে যেতে দেখেছে, ফ্যাকাসে, বিবর্ণ কিছু টোল-খাওয়া বিপ্লবীকে দেখেছে, অ্যারিস্টোক্র্যাটদের সঙ্গে শেষ দাবার চালে যাঁরা দেশ গড়ার তামাশায় পাত্তা পাননি, সেই রকম একজন মানুষের কাছে সেলুলারের প্রতিটি ইট পবিত্র। পাতার পর পাতা ইতিহাস এখানকার বাতাসে উড়ছে। এখানে যেই আসুন না কেন, একটু সেনটিমেনটাল না হয়ে উপায় নেই। মানুষের মধ্যে যাঁরা মহৎ ছিলেন, একটা চেতনাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তাঁরা এই ধূসর, নিষ্ঠুর খুপরিতে দিনের পর দিন, তিলে তিলে নিজেদের ক্ষয় হয়ে যেতে দিয়েছেন। পরবর্তীকালের রাজারাজড়ার মত দেশব্রতীরা এই অধ্যায়টাকে প্রায় ফুংকারে উড়িয়েই দিতে চেয়েছেন! কিছু পাগল। কিছু ভ্রান্ত মানুষ। বোম মেরে ব্রিটিশকে হটাতে চেয়েছিল! টেররিস্ট! আসলে রোমান্টিসিস্ট। একমাত্র পাগলাগারদে যাবার আগেই মানুষ ব্রিটিশ সিংহের সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবের 'হ্যালুসিনেসানে' ভুগতে পারে। বলতে পারে—স্বাধীনতার মুহূর্ত ভারতে হয়ত এসেছে কিন্তু মুক্তি-বাহিনী ছাড়া স্বাধীনতাকে কে এগিয়ে আনবে! আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটন সফল হয়েছিলেন, কারণ তাঁর নিজস্ব ফৌজ ছিল। গ্যারিবল্ডি ইতালিকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন কারণ তাঁর সশস্ত্র বাহিনী বা স্বেচ্ছাসেবক ছিল। ভালই হয়েছে পাগলাগারদে না পুরে সেলুলারে ভরেছে। ক্ষমতায় এসে একদল মানুষ, ইতিহাসের এত বড় একটা রক্তাক্ত, অগ্নিময় অধ্যায়কে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। আমার কিন্তু সেই মুহূর্তে ইংরেজের অতীত আয়োজনের ঘটা দেখে মনে হল, স্বাধীন ভারতের ক্ষমতাসীন মানুষরা অ্যানারকিস্টদের যত সহজ ও সস্তা করে দেখেছেন, ইংরেজ ঠিক অতটা হালকা করে নিতে পারেনি। হবেও বা—রজ্জুতে সর্প ভ্রম। সেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই ইংরেজ 'মাস্টারস'রা বুঝেছিলেন—ক্ষমতায় টিঁকে থাকাটা বড় কঠিন কাজ। এত বড় একটা দেশ। চারধারে অন্য দেশ। একদিকে শাসিত দেশের সঙ্গে সম্পর্ক, অন্য দিকে বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক, সব দিকে তাল দিয়ে

চলতে হলে এমন একটা অভ্যন্তরীণ অবস্থা চাই যেটা ক্ষিপ্ত নয়, শান্ত। উত্তপ্ত পারিবারিক অবস্থায় বাস করে গৃহস্বামী মাতাল না হলে কি ঘুমোতে পারবেন!

আন্দামানের প্রথম বন্দীরা হলেন, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের দণ্ডপ্রাপ্ত কিছু সিপাহী। প্রকৃত সংখ্যার সমস্ত তথ্য হারিয়ে গেছে। তবে তিন জনের নাম জানা যায়। এঁদের মধ্যে দুজন—আলামা ফজলি হক খইরাবাদি আর মৌলানা লিয়াকত আলি ছিলেন সুপণ্ডিত এবং নৈতিক চরিত্রের জন্যে সুখ্যাত। দুজনেরই মাটি কেনা ছিল এই সবুজ নরকে। তৃতীয় ব্যক্তি মীরজাফর আলি অবশ্য বিশ বছরের মেয়াদ শেষ করে দেশে ফিরে যেতে পেরেছিলেন।

এরপরই এলেন ওহাবি অপরাধীরা। ইংরেজ শাসন না মানার অপরাধে দ্বীপান্তরিত। এর পর এলেন থারাওয়াদার বার্মীজ বিদ্রোহীরা। সংখ্যায় এঁরা অনেক ছিলেন। তার পরই এলেন ১৯০৮ সালের আলিপুর বোমা মামলার অপরাধীরা। এই দলে ছিলেন—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতিভূষণ সরকার, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, সুধীরকুমার সরকার, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন। মোট সংখ্যা ছিল একশোর ওপর। এই দলে, হেম কানুনগো, শচীন সান্যাল, পুলিন দাসও ছিলেন।

জেলার ব্যারি আর জমাদার মির্জা খানের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী আর এক ইতিহাস। মানুষের হাতে মানুষের উৎপীড়ন। পৃথিবী অবশ্য এখনও সেই পুরোনো কায়দাতেই চলছে। জগৎটাই যেন বিশাল এক সেলুলার জেল। অসংখ্য ব্যারি, অসংখ্য মির্জা এখন অন্য রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী করা যাবে, মানুষের চিরকালের নিয়তি। সেদিন সেলুলার জেলে ইন্দুভূষণ রায় আত্মহত্যা করেছিলেন। উল্লাসকর উন্মাদ হয়ে মাদ্রাজের উন্মাদ আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন। আজকে সারা দেশ জুড়েই তো উন্মাদ আর আত্মঘাতীর দল।

দেখতে দেখতে ৬৯০টা সেল রাজনৈতিক বন্দীতে ভরে গেল। নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার বীর সাভারকর, গণেশ দামোদর সাভারকর আর দাজি এসে গেলেন। এলেন, স্বরাজ আর যুগান্তর পত্রিকার ইংরেজ বিদ্বেষী লেখকরা—রাম হরি, নন্দগোপাল, লোধারাম, হোতিলাল, রামচরণ পাল। এসেছেন লাহোর ষড়যন্ত্রের অপরাধীরা, এসেছেন গদর পার্টির বিপ্লবীরা। উপবীত পরতে না দেওয়ায় রামরাখা আত্মবিসর্জন করেছেন। শুরু হয়েছে অনশন ধর্মঘট। ভাই পরমানন্দ, আশুতোষ লাহিড়ী ইংরেজ জেলারকে ধরে মাটিতে আছাড় মারার অপরাধে আধমরা হয়ে 'চেন গ্যাঙে' চালান হয়ে গেছেন।

সময় ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। স্মৃতি ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে। এখনকার জেলার হর্সেকে বললুম, আমাকে এই সেলে কিছুক্ষণ বন্ধ করে রাখুন। নির্জনে বসে অতীতকে একটু অনুভব করি। হর্সে লোহার দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলেন। অস্ত সূর্যের আলো পড়েছে। হর্সে চলে যাচ্ছেন দূর থেকে দূরে। সময়টা গুটিয়ে এল ১০ সালের পাতায়। লণ্ঠন হাতে জেলার ব্যারি। সময়ের প্রাচীরের ওপাশ থেকে, ব্যারির প্রেতাত্মা, বুলডগের মত মুখ বের করে বলছে—শোন বন্দী, বিশ্বে একজনই ভগবান। তিনি থাকেন ঊর্ধ্ব স্বর্গে। পোর্টব্লেয়ারে কিন্তু দুজন ভগবান, একজন সেই স্বর্গের ভগবান, আর একজন এই পৃথিবীর ভগবান। সেই পৃথিবীর ভগবান হলুম আমি নিজে—সশরীরে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এই পোর্টব্লেয়ারে। স্বর্গের ভগবান তোমাদের পুরস্কৃত করবেন, যখন তোমরা তাঁর রাজত্বে যাবে। কিন্তু পোর্টব্লেয়ারের ভগবানের পুরস্কার এইখানেই হাতে হাতে মিলবে। অতএব যা করবে বুঝেসুজে করবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমার নামে নালিশ করে দেখতে পার, কিছুই হবে না। আমার রাজত্বে, অনড় আমার শাসন। আমিই একমাত্র প্রভু।

করিডরে টহলদারী রাতের ওয়ার্ডারদের বুটের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি। হাতে লণ্ঠন। প্রতিটি সেলে আলো ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে। সেণ্ট্রাল টাওয়ারে সান্ত্রী ওঠা নামা করছে। এক একটি করিডরের মুখে এসে দাঁড়ানো মাত্রই, লোহার দরজার ওপাশ থেকে টহলদারী ওয়ার্ডার হাঁকছে—বিশ সেলকা ফটক বন্ধ হ্যায়, চার ওয়ার্ডার ঠিক হ্যায়, বিলকুল সব ঠিক। আবার ফিরতি টহল। সান্ত্রী উঠে যাচ্ছে তিন তলায়। ওয়ার্ডার হাঁকছে—সব ঠিক হ্যায়। লণ্ঠন দুলছে, বুটের শব্দ। শূন্য ঘরের পাথরের দেয়াল বলছে—সৌখীন বন্দী, কল্পনায় কারাবাস বড়ই মধুর বিলাসিতা। কোথায় তোমার খাটো সাদা, হাফ ইজের। কোথায় তোমার ময়লা সাদা হাফ হাতা জামা। সাদা মাথার টুপি। কোথায় তোমার সেই মরচেধরা, কালি-মাখা, তেল জড়ানো লোহার থালা। কোথায় তোমার সেই আলকাতরা মাখানো মাটির কলসি, যাতে সারা রাত ধরে তোমার সুগন্ধী প্রাকৃতিক কর্ম জমে জমে, এই পাথরের খুপরি ঘরের বাতাস দূষিত করবে। তোমার সারা শরীরে কোথায় সেই মীর্জার নিপুণ হাতের চাবুকের দাগ। নারকেলের আঁশ পাকাতে পাকাতে, ঘানি ঘোরাতে ঘোরাতে তোমার হাতে কোথায় সেই ক্ষতের দাগ। দুপুরে কি তুমি রেঙ্গুন চালের চটকানা পিণ্ডি-গাঞ্জি খেয়েছো! তুমি কি ছ'শো মানুষের সঙ্গে খোলা জায়গায় বিবস্ত্র হয়ে ছোট্ট চৌবাচ্চা থেকে সমুদ্রের নোনা জল তুলে তুলে কোন রকমে স্নান সেরেছো! তুমি কি জান এই সেলেই ইন্দু গলায় দড়ি দিয়েছিল! তুমি কি জান, মাসে ৭৫ টাকার

পলিটিক্যাল পেনসান যোগাড় করার জন্যে স্বাধীন ভারতে অপমানিতের সংখ্যা কত! তুমি কি খবর রাখ দেশের বর্তমান রাজনীতির ছোড়দাদের হাল চাল কী রকম। তুমি কি বিপ্লবীদের শেষ জীবন দেখেছ। তুমি কি জান—এই দ্বীপের বড়কর্তার বিলিতী কুকুর মাসে কত টাকার মাংস খায়। মদের বিল কত টাকা ওঠে। কোন্ অধিকারে তুমি এই সেলে! তোমার মত লক্ষ্যভ্রষ্ট, চরিত্রহীন, জীবন বিলাসী।

বন্ধ ফটক সামান্য ঠেলে খুলতে গিয়েই ঘাড়ের শির টেনে ধরল। বিপ্লবী বাঙালীর বীর উত্তরপুরুষ আমি। চায়ের কাপে দেশোদ্ধার করি। বাসে পা মাড়িয়ে দিলে, গালগলা ফুলিয়ে শালিক পাখির মত ঝগড়া করি। জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে জগৎ দেখি। মনের ওপর বিশাল ওজনের পাথর। একেবারে শেষ প্রান্তে একটি সেলের সামনে আমাদের অবশিষ্ট দল। দিল্লীশ্বর সিগারেট ধরিয়েছেন। রাজনীতির তীর্থস্থানে উপযুক্ত আচরণ। ধূপের ধোঁয়ার বদলে এঁটো তামাকের ধোঁয়া। বিশেষত সেই সেলের সামনে—যেটা সেলের-সেল। অন্যগুলোর থেকে পৃথক আলাদাভাবে লোহার বাঁধনে বাঁধা। এই সেলে কেটেছে—বীর সাভারকরের নির্জন কারাবাসের দিন। এর নাম—সলিটারি সেল। সাভারকরের ছবি ঝুলছে। মেঝেতে একটা টেপ রেকর্ডার বাজছে, শ্রীমতী ছায়া লুটিয়ে পড়ে কাঁদছেন। রেকর্ডারে বাজছে—সাভারকরের টেপ করা বক্তৃতা। ছায়া পুণে থেকে সঙ্গে এনেছেন। আমার মত ছায়াও অতীতের ভাবে ভারাক্রান্ত।

হর্সে আমাদের টাওয়ার হাউসের কাঠের ছাদে নিয়ে গেলেন। প্রাচীন সিঁড়ি একটু একটু আর্তনাদ করছে। ছাদ থেকে চার পাশটা বেশ স্পষ্ট হল। জেলের চার পাশের পাঁচিল সাধারণ জেলখানার চেয়ে এত নীচু কেন? কারণ, এর চেয়ে উঁচু পাঁচিলের কোনো প্রয়োজন ছিল না। চারপাশ ঘিরে রেখেছে সহস্র মাইল সমুদ্রের বেড়। পালাবে কোথায়। জঙ্গলে গিয়ে ঢুকবে, জারোয়ারা তীর মেরে শেষ করে দেবে। শেষ যদি নাও করে—খাদ্য আর জলের অভাবে মরে ভূত হয়ে যাবে। কয়েক হাজার স্যাণ্ডফ্লাই কামড়ে সারা শরীরে ঘা করে দেবে।

সন্ধে নেমে আসছে, চারপাশ লাল করে। আন্দামানে তেমন পাখি নেই, কাক নেই। আকাশের গায়ে তা না হলে এই সময় অসংখ্য বাসায় ফেরা পাখির ঝাঁক দেখা যেত। বিশাল বিশাল গাছের মাথার উপর এমন বিষন্ন নির্জন আকাশ তাহলে দেখা যেত না। এ যেন মরুভূমির ওপর রাত নেমে আসছে। সৌখীন ছোট ছোট বাঙলোয় আলো জ্বলে উঠছে, টিপ টিপ করে। নিচে এখনও যে জেল রয়েছে তার কম্পাউণ্ডে এক সার কয়েদী গাছের তলায় এনামেলের থালা হাতে রাতের খাবারের অপেক্ষায়, আতুর

গায়ে ক্লান্ত হয়ে বসে আছে। অপরাধীদের দ্বীপ আন্দামানে তো কোনো অপরাধ নেই। তবে এই সব অপরাধী।

হর্সে বললেন—চুরি, ডাকাতি, ছেনতাই নেই, তবে দু-একটা খুনখারাপি আছে। মেয়েছেলে নিয়ে, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে, সেই আদ্যিকালের বদ্যি-পাপ। এখানে জলের যেমন অভাব, মেয়েছেলেরও অভাব। ছটফটে শরীর। একটু ঝামেলাটামেলা হতেই পারে। তারপর ওই চোলাই আছে। ইললিসিট ডিসটিলারি। দেখেননি, বাজারের কাছে একটা বাড়ির বাইরে লেখা আছে—লিকার স্টেশন।

—ইয়েস! দেখেছি। ওটা কি বেশ বড়সড় দোতলা একটা মদের দোকান!

—আরে না মশাই। মদের দোকান পাচ্ছেন কোথায়! ওটা মদ ধরার স্টেশান। বে-আইনী মদের কারবারীদের ধরে প্রথমে ওইখানে রাখা হয়। দুটো ডব্লুতেই আমাদের একটু বিপদে ফেলেছে—উয়াইন আর উওম্যান।

কথা শুনতে শুনতে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছিলুম—প্রবীণ, নবীন, সব বয়সের অপরাধীরাই রয়েছে। দূরে একটা পাহাড় ক্রমশ চোখের জলের মত ঝাপসা হয়ে আসছে। হর্সে বললেন, ওই সেই মাউন্ট হ্যারিয়েট। হোপটাউন জেটি থেকে আড়াই মাইল দূর। ১১৯৬ ফুট উঁচু। ব্রিটিশ আমলে এই দ্বীপের তৃতীয় সুপারিনটেনডেণ্ট কলোন্যাল আর সি টাইটলারের স্ত্রীর নাম ওই পাহাড়ের নামে আজও বেঁচে আছে। মাউন্ট হ্যারিয়েট এই দ্বীপের গ্রীষ্মাবাস, স্যানাটোরিয়াম। বড় অপূর্ব জায়গা। পাহাড়ের মাথার ওপর সারা বছরই মেঘের উষ্ণীষ। সারা বছরই নাতিশীতোষ্ণ। পাহাড়ের শীর্ষ থেকে বন্দরের দৃশ্য ছবির মত পরিষ্কার। সমস্ত দ্বীপ যেন দূরবীনের দৃষ্টিতে ভাসছে। এই স্যানাটোরিয়াম দেখতে এসেই লর্ড মেয়ো খুন হলেন। সেদিনও ছিল এমনি সন্ধ্যা, রক্তরাঙা আকাশ। ফেব্রুয়ারি ৮, ১৮৭২ সাল। লর্ড মেয়ো পাহাড়ের ঢালু পথে নেমে এসে, হোপটাউন জেটির সামনে সবে দাঁড়িয়েছেন। লাফিয়ে উঠল ওহাবি-শেরআলির ভোজালি। মেয়োর রক্তের দাগ মাউন্ট হ্যারিয়েটের পাথরে লেগে আছে।

আর, কত রক্ত যে লেগে আছে এই জেলের পাথরের দেয়ালে। হর্সের সঙ্গে নেমে এসেছি জেল কম্পাউণ্ডের টর্চার-চেম্বারে। লোহার তৈরি 'ফ্লগিং ট্র্যাঙ্গল', বাঙলা নাম 'টিকটিকি', আবছা আলোয় ইংরেজের দুরভিসন্ধির মত ওত পেতে আছে। জেলার সাহেব লালাজীকে আটকে পশ্চাদ্দেশে বেত মারার কায়দাটা না মেরেই দেখালেন। সামান্য সামান্য কারণেই শিক্ষিত পাঠান সর্দারদের বেত নেমে আসত কয়েদীদের উন্মুক্ত পাছায়। ছবারের বেশি মারার নিয়ম ছিল না। নীতিনিষ্ঠ ইংরেজ। বাট

থ্রি ওয়্যার এনাফ টু ওপন আপ দি ফ্লেশ।

দেখালেন কুখ্যাত ঘানি। রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে প্রতিদিন ১০ পাউণ্ড সরষের তেল, ৩০ পাউণ্ড নারকেল তেল বের করার পরিমাপ নির্দিষ্ট ছিল। অসম্ভব ব্যাপার। না পারলেই চাবুক। সকাল পাঁচটা থেকে রাত দশটা, ঘানি ঘুরেই চলেছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। জল মাত্র দু কাপ বরাদ্দ। বেশি আর এক কাপ চাইলেই, পাঠান সর্দারের খিস্তি—তোর বাপের জল খা। সাধারণ খুনী আসামীরা বরং সুখে ছিল। তারা জমাদার হত, টিণ্ডাল হত। অহিন্দু, দুর্ধর্ষ, শয়তান আসামীরা ওয়ার্ডার হত, মুক্তি পাগল ছেলেদের পিটিয়ে, অত্যাচার করে ডিমর‍্যালাইজ করে দেবার জন্যে। বীর ইংরেজ মোটেই ভয় পেত না এই সব অ্যানার্কিস্টদের। যত ভয় পেত গান্ধী প্রমুখদের অসহযোগ আন্দোলনকে। এঁদের চেষ্টায় স্বাধীনতা আসেনি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কোনও ভূমিকা ছিল না। নেতাজী এক স্বপ্নবিলাসী ফিফ্‌থ কলামিস্ট। এই বার হর্সে আমাদের নিয়ে এলেন ফাঁসি-ঘরে। পাশাপাশি দুটি ঘর। ঘরের তলায় ঘর। কাঠের মঞ্চ। অতি রোমান্টিক ফাঁস ঝুলছে। মোটা মসৃণ দড়ি। ফাঁসটি গলায় বেশ গুছিয়ে বসার জন্য পেতলের স্লিপ লাগান। ফাঁসের ঠিক তলায় সাদা গোল বৃত্ত। একপাশে লিভারের হাতল। ঘরের কোথাও এতটুকু ধুলো নেই, ঝুল নেই। প্রতিদিন সযত্নে পরিষ্কার করা হয়। হর্সে ফাঁসের গায়ে স্নেহের হাত বুলিয়ে বললেন, একটু খসখসে হয়ে গেছে। ফাঁসির তিন দিন আগে থেকে দড়িতে গ্রিজ মাখাবার নিয়ম, যাতে সড়াক করে ফাঁসটি গলায় চেপে বসে ঘাড়ের কাছে প্রয়োজনীয় ধাক্কাটা মারতে পারে। ভেবেছিলুম হর্সে হয়তো এখানেও একটা ডিমনসট্রেশান দেবেন এবং এবারেও দুঃসাহসী লালাজী এগিয়ে যাবেন। না, মৃত্যু নিয়ে খেলা করার ইচ্ছে কারুর নেই। আমরা পাশে সরে দাঁড়ালুম। জেলার সাহেব লিভারে একটা হ্যাঁচকা মারলেন, গোল দাগের জায়গা থেকে পাটাতনটা খুলে ঝুলে পড়ল। আমরা সিঁড়ি ভেঙে নিচেয় খুপরিতে গেলুম। ফাঁসি হবার পর যেখানে ডাক্তার এসে লাশ পরীক্ষা করে মৃত্যুকে স্বীকৃতি দেন, যেখান থেকে মৃতদেহ খালাস করা হয়। মারবার জন্যে কত সুন্দর আয়োজন। এই ঘরে শেষ ফাঁসি হয়েছে ৩৭ বছর আগে ১৯৪১ সালে।

সেই ঝাঁকড়া পিপুল গাছের পাশ দিয়ে প্রদোষের অন্ধকারে আমরা সমতলে নেমে এলুম। অসংখ্য ছবি আর শ্বেত প্রস্তরফলকে সে যুগের বিপ্লবীরা আবার তালাবন্ধ হয়ে গেলেন। একটা ব্লকে বিপ্লবের মিউজিয়াম। সব ছবি এখনও সংগৃহীত হয়নি। আর একটা ব্লকে রান্নাঘর। ধোঁয়া উঠছে। তৃতীয় ব্লকে স্থানীয় জেল। সান্ত্রীরা হাঁকছে

—খানা শেষ। এতক্ষণ পরে কোথায় বসে প্যাঁচা ডাকছে—হুট, হুট, গেট আওট, গেট আওট।

আন্দামানের গাড়ির নিয়মই হল—হয় ডান, না হয় বাঁদিকে কেতরে চলা। ড্রাইভার বললেন—রাস্তাই নাকি ওই কায়দায় তৈরি। ন্যাভাল ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি তো। ওঁরা জল আর স্থল এক করে ফেলেছেন—স্থলপথে চললেও যেন মনে হয়, টাল খেতে খেতে জাহাজে চলেছি। মজুমদার বললেন, তা নয় আসলে গাড়ির চাকাগুলোরই মাপ ঠিক নেই! একদিকটা বেশি ক্ষয়ে গেছে।

মজুমদারের জঙ্গলীঘাটের সরকারী কোয়ার্টারে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ। এদিকে সমুদ্র খাঁড়ি হয়ে কিছুটা ঢুকে এসেছে। জায়গাটা পোর্টব্লেয়ারের চেয়ে একটু নীচু। এখানেই তৈরি হয়েছে, ছোট বড় সরকারী কর্মচারীদের জন্যে ছোট, মাঝারি, বড় কোয়ার্টার। তিনতলা, চারতলা আধুনিক সব ব্লক। পোর্টব্লেয়ারে ইটের তৈরি বাড়ি হাতে গোনা যায়। জঙ্গলীঘাটে জঙ্গল ছিল, জঙ্গলী ছিল, এখন থাকেন সরকারী কর্মচারীরা, তাঁদের স্ট্যাটাস আঁকড়ে, নিজেদের অভিযোগ আর অশান্তি লালনপালন করতে করতে।

প্রথম অশান্তি—লোডশেডিং। মজুমদারের লম্ফজ্বলা বসার ঘরে, 'ডার্ক-টি'র আসর। কংক্রিটের বাড়ির দুঃসহ গরমে, হাতপাখা নড়ছে, হাতে হাতে। চায়েতে কফিতে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মজুমদার ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে ফোন করে করুণ গলায় বললেন—হাম মজুমদার, থোড়াসে পাওয়ার দিলা দিজিয়ে। মজুমদারের অন্য অনেক পাওয়ার থাকলেও, পাওয়ার আনার পাওয়ার নেই। এদিকে আমন্ত্রিতদের ঘন ঘন জল খাওয়ার ঠেলায় মজুমদার-গৃহিণীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। গেলাস উল্টে যাচ্ছে, কাপে পেনাল্টির কিক। আন্দামানে রোগা, শীর্ণ লোকের সংখ্যা কম। মজুমদারের সেটাও একটা অসুবিধে। ভল্যুম নিয়ে বিব্রত। হিসেব সব সময় গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশী কাপ, ডিস, ফার্নিচার, গেলাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েই চলেছে। গৃহস্বামীকে ধরে চেপে বসাতে না পারলে চা আমাদের চতুষ্পদ প্রাণীর মত মেঝে থেকে চেটে খেতে হবে। ছায়া আর আমি মজুমদার-গৃহিণীকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে গেলুম। সাবেক আমলের মহিলাদের মতন চালচলন। উগ্রতা নেই। দুটি সন্তানের জননীর যেমনটি হওয়া উচিত।

এইখানেই আলাপ হল, ভারত সরকারের নৃতত্ত্ববিদ, ডঃ টি এন পণ্ডিতের সঙ্গে। প্রকৃতই পণ্ডিত মানুষ। বেশ একটা গভীরতা তৈরি করেছেন নিজের দেখা, শোনা আর জানার জগতে। জানানোর মধ্যেও একটা স্বকীয়তা আছে।

পোর্টব্লেয়ারের হাওয়া ভেজা নীল রাতে, মৃদু আলোকিত নারকেল সারির ভেতর দিয়ে পথ করে নেওয়া প্রায় নির্জন পথে, সরকারী ব্যবস্থাপকদের বিদায় জানিয়ে, আমরা কয়েকজন প্রকৃত জীবনের খোঁজে বেরিয়েছি। সমুদ্র অনেক দেখলুম, এখনও দেখব। সরকারী ফিরিস্তি অনেক শুনলুম, এখনও শুনবো। ওঙ্গি জারোয়া, আন্দামানিজ শুনে শুনে পৃথিবীটা প্রায় জারোয়াময় মনে হতে শুরু হয়েছে। এবার একটু জনপদ দেখতে চাই। সাধারণ মানুষের জীবন দেখতে চাই। মহল্লায় ঢুকে সেই সব পরিচিত দৃশ্য চোখে পড়ে কিনা দেখতে চাই। ডাক্তারখানায় বৃদ্ধদের আড্ডা। কবিরাজী ওষুধের দোকান। বৃদ্ধ কবিরাজ, চারপাশে বন্ধুর মত প্রবীণ রুগী। মদনানন্দ মোদকের প্ল্যাকার্ড। একচোখে ঠুলি লাগানো, সামনের দিকে ঝুঁকেপড়া ওয়াচ রিপেয়ারার। ফ্যাঁস ফোঁস হাপরটানা ছোট ছোট কামারশাল। ফার্নিচারের দোকান। মেঠাইয়ের দোকান, বিশাল কড়ায় কৃত্রিম সর ভাসা দুধ। বুকের ওপর গেঞ্জি তুলে নাদাপেট মালিক দুটো মগে দুধ একতলা, দোতলা করছে। কলের সামনে বালতির লাইন। হারমোনিয়ামে গান সাধছে কোনো মেয়ে— বাঁধো না তরীখানি। প্রবীণ শিক্ষক ছাত্র পড়াচ্ছেন। রকে বসে যুবকোচিত আড্ডা। এঁকেবেঁকে লাট খেয়ে বেড়াচ্ছে কোনও প্রেমিক সাইক্লিষ্ট। ঝাঁ করে ডাল সাঁতলাচ্ছেন কোনো গৃহিণী।

না, এসব কোনো পরিচিত দৃশ্যই চোখে পড়ল না। পথ আছে। নিরীহ পথিক আছে, অল্পস্বল্প গাড়ি আছে। ছোটো ছোটো বাংলো আছে। হাওয়ায় দোলা লতাকুঞ্জ আছে। মৃদু রেডিও আছে! কোলাহল নেই। ছুটোছুটি, ঠোকাঠুকি, ধস্তাধস্তি নেই। পাতলা সরের মত হালকা খোসার মত, জীবন। নখ দিয়ে সরালেই সরে যাবে। বেশ গুচ্ছমূল, কামড়েধরা জীবন-বৃক্ষ গজিয়ে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তেমন জোরালো ধর্মীয় চেতনা নেই, তেমন আচ্ছন্ন করে রাখার মত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নেই, বেশ জড়িয়ে ধরার মত সমাজও নেই। সবাই যেন 'দো দিন কা রাহী'। সারা দ্বীপটা যেন বিশাল একটা হোটেলের মত। আজ আছি কাল নেই—এই ভাব। রহস্য উপন্যাসে পড়া রাস্তায় যেন হাঁটছি। কেবল গ্যাসের আলো নেই, ফিসফিসে চরিত্র নেই, টুপিপরা পথচারী নেই, রহস্যজনক গাড়ি নেই। শুধু হাওয়া, পাতার শব্দ আর সমুদ্রের গর্জন। মানুষ এখানে জীবনের জড় নামাতে পারেনি, সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি। না ইংরেজ শহর, না বাঙালী শহর। মাদ্রাজ নয়, বোম্বাই নয়, কলকাতা নয়, নৈনী নয়, কিছুই নয়। মন কেমন করা পরবাস! জল ভেঙে ডাঙ্গায় এসে উঠেছেন বিভিন্ন জাতির মানুষ। ভাগ্য

এনেছে! জীবিকা ঘাড় ধরে নিয়ে এসেছে!
ভাষা ধরে জনসংখ্যাকে নাড়া দিলে যা ঝরে পড়বে তা হল: বাঙালীর সংখ্যা ২৮১২০, হিন্দী ভাষী ১৮৪৯৯, মালয়ালাম ১৩৯৫৩, তামিল ১৪৫১৮, তেলুগু ৯৩৬১, উর্দু ২৪৮৮, পাঞ্জাবী ১০২৩, গুজরাতি ১৫৯, ওড়িয়া ২৫০, নেপালী ২৫০, খারিয়া ১১৬৬, ওঁরাও ৩২১৫, মুণ্ডা ১০৬৫, নিকোবারিজ ১৭৯৫৫। বাঙালীর সংখ্যা নেহাত কম নয়; কিন্তু বাঙালীর তেমন দাপট নেই, কারণ বাঙালী এখানে আশ্রিত। দয়া করে থাকতে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুর সংখ্যা ৭০১৩৪, মুসলমান ১১৬৫৫, খৃষ্টান ৩০৩৪২, শিখ ৮৬৫। সব মিলিয়ে কোথাও কোনো বিশেষ ধর্মের প্রভাব পড়েনি। এখানে ধর্ম একটাই—বাঁচার ধর্ম।

পোর্টব্লেয়ারের ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে, সিপপিঘাট। তার একটু আগে ধনিকাড়ি ড্যাম। পোর্টব্লেয়ারকে মিঠে জল সরবরাহের জন্যে ১৯৭০ থেকে '৭৩ সালের মধ্যে তৈরি। ড্যামের পরিকল্পনা ও তৈরির কাজে—সি ই পি ব্লেয়ার ও ইঞ্জিনিয়ারবাহিনী। খুব বড় না হলেও এই ড্যাম আগামী তিরিশ বছর ধরে পোর্টব্লেয়ারের বর্তমান লোকসংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক লোককে জল সরবরাহ করতে পারবে। লম্বায় ১৩২ মিটার, উচ্চতায় ৩২ মিটার। ৪০৭ কোটি লিটার জল ধরে রাখা যায়।
পানীয় জলের জন্যে, সেচের জন্যে আন্দামান বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল। মাটি স-ছিদ্র। জল ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। মাটি খুঁড়লে কোনো সঞ্চিত জলাধার পাওয়া যাবে না। ভূপৃষ্ঠের গঠন কচ্ছপের পিঠের মত। সারা বছরে শুকনো দিনের সংখ্যা ১০০ দিনের বেশী হবে না। ২৬৫ দিনই অনবরত বৃষ্টি বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির জল গড়িয়ে সমুদ্রে হারিয়ে যাবার আগেই জলাধারে ধরে রাখার ব্যবস্থা। ধনিকাড়ি জলাধারটি সেইভাবেই পাহাড়ের কোলে বসানো হয়েছে। বর্ষার ধারা নেমে এসে জমা হচ্ছে সারা বছর। সেখান থেকে পাম্প করে পাঠানো হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনে। এই দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর সর্বাধিক বর্ষণসিক্ত অঞ্চলগুলির অন্যতম। আসাম কিংবা কেরালার চেয়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী। '৬১ সালে পোর্টব্লেয়ারের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ রেকর্ড হয়ে আছে—৪৩৬২.৪ মিলিমিটার। ড্যামের মাঝামাঝি গিয়ে জলের দিকে একবার উঁকি মেরে তাকালুম। জলের রঙ কেমন যেন একটু সবুজ সবুজ। এক ধরনের পচা গন্ধ উঠছে। কি জানি, এই জল কতটা স্বাস্থ্যকর। চারপাশের পাহাড়ে বেতের জঙ্গল। এখানে পাখি যে কেন এত কম। এমন জলাধার। কেমন কংসাবতীর মত, ঝাঁক ঝাঁক টিয়া উড়বে! কোথায় কি। কাকস্য পরিবেদনা!

ধনিকাড়ি থেকে পেছিয়ে এসে জিরকাটাঙে যাবার জন্যে আবার আমরা ট্রাঙ্ক রোড ধরলুম। কিছু দূর যাবার পরই বাঁদিকে একটি বাঙালী চোখে পড়ল। ইতিমধ্যে আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি। আমরা আমাদের মত চলব। আমাদের যাঁরা 'দেখো দেখো আন্দামান দেখো' বলে লাগেজের মত ঘুরিয়ে মারছেন তাঁদের সঙ্গে আমরা চোর-পুলিস খেলব। থামাও গাড়ি। মাঠ ভেঙে সেই কৃষক কুটিরে এগিয়ে গেলুম। লাউমাচার তলা দিয়ে গুঁড়ি মেরে। পিঠে লাউয়ের মুগুর অল্পস্বল্প আদর জানাচ্ছে। খাতিরের কোনো অভাব হল না। খেতের শশা সহযোগে মুড়ি, ধনিকাড়ির জল—গেলাস গেলাস। চায়ের জন্যে মহিলাদের ঝুলোঝুলি। চা বাতিল করে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল।

রাস্তাটা একটা জায়গায় এসে দুভাগ হয়ে গেছে। বাঁদিকে বেঁকে চলে গেছে জিরকাটাঙ। সোজা গেলে সিপপিঘাট। মোড়ের মাথায় ছোট্ট একটা বাজার মত জায়গা। সেখানে হাত তুলে এক ভদ্রলোক গাড়ি থামালেন।

—আপনারাই প্রেস পার্টি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোথায় চলেছেন ?

—জিরকাটাঙ।

—সে কি, আর আমরা ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও ভোর ছটা থেকে সিপপিঘাট ফার্মে আপনাদের অপেক্ষায় বসে আছি।

—তাতো জানি না! প্রোগ্রাম আমাদের চালাচ্ছে। যেখানে নিয়ে যাচ্ছে যাচ্ছি। তবে সম্প্রতি আমরা স্বাধীন হয়েছি। কি করতে হবে বলুন ?

ডক্টর দাস বোধ হয় কৃষি বিভাগের ডিরেকটার। বললেন—সিপপিঘাট ঘুরে জিরকাটাঙ যেতে হবে। সিপপিঘাট না দেখলে কিছুই দেখা হল না।

—তথাস্তু।

আগে চলল দাস সাহেবের জিপ, পেছনে আমাদের গাড়ি।

প্রকৃতই দেখার মত আয়োজন। ৩২ হেকটার জমির ওপর গাছপালার পরীক্ষা। '৭১ সাল থেকেই চলছে। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। কোথাও কাশ্মীর, কোথাও সুন্দরবন। ফুল আছে, ফল আছে, মশলা আছে। বড় গাড়ি ছেড়ে, ছোট জিপে আমরা সর্বোচ্চ শীর্ষে, চারপাশ খোলা, পাতায় ছাওয়া একটা ঘরে এসে দাঁড়ালুম। যেন গান হিল। সেখানে টেবিলের ওপর থরে থরে ফল সাজানো। আনারস, পেঁপে, জামরুল, কাজু, পাকা কোকো ফল। ছোট ছোট প্ল্যাস্টিকের মোড়কে—ডালচিনি,

লবঙ্গ, জায়ফল, মরিচ। তিন চার জাতের কলা।

আমরা ঘুরে ঘুরে মশলার বাগান দেখলুম—তেজপাতা, ডালচিনি। লবঙ্গ গাছে মোটা মোটা লবঙ্গ ধরে আছে। জায়ফল গাছে লাল ফল। হিংগাছের গা থেকে আঠা আঠা হিং ঝরছে। কর্পূর গাছের পাতা চটকালেই গন্ধ! কোকো পড পেকে ঝুলছে। নীচের দিকে মানুষ সমান উঁচু নারকেল গাছে বড় বড় কিং কোকোনাট। স্বপ্ন যদি কোথাও বাস্তব হয়ে থাকে, এখানেই হয়েছে।

এর কাছে জিরকাটাঙ একটা অগোছালো জঙ্গল। সিপপিঘাটে যা আছে জিরকাটাঙে তাই আছে, এলোমেলোভাবে। বাড়তি যা তা হল কফি গাছ। থোকা থোকা কফি ফুল এখানেই দেখলুম। আর দেখা গেল জারোয়াদের উৎপাত! সাত সকালেই তীর খেয়ে পড়ে আছে একজন শ্রমিক। আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে সঙ্গের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে অলকের বচসা প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে গেল। হোয়াট ডু ইউ মিন, হোয়াট ডু ইউ সে। দুজনে এই চলল কিছুক্ষণ। মাঝখান থেকে জিরকাটাঙ আর দেখা হল না। একটা বিশ্রী গাছের ছায়ায় উঁচু, নীচু জমিতে কিছুক্ষণ বসে রইলুম। তেমনি গরম। ব্রিজ অন দি রিভার কোয়াইয়ের ডেভিড নিভেনকে মনে পড়ছিল। ঝাঁঝাঁ রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মাথা ঘুরছে। জল তেষ্টা, চা তেষ্টা, খিদে, ধড়াস করে শুয়ে পড়ার ইচ্ছে—নানা রকমের ইচ্ছে ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে। এসব জায়গায় দ্বিতীয়বার আসা যাবে কিনা কে জানে! এঁরা বয়কট করে বসে থাকতে চান, বসে থাকুন। আমি বরং দেখেই নি ব্যাপারটা কী। বিশ হেকটারের খেলোয়াড় জঙ্গল। সরকারী রিপোর্টে বিশেষণ—প্রজেনি ফার্ম। বাংলায় যদি বলি—জাতক জঙ্গল। আদি জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে, সরকারী অর্থে কিছু কফি, কোকো, লবঙ্গ, তেজপাতা, ডালচিনি লাগিয়ে ইংরেজীতে এক প্যারা লিখে দাও:

Now the department has made a break through by establishing a progeny farm of about 20 Hects at Jirkatang which would produce…

এক লক্ষ মরিচ চারা, দশ থেকে বিশ হাজার লবঙ্গ চারা, জাঁয়ফল আর ডালচিনি চারা তিন বছরের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। তবে কিনা চারা তৈরির জন্যে চারা চাই। সে চারা আসবে কোথা থেকে! আসবে তামিলনাড়ু আর কেরালা থেকে। কিন্তু! কিন্তু চারা আনানোর খরচ ভীষণ, আসার পথে মরেও অনেক। তার মানে চারার দাম পড়ে যাবে অনেক। সোনার চারা। আলেকজাণ্ডার ডুমার ব্ল্যাকটিউলিপ। তা পড়ুক। ইতিমধ্যে এই দ্বীপের সরকারী অফিসাররা মশলা চাষ শিখতে দেখতে দেশে বিদেশে স্টাডিটুর করে এলেন। বাইরের একসপার্ট, স্থানীয় একসপার্টরা দ্বীপ দ্বীপান্তরে প্রচার অভিযানে গেলেন—লাগো ভাই, লেগে যাও মশলা চাষে। স্পেন 'দূর অস্ত' নয়। স্পেন তোমাদের এই দ্বীপ!

কিন্তু! আবার কিন্তু কিসের। সবই তো হল, প্রজেনি ফার্ম হল, চারা হল, ট্রেনিং হল, প্রচার হল। তা হল। কিন্তু জমির কি হবে! কেন? এক লক্ষ পনেরো হাজার লোক, তার মধ্যে কৃষক তো মোটে ৬২৬৮, ওদিকে দ্বীপের আয়তন ৮২৯৩ বর্গ কিলোমিটার। অসুবিধেটা কোথায়! অসুবিধে হল—৭ কি ৮ পারসেণ্ট জমি চাষবাসের জন্যে বের করা গেছে, তার মানে ১২৫০০ হেকটর কৃষি জমিতে যা কিছু সব করতে হবে। জমি বাড়াতে হলে গাছ কাটতে হবে। গাছ কাটলে ভূমি ক্ষয় ঠেকানো যাবে না, 'ইকোলজিক্যাল ব্যালেনস' নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং, সিপপিঘাট, ধনিকাড়ির পাশে জিরকাটাঙ 'একসপেরিমেণ্টাল', 'প্রজেনি' ফার্ম হয়ে যেমন আছে তেমনি থেকে যাবে। মশলা দ্বীপে দারুচিনি কি লবঙ্গ ফুলের ঝটকা সুগন্ধ কোনো পথভোলা পথিককে আকুল করে তুলবে না। তবে আর কি—খেল খতম, পয়সা হজম।

মিশ্রিত চাষের নাকি চেষ্টা চলছে। উঁচু নীচু পাহাড়ী জমি। বড় বড় গাছের ছায়া-শীতল পাদদেশে কফি ও কোকো লাগান হবে। সর্বোচ্চ ঢালে নারকেল তারপর মরিচ, মরিচকে ছায়া দেবে শিমূল। তারপর এক ধাপ নেমে এসে লবঙ্গ আর জায়ফল। এর পর লাগান যেতে পারে কলা। এইভাবে গাছ লাগালে শিকড়ে শিকড়ে কামড়াকামড়ি করে ভূমিক্ষয় আটকে রাখবে, আগাছা দমন করবে। আর তিন থেকে পাঁচ বছর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলে কৃষক কলা বেঁচে হেকটর প্রতি হাজার

দুয়েক টাকা রোজগার করতে পারবেন। মরিচ, কফি আর কোকো থেকে হেকটর প্রতি ৪ হাজার টাকা। সাত বছরের মাথায় লবঙ্গ আর জায়ফলে ফুল এসে গেলেই হেকটর প্রতি রোজগার ১০ হাজার টাকা। কৃষকের খরচ, প্রথম বছরে প্রতি হেকটরে ৩ হাজার টাকা তারপর দেড় থেকে দু হাজার টাকা। এইভাবে একটা যুগ পার করতে পারলেই এক হেকটর জমি থেকে বছরে কৃষকের আয় হবে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। সুন্দর গোলাপী ছবি! তবে কিনা? আবার কি হল! গাছ যদি না বাঁচে! চারা যদি না ধরে! ভয়ঙ্কর পোকার উপদ্রব। 'পেসটিসাইড' বা সারের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

তবে পালাই চল। গাড়ি স্টার্ট নিল। মঙলুটনে রবারের চাষ দেখা হয়ে গেছে। লম্বা লম্বা রবার গাছ। পেট চিরে দুধ বের করা হচ্ছে। পাশেই কারখানা—রবার শিট তৈরি হচ্ছে! শ্রমিকরা সব কেরালার। হইহই করে গাড়ি গড়িয়ে চলেছে। পথের পাশেই অপূর্ব সমৃদ্ধ এক জনপদ। বলতে লজ্জা নেই এত ঘোরাঘুরির পর এই প্রথম সুন্দর রমণী চোখে পড়ল। এর নাম বাটু বস্তি। উত্তরপ্রদেশের এক ডাকাতের বংশধর। সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে একটা গ্রাম তৈরি করে ফেলেছে।

সারাটা পথ অলোক ভীষণ উত্তেজিত। তার বক্তব্য—নিরাপত্তার প্রশ্নে উত্তেজিত বাক্যবাগীশ অফিসার তাকে যেভাবে অপমান করেছেন তার একটা প্রতিকার এই মুহূর্তে হওয়া চাই। বাটু বস্তির কাছে গাড়ি থামিয়ে দু একজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে—এই রাস্তাটাই গোলমেলে। মাঝে মাঝেই জারোয়ারা সফরিতে আসে এবং সেইভাবেই প্রস্তুত থাকতে হয়। অলোক বলছেন—আমরা ফেরার পথে চিফ সেক্রেটারির বাড়ি হয়ে যাব। আমাদের অভিযোগটা জানিয়ে যাওয়া উচিত। আলোককে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। লালাজী, ছায়া, আমরা সকলেই বোঝাতে বোঝাতে চলেছি—এই ঠিক-দুপুরে ভদ্রলোকের আহারাদি, বিশ্রামের সময় বিরক্ত না করে, বিকেলে তো দেখা হবেই, তখন না হয় বলা যাবে।

বেচারা ড্রাইভার বড়ই বিব্রত। বিভিন্ন ধরনের নির্দেশে গাড়ির গতি কমে এসেছে। অলোক বলছেন—চিফ সেক্রেটারিকা বাঙলো। আমরা তাকে শান্ত করে যেই বলছি—ট্যুরিস্ট লজ। অলোক সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে গিয়ে বলছেন—নেহি নেহি চিফ সেক্রেটারি। মহা সমস্যা!

সমস্যার সমাধান করে দিল—কালো রঙের একটা অ্যামবাসাডার! গাড়িটা হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমাদের গাড়ির আগে আগে চলেছে। মজুমদার বললেন—ওই তো চিফ সেক্রেটারির গাড়ি! চিফ সেক্রেটারির গাড়ি ট্যুরিস্ট লজের দিকেই

চলেছে। ভালই হয়েছে। গরম গরম ফয়সালা হয়ে যাবে—ঔদ্ধত্য ভার্সাস সাধারণ ভদ্রতা। ট্যুরিস্ট লজের হাতায় ঢুকে আবিষ্কার করা গেল, গাড়িটা খালি। তা হলেও গাড়ি যখন এসেছে মালিকও আসবেন ; কিংবা এসে বসে আছেন। কোথায় আছেন, সন্ধান করে নিতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। ইতিমধ্যে বিলম্ব মধ্যাহ্ন ভোজনটা সেরে ফেলা যাক।

পেছনের প্রশস্ত সিমেণ্ট বাঁধানো চাতালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক বেশ কাবু হয়ে বাগান চেয়ারে হাতপা এলিয়ে পড়ে আছেন। এঁরা এসেছেন আন্দামানে হিমালয়ের সন্ধানে। কণ্টিনেণ্টাল ড্রিফটে আরও নতুন কিছু তথ্য যোগ করার জন্যে গত তিনদিন ধরে বিভিন্ন দ্বীপে নানা রকমের পাথর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রশাসনের তরফ থেকে খুব একটা সাহায্য পাচ্ছেন না বলে খুব ধকল যাচ্ছে ক'দিন। ভরদুপুরে ওঁরা কফি খাচ্ছেন। পাথর পাথর করে নাওয়া খাওয়া মাথায় উঠেছে। গবেষণার এমনই শরীর ভোলানো নেশা।

আমাদের বিস্বাদ 'কোল্ড লাঞ্চ' খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হল। খবর এসেছে 'মেগাপডনেস্টে' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামকৃষ্ণ যাদব আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন—প্রেস কনফারেন্স। জিরকাটাঙ বয়কট করলেও মন্ত্রীকে বয়কট করা চলে না। আমাদের কিছু জানবার আছে, জানাবার আছে।

'মেগাপডনেস্টে'র কোন তুলনা হয় না। ট্যুরিস্ট লজ থেকে কয়েক ধাপ নীচে নেমে সমুদ্রের দিকে একটা কার্নিস বের করে 'মেগাপডে'র শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত 'লাউঞ্জ' সারা বছর আমিরি চালে ঢেউ আর নীল আকাশ দেখছে, মেঘ আর ঝড়ের দৌরাত্ম্য দেখছে। আমরা দেখছি সপার্ষদ মন্ত্রীকে। ঘর ভরে গেছে সরকারী অফিসারে। ডেভালাপমেণ্ট কমিশনার, চিফ সেক্রেটারি, অন্যান্য দপ্তরের অধিকর্তারা, কয়েকজন স্থানীয় সাংবাদিক, সেই সাংবাদিক ভদ্রলোকও রয়েছেন, এয়ারপোর্টে যাঁর সঙ্গে প্রথম দিনই আলাপ হয়েছিল।

মন্ত্রীর পি এ তাঁর নোট খাতা থেকে সাঙ্কেতিক ভাষা পড়ে শ্রীযাদবের অভিজ্ঞতা এবং ভাবনা আমাদের শোনালেন। আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালী মন্ত্রী বা এম পি কষ্ট করে এই দ্বীপে আসেননি। বিভিন্ন সেটলমেণ্টে ছড়িয়ে থাকা বাঙালীদের জীবন সংগ্রাম দেখেন নি। এখানে বাঙালীদের নেতৃত্ব দেবার মত কেউ নেই। তাঁদের অভাব অভিযোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াই করার মত কোনও ব্যক্তিত্ব নেই। বাঙালীরা বড় কষ্টে আছে, ভয়ে ভয়ে আছে, ভিখিরির মত আছে। দেশের মূল জীবন আর সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই প্রথম যুগের পেনাল-সেটলমেণ্টের 'সেলফ সাপোর্টার'দের

মত তালগোল পাকিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। বেশ বড় ধরনের একটা নির্বাসন।
মন্ত্রী মহাশয়ের নোটে অসংখ্য 'করেঙ্গে'—২৩শে মার্চ, সকালে পাঁচদিনের সফরে আমি এসেছি। এর আগে কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এখানে আসেনি। আমিই প্রথম। এ পর্যন্ত আমি পোর্টব্লেয়ার ও সন্নিহিত এলাকা দেখলাম, দেখলাম কারনিকোবার, লিটল আন্দামান, নীল আইল্যাণ্ড। দেখলাম স্থানীয় আদিবাসীদের, শরণার্থীদের দেখলাম চাষবাস। আমি এসেছি এই দ্বীপের উন্নয়ন সম্ভাবনা দেখতে। আমি এসেছি এই দ্বীপের বিভিন্ন সমস্যা জানতে।
মন্ত্রীর মুখের সামনে একটা ট্রে ধরা হল, কফির কাপ সাজানো।
উধার, উধার লাগাও ভাই। কফি ছলকাতে, ছলকাতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। পি এ থেমে পড়েছিলেন। বক্তৃতায় কফির অনুপ্রবেশ। আবার পড়তে শুরু করলেন ঃ এই দ্বীপপুঞ্জ কত সুন্দর। কী অসীম উন্নতির সম্ভাবনা! বড়ই দুঃখের কথা, আজ পর্যন্ত কোনও উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরি হল না। আজ পর্যন্ত কেউ সেইভাবে এই দ্বীপের উন্নতির চেষ্টা করলেন না!
জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনুন্নত অঞ্চল এবং গ্রাম উন্নয়নের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আন্দামান এবং নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে পার্লামেণ্টে বহু প্রশ্ন উঠেছে। একাধিক পার্লামেণ্টারী টিম এই দ্বীপ ভ্রমণ করে গেছেন। এই দ্বীপের সাধারণ উন্নতির সম্ভাবনা, বিশেষ করে পুনর্বাসনের আরও সুযোগ করে দেওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে আমি নিজেই চলে এসেছি। এ যাবৎ পুনর্বাসনের কাজ কি ভাবে হয়েছে তাও আমার দেখার উদ্দেশ্য।
এই দ্বীপের উন্নতির সম্ভাবনাপূর্ণ সমস্ত দিক সাবধানে খতিয়ে দেখতে হবে। মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে উন্নতির এই সমস্ত দিক ঃ মাছধরা, মাছের ব্যবসা, পর্যটন, সুপরিকল্পিত ভাবে বন তৈরি, স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্পকেন্দ্র গঠন, মেনল্যাণ্ড, থেকে কিছু মৎস্যজীবী এনে বসান।
মন্ত্রী মহাশয় তাঁর ইংরেজী নোটে বলেছিলেন—ইনডাকসান অফ ফিশারমেন। ব্যাস্ শুরু হয়ে গেল মহা বাকবিতণ্ডা। এতক্ষণে প্রেস কনফারেনস বেশ জমে উঠল। সাংবাদিকরা হই হই করে উঠলেন—বাইরে থেকে মৎস্যজীবী আনার কী প্রয়োজন। এখানেই তো মাছ মারার একাধিক বিশেষজ্ঞ, হাতে নাতে মাছ ধরার শ সাতেক মানুষ রয়েছেন। মাছ ধরাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে এঁরাই তো সবচেয়ে বড় সম্পদ। বরং দুটো নতুন ট্রলার চিৎপাত হয়ে কেন পড়ে আছে সেইটা একবার খোঁজ নিন। খুব তক্কাতক্কি হল। ফয়সালা কি হল বোঝা গেল না। কাঁচের ঘর। বাইরে সমুদ্র

তখন নিজের খেয়ালে পড়ন্ত বেলায় রঙ পাল্টাতে শুরু করেছে। মনে হল স্কুলের শেষ পিরিয়াডে হেডমাস্টার মশাইয়ের ক্লাসে আটকা পড়ে গেছি। কখন যে ঘণ্টা বাজবে। আর কখন যে দৌড়ে চলে যাব সমুদ্রের ধারে।

রিপোর্টের পরবর্তী অংশ তখন গড়গড়িয়ে চলেছে—দ্বীপে দ্বীপে যোগাযোগ ব্যবস্থা বড়ই দুর্বল! জলযানের নিয়মিত চলাচল অপ্রতুল। লিট্‌ল আন্দামান এবং নীল দ্বীপের অধিবাসীরা আমার কাছে অভিযোগ করেছেন, সময়ে স্টিমার না পাবার ফলে তাঁদের কষ্টের কৃষি উৎপাদন পোর্টব্লেয়ার বাজারে পাঠাতে পারেন না। দরিদ্র চাষীরা দিনের পর দিন এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। উৎপাদন সত্ত্বেও পোর্টব্লেয়ারের মানুষ প্রতিদিনের পণ্যসামগ্রী পাচ্ছেন না! স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আমার অনুরোধ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করুন।

বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি প্রয়োজন। যাত্রী পাওয়া গেলে মাদ্রাজ থেকে পোর্টব্লেয়ারে বিমান চলাচল শুরু করা যায়। দ্বীপ থেকে দ্বীপে বিমান চলাচল সম্ভব কিনা দেখতে হবে। আমি রাজধানীতে ফিরে গিয়েই বিমান চলাচল মন্ত্রী, শ্রীকৌশিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব!

বিশেষ ভাবে উপজাতি এলাকা আমি পর্যটন করেছি। ওঙ্গিজ আর নিকোবারিজদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। জারোয়া এবং সেন্টিনেলিজদের সঙ্গে মেলামেশা করা এখনও সম্ভব নয়। সরকার এই সব উপজাতীয় মানুষদের নিজস্ব স্বচ্ছন্দ জীবনে জোর করে অনুপ্রবেশ পছন্দ করেন না। তবে কিছু কিছু সরকারী সাহায্য এরা নিতে শুরু করেছে। একজন ওঙ্গি মহিলার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুব আনন্দ পেয়েছি এই কারণে যে মহিলা এই প্রথম আমাদের ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি মা হয়েছেন।

আমার মনে হয় এই দ্বীপে বাইরের আর কোনো মানুষকে পুনর্বাসনের সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হবে না। জমি গতানুগতিক চাষ ছাড়াও মশলা ফল এবং অন্যান্য বাগিচা তৈরির সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

আজ পর্যন্ত ট্যুরিস্‌ম সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তেমন কিছু ভাবা হয়নি। সভ্যতার পাগলা ঘোড়া এই দ্বীপপুঞ্জের অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশকে তেমন ভাবে তছনছ করতে পারেনি। সেই কারণে বিদেশী পর্যটকদের এখানে ছুটি কাটাতে খুবই ভাল লাগবে, তবে প্রয়োজন হবে মৌল কিছু ব্যবস্থা গড়ে তোলার। এই ব্যাপারে আমি ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে অবশ্যই কথা বলব।

মাছ এখানকার এক বড় সম্পদ। সম্প্রতি একটি ফিসারিজ ডেভালাপমেণ্ট

করপোরেশান গঠিত হয়েছে জেনে আমি আশান্বিত। এতদিনে মনে হয় এই বিশাল মৎস্য সম্পদকে হয়ত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। আমি জেনেছি দুটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র শিল্প সেই সঙ্গে অরণ্য-নির্ভর শিল্পের ওপরেও যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে। মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও এই দ্বীপপুঞ্জ আর একটি ক্ষুদ্র ভারত। সব ভাষাভাষী, সর্বধর্মের মানুষ পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রেখে এখানে বসবাস করছেন। আমার জীবনের এ এক স্মরণীয় ভ্রমণ পর্ব।

মন্ত্রী মহাশয় বড় সাদাসিধে মানুষ। সারা মুখে এই দ্বীপ তার প্রাকৃতিক বিস্ময়ের ছাপ ফেলেছে। চুপ করে বসে আছেন, পরিপাটি হয়ে। মহিলা সাংবাদিকরা স্ত্রী-শিক্ষা, মহিলামণ্ডল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নানা প্রশ্ন শুরু করলেন! জবাব দিলেন স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। জনৈক স্থানীয় সাংবাদিক ফুরসত পেলেই স্থানীয় দুর্নীতির নানা প্রসঙ্গ তুলে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন হাতে ধরা কফির কাপ ঠকঠক করে কেঁপে কেঁপে অর্ধেক ডিশেই পড়ে যাচ্ছিল। বুঝলুম, কফি আর উত্তেজনা একই সঙ্গে চলতে পারে না। প্রশাসন আর দুর্নীতি একই মুদ্রার এ-পিঠ ও-পিঠ। এ নিয়ে কেউ অত হই চই করে না। পকেটে একটা ট্র্যাঙ্কুইলাইজার থাকলে কাপে ফেলে দিতুম। প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরে গেল। এমার্জেনসির সময় এখানকার সরকার একটা রিপোর্ট বের করেছিলেন যার পাতায় পাতায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর প্রশস্তি। সেদিনের তাঁরা আর আজকের তেনারা একই মানুষ। প্রশ্ন উঠল, কোনো অদলবদলের প্রয়োজন আছে কিনা। বিব্রত করার মতই বিষয়। মন্ত্রীর মুখে সামান্য একটু স্মিত হাসি।

আবার প্রশ্ন—মদের চোলাই কারবার আর এখনকার প্রধানমন্ত্রীর মদ্য-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি। উত্তেজিত সাংবাদিককে কোনও রকমে ঠাণ্ডা করে কফিটা প্রায় শেষ করিয়ে এনেছিলুম, আবার লাফিয়ে উঠলেন—ড্রাই ডক! ইজ ইট পসিবল মাই লর্ড। এ হল জলবন্দর! মিঠে ঝাঁঝালো পানির স্রোত বয়ে চলেছে। বড় বড় জাহাজ হেলে দুলে ভাসছে। সেণ্ড সাম ডকটরস। জাহাজের খোল থেকে মাঝে মাঝে জমা-জল বের করে ড্রাই করে দিতে হবে! প্লিজ ডু দিস ফেভার অ্যাণ্ড নট দ্যাট ফেভার।

প্রশ্নটা অন্যভাবে চাপা পড়ে গেল, বাঙালী উপনিবেশিতরা দিন দিন এত হতাশ, মনমরা হয়ে পড়ছে কেন! কেন নীল দ্বীপের কয়েক শ পরিবার আজও ভূমিহীন, ভাগ্যের ভেলায় ভাসমান। জমি যখন পড়েই আছে কেন তাদের বিলি করা হচ্ছে না।

সব প্রশ্নেরই এক জবাব—নোট করা হল, দেখা হবে, বিবেচনা করা হবে।
এবার প্রশ্ন—আন্দামানে যাঁরা এমনি বেড়াতে কি কাজকম্মে আসেন তাঁরা থাকবেন কোথায়? ট্যুরিস্টলজে বেসরকারী কেউ উঠলে তাঁদের বেডিং-স্যুটকেস বাইরে রেখে আসতে পারলেই ভাল হয়। সরকারী কেউ এলেই বেসরকারী রাহিকে দূর করে দেওয়া হয়। অবশ্য 'ট্যুরিস্ট প্যামফ্লেটে' থাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে—থাকার কোনও অসুবিধে নেই। এই এই জায়গায় থাকতে পারেন :
ট্যুরিস্ট হোম, হ্যাড্ডো, পোর্টব্লেয়ার, ট্যুরিস্ট হোম, করবিনসকোভ পোর্টব্লেয়ার, সার্কিট হাউস, হ্যাড্ডো, পোর্টব্লেয়ার, গভর্নমেণ্ট গেস্ট হাউস, হ্যাড্ডো, বিভিন্ন দ্বীপে বন বিভাগের রেস্ট হাউস। ভাড়া একজনের জন্যে দৈনিক ১০ থেকে ১৫ টাকা। দুজনের জন্যে দৈনিক ২০ থেকে ২৫ টাকা। খাবার খরচ মাথাপিছু দৈনিক ২৫ টাকা। রিজার্ভেসনের জন্যে ভারপ্রাপ্ত—একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, নর্থ ডিভিশান, আন্দামান-নিকোবার পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট পোর্টব্লেয়ার। ধর্মশালা আছে—গান্ধী ধর্মশালা, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড পোর্টব্লেয়ার।
হট্টগোল যখন বেশ চরমে উঠেছে, সকলেই যখন সমস্বরে চিৎকার করছেন, তখন মন্ত্রী হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। যেতে হবে অন্য জায়গায়, মিটিং আছে। আমরা তখন আমাদের এই ভ্রমণ-সংক্রান্ত সুবিধে অসুবিধের কথা কিছু বলে নিলুম। আমাদের সঙ্গে কমনীয় কোনো মানুষকে প্রদর্শক হিসেবে দিন। যিনি ঠিক হিজ মাস্টার্স ভয়েস নন, কিঞ্চিৎ সহজ ও স্বাভাবিক। যাঁর অঙ্গ থেকে মাঝে মধ্যে সরকারী চাকরির আঁচলটা একটু খসেটসে পড়বে। সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর আসে! মন্ত্রী ডেভালাপমেণ্ট কমিশানারকে ডেকে প্রয়োজনীয় অদলবদলের নির্দেশ দিলেন। গিভ দেম এ হিউম্যান বিইয়িং অ্যাজ এ গাইড। মন্ত্রী তাঁর সভাসদদের নিয়ে চলে গেলেন।
আমরা বেরিয়ে পড়লুম ঘণ্টাখানেকের ইচ্ছা ভ্রমণে। বাজারে পানের দোকান পর্যন্ত একসঙ্গে, তারপরই এক একজনের এক একরকম বায়না। আমি বেরিয়ে পড়লুম প্যাডকের ছড়ির খোঁজে। দেখি না একলা একলা একটু ঘুরে সরকারী হাত ছেড়ে কিঞ্চিৎ সাবালক হয়ে। বেশ ভালভাবে যদি হারিয়ে যেতে পারি মন্দ কী! সময়ে ট্যুরিস্ট লজে ফিরতে পারব না। জাহাজ ছেড়ে যাবে রাত দশটা নাগাদ। ধরতে পারব না। এই তো হবে! কত কয়েদীই তো সেলুলার জেল ছেড়ে এইভাবে পালাতে গিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে এখনও ঘুরছে। ঘুরছে ভূত হয়ে। এমনও তো হতে পারে, ১৯২৪ কিংবা ১৯২৫ সালে যে পালিয়েছিল তার বয়স এখন ৭৩ কি ৭৪ বছর। জঙ্গলের এমন একটা গভীরে ঢুকে বসে আছে যেখানে আজ পর্যন্ত কেউ পৌঁছোতে পারেনি।

যেখান থেকে কেউ বেরিয়েও আসতে পারেনি। এত বড় বড় পাকা পাকা গোঁফ দাড়ি, বল্কল পরিহিত কোনো মানুষ, পৃথিবীর পকেটে হারিয়ে বসে আছে। ভাষা ভুলে গেছে, আচার আচরণ ভুলে গেছে। জানে না কত বড় একটা বিশ্বযুদ্ধ সেদিন হয়ে গেছে, জানে না অ্যাটম বোমার কথা, স্বাধীন ভারতের কথা, কংগ্রেসের কথা, ভাঙ্গাভাঙ্গির কথা, দলাদলির কথা, চাঁদে যাবার কথা। সময়ের স্থির জলাশয়ে সে ডুবে আছে। কোথায় যে কি থাকে, কে থাকে কত কি যে হতে পারে, ঘটতে পারে কেউ বলতে পারে না। আমাদের বহু পরিচিত, বহু ব্যবহৃত, শোবার ঘরের খাটের তলায় কত কি থাকে তাই জানি না আর এই এত বড় বিশাল পৃথিবীর কোথায় কি ঢুকে বসে আছে বুক ঠুকে কেউ বলতে পারে কি!

যেমন এই মুহূর্তে কেউ বলতেই পারছেন না, প্যাডকের ছড়ি কোন্ দোকানে বিক্রি হয়। অথচ প্যাডক এখানকার সবচেয়ে সমাদৃত গাছ। একজনকে জিগ্যেস করতেই ভীষণ রেগে গেলেন—কী প্যাডক প্যাডক করছ। প্যাডকের অপমান! বল, পাডৌক। বেশ তাই বলেই দেখি। স্মার্ট চেহারার বেশ বুদ্ধিমান একজনকে জিগ্যেস করলুম—পাডৌকের ছড়ি কোথায় পেতে পারি! ভদ্রলোক থম্‌কে দাঁড়ালেন—পাডৌক! হোয়াট ইজ দ্যাট। বলুন, পাদোদক।
বাঃ পাদোদক বলব কেন? এটা কি বাংলাদেশ! পাদোদক আমাদের দেশেই পান করা হয়, এখানে গুরুও নেই, চ্যালাও নেই, সেরকম পতিনিষ্ঠ স্ত্রীও নেই যে পাদোদকের কথা বলব! পাডৌক ইজ এ ফেমাস অর নটোরিয়াস ট্রি—পেড় পেড়, জিসকা লকড়ি মে স্টিক বানতা?
ইয়েস, ইয়েস দাট ইজ নট পাডৌক, বাট পাদ্দক। সে পাদ্দক!
বেশ তাই হোক—পাদ্দক। পাদ্দকের ছড়ি কোথায় পাবো?
আই কাণ্ট সে। ভদ্রলোক টরেটক, টরেটক করতে করতে চলে গেলেন।
এবার আমার প্রশ্নের ধরনটা পাল্টে গেল। বলতে পারেন, প্যাডক ওরফে পাডৌক ওরফে পাদ্দোক গাছ কোথায় পাওয়া যায়, বলতে পারেন! ভদ্রলোক নিরীহ বাঙালী। থতমত খেয়ে গেলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, গাছ তো ভাই অনেক আছে, তবে কোন্‌টা কী বলতে পারব না। ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন ফিরে এলেন, আমার আপাদমস্তক ভাল করে দেখলেন, দেখে বললেন, আহা রে এই বয়েসেই মাথাটা গেছে। সবই ভগবানের ইচ্ছে, কার যে কখন কি হয়!
প্রশ্নটা আবার পাল্টাতে হল। বলতে পারেন, এখানে ভাল কোন লাইব্রেরী আছে?

লাইব্রেরী? আজ্ঞে না সাধারণের জন্যে কোনো লাইব্রেরী নেই। ভদ্রলোক দ্রুত মাউণ্টব্যাটেন সিনেমার দিকে চলে গেলেন। বোট্যানির বই দেখে প্যাডক চিনব তারও উপায় নেই।

শেষকালে একটা করাতকল পেয়ে গেলুম। কাঠের পাহাড়। মালিক ফিতে দিয়ে গুঁড়ি মাপছেন। মাপা শেষ হতেই প্রশ্ন করলুম—প্যাডক পাওয়া যায়? ভদ্রলোক খুব চটে গেলেন—ধ্যাত মশাই হিসেবটা গুলিয়ে দিলেন। আবার শুরু হল মাপামাপি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকেই প্রশ্ন করলেন—কত মি মি-তে এক সে মি।

কত মি মি-তে এক সে মি? প্রশ্ন দিয়েই উত্তরটা চাপা দেবার তালে ছিলুম। ভীষণ ভাব হয়ে গেল দুজনে। মিমি সেমি আমাদের দুজনেরই গুলিয়ে যায়, দুজনেরই সমান বুদ্ধি। উত্তরটা না দিতে পারায় আমার সে কী খাতির! গায়ে গতরে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন বসার জন্যে। চা এসে গেল পান এসে গেল।

কত কিউবিক চাই আপনার?

আঙুল বেঁকিয়ে গোলাকার করে বললুম এই রকম মোটা। দু হাত দুদিকে প্রসারিত করে বললুম এতটা লম্বা, একটা কি দুটো টুকরো, ছড়ি তৈরি করব।

ভদ্রলোক পা দিয়ে একটা মোটা গুঁড়িতে লাথি মেরে বললেন, আমার কাছে সব এই মাপ, আপনি বরং ওই মোড়ের মাথায় ড্রিফট উড বলে একটা দোকান আছে, চলে যান প্যাডকের জিনিস পাবেন।

নির্দিষ্ট দোকানটি খুঁজে নিতে অসুবিধে হল না। ছোট্ট দোকান, কিন্তু অসাধারণ সুন্দর! দোকানের মালিক যেন ভাবরাজ্যে বাস করছেন। ড্রিফট উড নাম কেন জানতে ইচ্ছে করল। এই দোকানের সমস্ত শিল্পকর্মের শিল্পী সমুদ্র। বিভিন্ন মাপের কাঠের টুকরো সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে, চলতে চলতে ঢেউয়ের ঘষা খেতে খেতে এক সময় তীরে উঠে পড়ে। তখন তাদের নানা আকৃতি। সেই বিভিন্ন আকৃতির কাঠের টুকরোর সঙ্গে মানুষের কল্পনা আর শিল্পবোধ যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে—নর্তক, নর্তকী, শিকারী, খ্রীষ্ট, মা ও শিশু, সিংওলা হরিণ, ফুলদানি, বংশীবাদক, গালে-হাত-ভাবুক, প্রেমিক প্রেমিকা, পাখি, কাল্পনিক জীবজন্তু।

দামী জিনিস যেমন আছে কম দামের জিনিসও আছে। প্রশ্নটা দামের নয়, প্রশ্নটা আয়তনের, সমস্যা, নিয়ে যাবার। নিয়ে যাবার উপায় থাকলে পুরো দোকানটাই কিনে ফেলা যেত। মনে হচ্ছিল আমি যেন পাঁচশো বছর আগের কোনো চীনে দোকানে হঠাৎ চলে এসেছি। যে সময় চীনে আফিঙের ধোঁয়া উড়ত, টানা রিকশা চলত,

ঠোঁটের দু পাশ দিয়ে ন্যাজ ঝোলা পাখির মত গোঁফ ঝুলে আসত।
দোকানের মালিকের কাছে প্যাডকের ছড়ি নেই, তবে কোকোর ছড়ি আছে। ফালি কাগজের মোড়ক খুলে সুদৃশ্য একটি ছড়ি বের করলেন। হাতলটা হাঁসের মুখের মত। প্যাডকের তৈরি। বাকিটা কোকো। সারা গায়ে দু নম্বর তুলি দিয়ে কে যেন লম্বা লম্বা সরু সরু কালোর রেখা টেনে তারপর টুথব্রাশে রঙ মাখিয়ে আঙুল দিয়ে টেনে ছিটিয়ে দিয়েছে। ছড়িটা ঝকঝক করছে।
কিন্তু আমি এক মুর্খ! কোকো আর কোকোনাট এক করে ফেললুম। ভাবলুম নারকেল গাছের ছড়ি ক'দিন চলবে। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে এই লাগদাই যৌবন একদিন হাতল ছেড়ে মাটিতে নেমে আসবে। দাম মাত্র ১৪ টাকা। অমন একটা ছড়ি না নিয়েই প্যাডকের প্রেমে পড়ে চলে এলুম।
এখন ভাবি কী ভুলই করেছি! ছড়িটা নিয়ে এলে, আর একটু বৃদ্ধ বয়সে ফুরফুরে সাদা চুলে সাদা কল্কা পাঞ্জাবি আর ধাক্কা মারা তাঁতের ধুতি পরে, ছড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে ভোরবেলা হেদোর সামনে রঙবাজ বুড়োর মত পায়চারি করতাম। ভোরের আলো পড়ে কালো বার্নিশ করা জুতো চিড়িক মিড়িক করে উঠত। নিজের বোকামির জন্যে এমন আকর্ষক বুড়ো বয়সটা হাতছাড়া হয়ে গেল।
ট্যুরিস্ট লজে ফিরে এসেই শুনলাম আর সময় নেই। সকলেই তৈরি। চারদিনের সমুদ্র অভিযান। প্রোগ্রাম বলছে—টোয়েন্টি টু হাওয়ার্স, লিভ পোর্টব্লেয়ার বাই এম ভি তারমুগলি ফর ডুগং ক্রীক, ফর হাটবে, ফর কারনিকোবার। শ্রীনামবীয়ার বললেন এবার আপনাদের দলে যাঁদের চেয়েছিলেন তাঁরাই আছেন—অ্যানথ্রপলজিস্ট শ্রী টি এন পণ্ডিত, ভূমি সংরক্ষণ অফিসার শ্রীআবু বকর, আর, আর, দি গ্রেট ভক্তোয়ার সিং।

পোর্টব্লেয়ারের রাত সাড়ে নটা মানে বেশ রাত। মার্কারি ল্যাম্পের আলো প্রবাল দ্বীপে হীরের মত জ্বলছে। নির্জন রাতে নিঃসঙ্গ আলোর মালা যেন বৃন্দাবনের বিরহী রাধিকা। কার জন্যে জেগে আছে সারা রাত। আমরা সব পাজামা-পাঞ্জাবি পরে জাহাজের ডেকে 'হ্যাপি প্রিনসের' মত দাঁড়িয়ে আছি। সশব্দে জাহাজের ইঞ্জিন চলছে। গরম করা হচ্ছে দীর্ঘ উত্তাল ভ্রমণের জন্যে। হুহু করে হাওয়া বইছে। সময় মধ্যরাতের দিকে 'লং মার্চ' করে চলেছে—এখন তো পৃথিবীর শাসক হবে হাওয়া, তারা, উল্কা, সমুদ্রের গর্জন। এখনই তো ঝিনুকের খোলে মুক্তো জমবে, এখনই তো ব্যারাকুডা দাঁত বের করে জলের ওপর ভাসবে, এখনই তো সাদা বড় রাজহাঁস পালকে মুখ গুঁজে জলপিপির স্বপ্ন দেখবে।

শ্রী পণ্ডিত এসে গেলেন। গাঢ় রঙের গেঞ্জি, তলায় জিন, চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা ফ্রেমের চশমা, লেনস দুটো কাঁচের-গেলাসের তলার মত পুরু। চোখ দুটো বাঘের চোখের মত। পাণ্ডিত্যে জ্বলজ্বল করছে। মাথায় একটা সাদা টুপি। আইয়ে সাব, আইয়ে সাব। আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানকে জাহাজের 'পিচে' আমন্ত্রণ জানান হল। জাহাজটা যেন আমাদের পিতার সম্পত্তি।

নোঙর তুললেই হয়; কিন্তু ভক্তোয়ার সিং এখনও এসে পৌঁছোননি। আমরা তীর্থের কাকের মত বন্দরের তৈলাক্ত 'কে'র দিকে তাকিয়ে আছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে দেওয়ালীর রাত। আলোর বৃত্তে ঝাঁক ঝাঁক দেওয়ালী-পোকা উড়লে বেশ হত। ভাবছি, এমন সময় একটা থ্যাবড়া জিপ ফার্স্ট গিয়ারে এগিয়ে এসে থেমে পড়ল। তড়াক করে লাফিয়ে নেমে এলেন এক প্রৌঢ় পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে শোরগোল উঠল, আ গিয়া, আ গিয়া। ভদ্রলোকের বগলে একটা বেড-রোল। পুরো দলটাই জাহাজের ছাদে চলে এসেছে। ভোঁ ভোঁ করে দুবার বাঁশী বাজিয়ে জাহাজ সমুদ্রের অন্ধকারকে জানিয়ে দিল, ব্যস্ত হয়ো না হে সমুদ্র। যাচ্ছি, যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি। পাটাতনে জল-ঝরা নোঙর উঠে এল। একটু একটু করে জেটি থেকে দূরত্ব বাড়ছে। নামবীয়ার ছোটো হয়ে যাচ্ছেন, ছোটো হয়ে যাচ্ছেন চিফ সেক্রেটারি। গাড়িগুলো সব খেলাঘরের গাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হাত নড়ছে, রুমাল উড়ছে। আমি বাঁ-পাশে টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলুম আর একটু হলেই। বকর সাহেব ধরে ফেললেন। বললেন, পা দুটো দুদিকে, সেকালের পাশিং-শো সিগারেটের সাহেবের মত করে রাখুন, এখন থেকে বহুবার এই রকম টাল-বেটাল হবে মাস্টার। উই আর হেডিং টোয়ার্ডস টেন ডিগ্রি চ্যানেল, মোস্ট ড্রেডেড সি-প্যাসেজ, রাফেস্ট, ফ্যাদমলেস সি অফ দি ওয়ার্লড।

অ্যাঁ! বলেন কি মশাই! জলডুবির ভয়ে জীবনে যে কখনও নৌকো করে মজা গঙ্গা পেরোয়নি, তাকে নিয়ে এ মজা কেন! আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকোয় চড়তাম না। এখন তো আর উপায় নেই। ডুবলে ডুববো, ভাসলে ভাসব। মৃত্যু চিন্তাটা সরে গেল। সামনেই একটা বিদঘুটে লম্বা বাড়ি। সারি সারি আলো। বকর সাহেব বললেন—ওই দেখুন সেলুলার জেল। ওই দেখুন করবিনসকোভ, পেছনে ফেলে এসেছেন। উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় গাঁজাখোরের চোখের মত লাল আলো জ্বলছে। ওটা কী! লাল আলোটা বিমান সঙ্কেত। পাহাড়টার মাথায় বোধ হয় জলাধার। লাইট হাউস। আলোর পিচকিরি ছুঁড়ছে আকাশের গায়ে। কী ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ। শীত, গ্রীষ্ম, জল-ঝড়, রাতের পর রাত চমকেই যাচ্ছে! বকর

সাহেব শিখিয়ে দিলেন—এক একটা লাইট হাউস এক একভাবে চমকায়। চমকানোর ধরন দেখে ক্যাপটেন বুঝতে পারেন, এটা পৃথিবীর কোন্ জায়গা!

বরজিন্দর টাল খেতে খেতে এগিয়ে এলেন। মাতোয়ালা সাহেব। পাশিংশো হো যাও ভাই। রেলিং ধরে কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে। ভূতুড়ে রস অ্যাইল্যাণ্ড পেছনে পালাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, এই সময় উদাত্ত হেঁড়ে গলায় আমার একটা গান গাওয়া উচিত—দীপ নিবে গেছে মম।

সর্দারজী অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন—এ কেয়া ভাই!

লাইনটাকে একপাট ঘুরিয়ে এনে বেশ আত্মনির্ভরতার সঙ্গে বললুম—গানা।

—ঠিক হ্যায় ফিন একদফে লাগাও।

ইতিমধ্যে ডাঙ্গা অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারদিকে থই থই তরল অন্ধকার। নাও এবার বোঝো ঠ্যালা! ছোট্ট জাহাজ হই হই করে ম্যালেশিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। কেঁদে ভাসিয়ে দিলেও আর এক বিন্দুও আলো দেখা যাবে না! সামনের সমুদ্র যেন আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ। কি আছে জানি না। শুধু এগিয়ে চলা। দিন হবে, রাত নামবে, আবার দিন হবে। তারপর একদিন হঠাৎ সামনে ছবির মত ফুটে উঠবে স্থলভাগ। মানুষ, বাসস্থান, বাজার, জনপদ, সুখ দুঃখ। আবার হারিয়ে যাবে। সমুদ্রের জন্যে মনটা ভীষণ কেঁদে উঠল। এক একা এই অসীম প্রাণ, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে দিনরাত শুধু ঢেউ ভেঙে চলেছে। কখনো হয়তো মাছের সঙ্গে, ঝিনুকের সঙ্গে অল্প স্বল্প সাংসারিক কথাবার্তা হয়। অদ্ভুত আকৃতির কোরাল আর জল-গাছার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে খোঁজ-খবর নেয়—কী? তোমরা সব ঠিকঠাক আছ তো। আমাদের পূর্বপুরুষদের কত কঙ্কাল, কত হাজার ফুট সমুদ্রের তলায় বালিতে হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে আছে। খুলিতে শিশুমাছের লুকোচুরি খেলার জায়গা। নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে চোখের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে খিলখিল করে হেসে উঠছে। এর একদিন মগজ ছিল, অহঙ্কার ছিল, শয়তানী বুদ্ধি ছিল, আজ সব ধুয়ে পরিষ্কার, আমাদের খেলা করার খুপরি।

নেলসনের মত ঝোড়ো ডেকে, মাস্তুল ধরে, ভয়ে ভয়ে, আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগল না। এত অন্ধকারে, একলা মানুষ বড়ই অসহায়। বকর সাহেবের আর কি! জলের পাশে থেকে থেকে নিজেই একটি জলযান। লটর-পটর করতে করতে ফিরে এলুম খাবার ঘরে। জোর মজলিশ চলেছে। এবার আমাদের

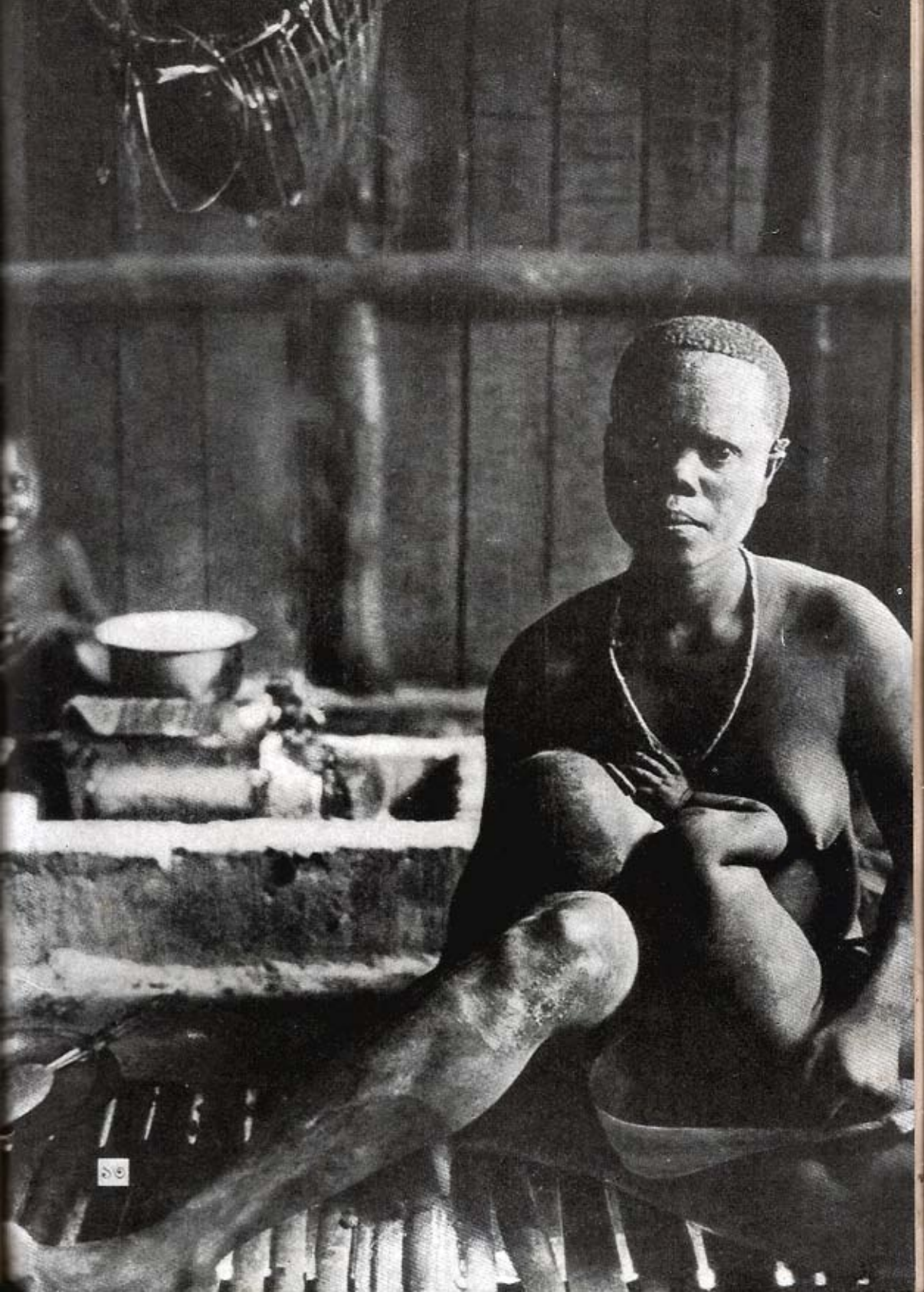

দলে দুজন মহিলা। টেবিলে গোটা কতক জলের বোতল। শ্রী পণ্ডিত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গলায়, অনুত্তেজিত ভঙ্গিতে নানা কথা বলছেন। আদি মানবদের কথা।

ভক্তোয়ার সিং খাবার ঘরের বাইরে রেলিং ঘেরা জায়গায় ক্যাম্পখাট ফেলেছেন। বেড-রোলটা প্রায় বিছিয়ে ফেলেছেন। এইখানে শোবেন না কি! এক হাত দূরে জাহাজের রেলিং। তারপরেই জল। ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরা আর ঠিক সেই সময় জাহাজের টাল খাওয়া, দুটো একসঙ্গে হলেই সিংজী জলে। রেলিঙের ফাঁক, শরীরের 'থিকনেসটা' মনে মনে একবার আন্দাজ করে নিলুম। পেটের দিকটা রেলিঙের ফাঁকে আটকেও যেতে পারে। তবু বিপদের সম্ভাবনার কথাটা জিগ্যেস করেই ফেললুম।

ভক্তোয়ার সিং আমাকে ভাল করে একবার দেখে নিলেন, তারপর হেসে বললেন,

—ইয়েস বাবুজি, এটা তোমার পক্ষে বিপজ্জনক, আমার পক্ষে নয়, কারণ আমার ওজনে ক্যাম্পখাটটা নিচের দিকে ঝোলার মত ঝুলে পড়বে; কিন্তু তোমার মত একটা ওয়েটলেস চ্যাপ, প্রথম রোলিঙেই ওই হোথা ছিটকে পড়বে। এক ঘুম ভাঙার আগেই আর এক ঘুম এসে যাবে, সে ঘুম আর ভাঙবে না। ইন ফ্যাকট, এই জাহাজেই ওই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল।

—বলেন কি?

—ইয়েস, ওই ওপরের ডেকে তোমার মতই একজন ডেকহ্যাণ্ড শুয়েছিল। সকালে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

কথা বলতে বলতে খাটের ওপর থেকে বালিসটা পালাচ্ছিল। সিংজি কান ধরে টেনে নিয়ে এলেন। ইট ওয়াণ্টস টু সুইম।

বকর সাহেবের নিচে কোনো কেবিন জোটেনি। অতিথিরা সব দখল করে নিয়েছেন। তাঁর শোবার ব্যবস্থা হয়েছে দোতলায় ইঞ্জিনিয়ারের ছোট্ট ঘরের ডবল বাঙ্কের যে কোনো একটায়। আমি আর বরজিন্দর সেই আগের কেবিনেই, ওপরের বাঙ্কে আমি নিচে বরজিন্দর। সি সির সুরম্য কেবিন এবার দু মহিলার দখলে।

পুরোনো ঘরে ফিরে এসে মনে হল, অনেকদিন পরে আমার স্ত্রী যেন বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে বসে মৃদু মৃদু হাসছে। শরীরটা যেন আগের চেয়ে ভাল হয়েছে। কি গো কেমন আছ? ভালই আছে। আগের বার ফ্লোরেসেণ্ট বাতিটা জ্বলছিল না, এবার বেশ জ্বলছে! ফটফটে আলো। ডায়েরিটা বের করলুম। ওপরের বাঙ্কে ফেলে, ২৬শে মার্চের পাতায়, দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে টাল খেতে খেতে প্রথমেই লিখলুম—ও মাদার! ইজ ম্যান এ ফ্যাকটার। মানুষ যদি লোপাটই হয়ে যায়, প্রকৃতির কিছু এসে যায়! এ যেন ভাড়াবাড়িতে ভাড়াটের লপচপানি। বাড়িওলা এসে ঘাড় ধরে বের করে দিলেই হয়ে গেল। সারাদিনের কাণ্ডকারখানা নোট করে সব শেষে লিখলুম—রাত দশটা তিরিশ মিনিট। এম ভি তারমুগলি ছেড়েছে। কেবিনে দাঁড়িয়ে লিখছি, এখন প্রায় বারোটা। কাল সকালে ডুগংক্রিক, তারপর হাটবে, সেখান থেকে কার নিকোবার।

সারা রাত ঘুমোয় কার পিতার সাধ্য। শুধু রোলিং নয় সেই সঙ্গে পিচিং। সামনে-পেছনে দুবার থপাং থপাং করে, ডাইনে-বামে পাশ ফেরাফেরি। বাংকে শুয়ে সেই দুলুনির ঠেলা। বাংকের যে দিকটা খোলা সেই দিকে যখন কাত মারছে তখন আপনিই গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে—গেল গেল। মজা মন্দ নয়! মধ্যরাতে মানুষের ধর্ম কি শুয়ে থাকা। সারা রাত কারুর বিছানা যদি প্রতিজ্ঞা করে—ব্যাটাকে আমি তুলে ফেলেই দেবো, সম্ভব কি কারুর পক্ষে শুয়ে থাকা! মনে করি মার কোলে শুয়ে আছি। নাচিয়ে নাচিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়াতে চাইছেন। কিন্তু, মাঝে মাঝে মার একি বজ্জাতি! বাংকের ওপর উঠে বসলুম। সর্বনাশ! বরজিন্দরের কাণ্ড দেখেছো! কখন দুটো পোর্টহোলই খুলে দিয়েছে। আর মাঝে মাঝেই সেখানকার গোলাকার আকাশ কালো অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে বেশ বড় এক ঢোঁক জল ভেতরে চলে আসতে পারে! এ তো বন্ধ করতে হবে তা নাহলে এই শ্রীখোলের পেটে বসেই ভরাডুবি হবে। বাংক থেকে তিনধাপ মই বেয়ে আর নামতে হল না। বাংকটাই আমাকে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে গেল। নিচে নেমে বুঝলুম, সর্দারজীর গভীর ঘুমের রহস্যটা কি! তিনি অনেক আগেই শয্যাচ্যুত। বনিবনা হয়নি। চিৎ হয়ে রবার শিট লাগানো মেঝেতে ঠোঁট ফাঁক করে পড়ে আছেন।

কোনো পরীক্ষা বা ইণ্টারভিউতে কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন—পোর্টহোল কাকে বলে? উত্তরটা তাহলে এই রকম হবে, 'পোর্টহোল' প্রকৃতই 'হোল', নিখুঁত গোল গর্ত, যা খুলতে সময় লাগে এক ঘণ্টা, বন্ধ করতে এক যুগও লাগতে পারে, একদিনও লাগতে পারে এবং দুটো কাজই ভীমভবানীর পক্ষেই করা সম্ভব। সাধারণ মানুষ বন্ধ করতে গেলে একটি ঝাপটা খেয়ে বাংকে চিৎ হয়ে সেই যে পড়বেন, উঠে দাঁড়ানোটা ভাগ্য-নির্ভর! কোনো ক্রমে যদিও বা বন্ধ করেন, পাওনা হবে স্পণ্ডিলাইটিস। বাকি জীবন গলায় কুকুরের বগলস লাগিয়ে ঘাড় সোজা করে কাটাতে হবে। পোর্টহোলের পাল্লার ওজন মণখানেক।

ঘুমচোখে বরজিন্দর নানা কায়দা শুরু করলেন, "হোল" বন্ধের জন্যে। এক ঝটকায় খুলেছিলেন, এখন আর ঘাটে ঘাটে মিলছে না। যতবার চেপে ধরেন, ততবার তেড়ে

আসে। বোঝো ঠেলা। এদিকে হুস হুস করে ঢেউ উঠছে বাইরে। উঁকি মেরে বলে যাচ্ছে—এবারটা দেখে গেলুম, পরের বার আসছি। বেশি গরম তো। বাকি রাতটা ওই গোলগম্বুজ ধরে বসে থাক। পরের ঝাপটায় চেপে ধরে থাকা পোর্টহোলের কাঁচটা যেন দুধে ধুয়ে গেল। কিছুটা জল চুঁইয়ে ভেতরে চলে এল। না, গর্ত বোজাতেই হয়! আর ইয়ারকি চলে না। সর্দারজীকে বললুম, পাল্লাটাকে আগে ঠেলে ওপর দিকে তুলে তারপর লাগান তো। ঠিক তাই, হেরে গেছে। আসলে নিজের ওজনে নিজেই কব্জা ছেড়ে একটু ঝুলে পড়েছে। এইবার বল্টুর প্যাঁচ ঘোরাও বসে বসে।

রাত ভোর হয়ে গেল। বাইরে ভক্তোয়ার সিং স্নানঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গুরু নানকের ভজন গাইছেন। সুর নেই, ভাব আছে। ঠিক পাশের কেবিনে গুরুতর একটা পতনের শব্দ হল। বাংকচ্যুত হলেন জনৈক সাংবাদিক। যদিও শয্যায় নিজেকে ধরে রাখার এই ব্যর্থতা, সংবাদ হয়ে কোনো প্রভাতী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না।

দশ ডিগ্রি চ্যানেলে দাঁড়িয়ে আর একটি শিক্ষা হল। পৃথিবীর কোনও কোনও অঞ্চলে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামানোর চেয়ে শুয়ে দাড়ি কামানোই নিরাপদ। শুয়ে শুয়েই শুকনো গালে নতুন ব্লেড বুলিয়ে দাড়িটা চেঁছে ফেললুম। তবে স্নানের জন্যে দাঁড়াতেই হল। টলেটলে স্নান। টলেটলে চলন। খাবার ঘরে শ্রী পণ্ডিত বললেন—বছর পাঁচেক জাহাজে কাটাবার পর যে কোনো নাবিক যখন রাস্তায় হাঁটেন, তখন টলতে টলতে হাঁটেন। একে বলে সামুদ্রিক চলন!

চার পাশের রেলিং টেলিং যথারীতি জাপটে ধরে, নিজেকে পাশিং-শো করে নিচের ডেকে বেরিয়ে এলুম। এত হাওয়া, মনে হচ্ছে চশমা উড়ে যাবে। কালিদাসের মত বলতে ইচ্ছে করল, যাও হাওয়া, জল-জঞ্জাল বাঁচিয়ে কলকাতায় আমার বাড়িতে যাও, সেখানে ক্লিষ্ট মানুষদের একটু ব্যজন কোরো। প্রভাত যেন চারপাশে প্রভাতের পাখির মতই কিচির মিচির করছে। সমুদ্র যেন নিজেই সমুদ্র স্নান করে উঠল। মইয়ের মত খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ডেকে উঠে গেলুম। সাহস বেড়ে গেছে। কাঁচের ঘরে ক্যাপটেন স্টিয়ারিং ধরে সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করছেন। সমুদ্রে একটা সুবিধে—দুটো কি তিনটে কি অসংখ্য জাহাজ কখনও চলে না। ক্যাপটেন বললেন—মাঝরাতে খুব বড় একটা জাহাজ ক্রশ করে গেছে। পৃথিবীর এ-পিঠ থেকে ও-পিঠে চলেছে। প্যাসেঞ্জার শিপ। বিলিতি বাজনা শুনতে পেলেন?

ক্যাপটেন মুখের দিকে তাকালেন। বুঝলুম খুব বোকার মত প্রশ্ন করেছি। তবে

সমুদ্রের মানুষ কখনও রেগে যান না। হেসে বললেন, সে একবার শুনেছিলুম। যুদ্ধের আগে। বিশাল এক জাহাজ সামনে দিয়ে চলে গেল, কানে এক বাজনার শব্দ? লাকসারী লাইনার। ভেতরে হয়তো ক্যাবারে হচ্ছিল!

ঠিক ছটা কয়েক মিনিটের সময় জাহাজ আমাদের স্থলভাগ দেখাতে পারল। বকর সাহেব বললেন—ডুগং ক্রীক। তীর থেকে মাইলখানেক দূরে জাহাজ নোঙর ফেলল। খাড়ির ভেতর ঢুকতে পারবে না। এইবার চা জলখাবার হবে। এতক্ষণ টলমলে জাহাজে কিছুই করা যাচ্ছিল না। ভক্তোয়ার সিং বললেন—গেট রেডি। চা-র পরেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

ডুগং! নামটা বেশ। ডুগং মানে কি! তীরের দিকে মনে হল, সমুদ্রের ধারেই একটা সাইনবোর্ড পোঁতা রয়েছে। কী লেখা আছে—কে জানে! ভক্তোয়ার সিং জাহাজের গুপ্ত জায়গা থেকে নানা রকম জিনিস বের করতে লাগলেন— বড় বড় বিসকুটের টিন, ফল, জামা কাপড়। কী হবে এত সব জিনিস। আমাদের ব্রেকফাস্ট! না আমাদের ব্রেকফাস্ট তেমন আহামরি কিছু নয়। রুটি, মাখন, জেলী, ছোলাসেদ্ধ, চা। কেন জানি না, আদর ক্রমশ কমে আসছে। কমবে না! অত ঝগড়াঝাটি করলে ভুগতেই হবে।

জাহাজের সিঁড়িটা আগের বার দুটো তারের দড়ি দিয়ে বেশ টান টান করা ছিল। এবার জলের দিকের দড়িটা নেই। একে উত্তাল সমুদ্র, তায় ধরে নামার একদিকের অবলম্বনটা নেই। জাহাজের বোটটাও তেমনি স্নান করার সময় বাচ্চা ছেলেরা যেভাবে তিড়িং বিড়িং করে লাফায় সেইভাবে লাফাচ্ছে। ভয় করলে চলবে না। লড়ে যেতে হবে। লজ্জা করলে চলবে না, আত্মসমর্পণ করতে হবে। ভক্তোয়ার সিং-এর হাতে নিজের ক্ষুদ্র দেহযন্ত্রটি সঁপে দিলুম। রাখতে হয় রাখুন ফেলতে হয় ফেলুন। সিংসায়েবের একটা পা লগবগে সিঁড়িতে, আর একটা পা বোটে। আমাদের সাহসের প্রতিমূর্তি!

এই সেই ভক্তোয়ার সিং। ৬২ বছরের যুবক-বৃদ্ধ! সামান্য ফুট কনস্টেবল থেকে যিনি সততা আর কঠোর শ্রমের মই বেয়ে ডেপুটি সুপারিনটেনডেনট অফ পুলিস হয়েছিলেন। কোনো কলেজি-শিক্ষার গর্ব ছিল না। ছিল কর্তব্যবোধ, ছিল মানিয়ে চলার ক্ষমতা, ছিল অদ্ভুত সাহস, আর এক ধরনের আধ্যাত্মিক ভালবাসা। অপরাধীকে বাগে আনার জন্যে কখনো কিল, চড়, লাথির প্রয়োগ করতে হয়নি। তাঁর সৌম্য ব্যক্তিত্বের চাপের কাছে সকলকেই নতিস্বীকার করতে হত। জাপানী অধিকারের সময় তিনি পালান নি। ভাগ্যকে মেনে নিয়ে দ্বীপেই ছিলেন! নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু ভয়

পাননি। হেরে যাননি। '৬৫ সালে একবার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার পেয়েছেন '৭৫ সালে। '৭৩ সালে অবসর নেবার পরই ভক্তোয়ার সিংকে 'বুশ পুলিস ফোর্সের' কম্যাণ্ডিং অফিসার করা হয়। সেই সময় তিনি প্রথম মধ্য আন্দামানের পশ্চিমতীরে চোটালিংবঙে জারোয়াদের সঙ্গে যোগাযোগে সফল হন। তারপর থেকেই মাঝে মাঝে জারোয়াদের এলাকায় নানা রকম উপহার নিয়ে যেতেন। জারোয়ারা ঘিরে ধরত, বুকে উঠে দাড়ির মাপ নিত, চুলের বেণী খুলে খেলা করত, কাঁধে কাঁধ রেখে হাতে হাত জড়িয়ে ধেই ধেই করে নাচত। ভক্তোয়ারের মধ্যে একটা প্রেম আছে, যে প্রেমের কাছে অকৃত্রিম প্রস্তর যুগের সভ্যতা-বিদ্বেষী জারোয়ারাও আত্মসমর্পণ করেছিল। '৭৬ সালের মার্চ মাসে বুশ-পুলিস থেকে অবসর নিয়ে, বর্তমানে 'আন্দামান আদিম জন জাতি সেবক সমিতি'র একজিকিউটিভ সেক্রেটারি। ধার্মিক, কর্মযোগী। যা দিয়েছেন তাই ফিরে পেয়েছেন—সুস্থ, সবল স্বাস্থ্য, সুখের সংসার, স্ত্রী পুত্র কন্যা যশ খ্যাতি। আন্দামানের প্রথম সারির চরিত্র ভক্তোয়ার সিং।

সিঁড়িতে একসঙ্গে তিন-চার জন নামার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ভক্তোয়ার সিং কম্যাণ্ডিং অফিসারের মতই নির্দেশ দিলেন—ওয়ান বাই ওয়ান। শ্রীমতী ছায়া শাড়িটাড়ি পরেই বেশ টুকটুক করে নেমে গেলেন। আমার সাহস সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল। লগবগ করতে করতে সকলেই বোটজাত হলুম। সমুদ্র ভীষণ রেগে আছে। বাঁদিকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে খাঁড়ি তৈরি করেছে—ডুগং ক্রীক। ডুগং এক ধরনের সামুদ্রিক জীব। মুখটা ঠোঁট ওল্টানো শূকরের মত। কোনো কোনো প্রাণিতত্ত্ববিদ একে ওয়ালরাসের শ্রেণীতে ফেলেছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত একে তিমির জাতিতে ঢুকিয়েছেন। ফরাসী প্রাণীতাত্ত্বিকরা ফেলেছেন হাতির শ্রেণীতে। ডুগং হল সামুদ্রিক চারণ ক্ষেত্রের গরু।

বোট থেকে তীরে নামাটা অনেকটা নিজেকে ধোপার বস্তার কায়দায় ছুঁড়ে দেওয়ার মত হল। যস্মিন দেশে যদাচার। দূর থেকে দেখা সেই সাইনবোর্ডটার তলায় চলে এসেছি। সেটলমেন্টের একটা ম্যাপ লাগানো রয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন প্রবীণ মানুষ—'আন্দামান আদিম জনজাতি সেবক সমিতি'র ডক্টর গোপালচন্দ্র সিং। আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আর একটা ছোট জাহাজ এসে খাঁড়ির মধ্যে ঢুকল। আমাদের দলটা আর একটু ভারি হল। তহসিলদার বিপুলবাবু এলেন। পরিচয় হল তরুণ ডাক্তার, এম সন্তোষকুমারের সঙ্গে। সস্ত্রীক কেরালা থেকে এই দ্বীপে এসেছেন ডাক্তারি করতে। মুখে এত হাসি, একি সমুদ্রের দান! এই স্বেচ্ছা-

নির্বাসন, এ কি শুধুই জীবিকার খাতিরে! এই সব মানুষকে যতই দেখছি, নিজেকে ততই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর মনে হচ্ছে!

ডানদিকে টিনের তৈরি বিশাল 'গোডাউন'। তার পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি আফ্রিকার দিকে। এটা আফ্রিকা না হয়ে যায় না। এখানে স্বপ্ন আর কল্পনা বাস্তব হয়ে আছে। বিশাল বিশাল বাদাম, প্যাডক, মার্বল গাছকে সাক্ষী রেখে, প্রহরী রেখে, সামান্য একটু অঞ্চল প্রকৃতির হাত থেকে চেয়ে নিয়ে, ওঙ্গিজদের জন্যে নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে তিন চার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, স্কুল। চারদিকে বড় বড় গাছের গুঁড়ি, ডালপালা। চারদিকে ধোঁয়া ধোঁয়া অদ্ভুত বিজাতীয় সকাল। ভ্যাপসা উদগ্র গরম। মাঝে মাঝে উলঙ্গ ওঙ্গিজদের তীক্ষ্ণ চিৎকার—চিরা, চিরো। ইঙ্কে নে নে। এই ওঙ্গিজরাও একসময় ভয়ঙ্কর হিংস্র ছিল। ১৮৭৩ সালে আন্দামানের তৎকালীন সুপারিনটেনডেণ্ট, মেজর জেনারেল ডি এম স্টুয়ার্ট তাঁর দলবল নিয়ে বন্ধুত্ব করতে এসে প্রাণ হারাতে হারাতে নিজে বেঁচে গেলেও তাঁর দলের একজন প্রাণ হারিয়েছিলেন। প্রথম যেদিন এদের অঞ্চলে সাহস করে ঢোকা গেল, চারদিকে ছড়িয়েছিল জাহাজডুবির বার্মিজ নাবিকদের মৃতদেহ, কঙ্কাল। সেটলমেণ্টে ঢুকেই মনে হচ্ছিল—এ যেন "ভুডু" দ্বীপ। কয়েকটি মাত্র সভ্য মানুষ, বাকি সকলে মাটি মাখা, উলঙ্গ, হোঁতকা হোঁতকা স্ত্রী-পুরুষ। এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে আমরা যেন কেউ নই। একটা দারুণ উপেক্ষার ভাব, তাচ্ছিল্যের ভাব। মুখচোখের দৃষ্টি ধারালো, সন্দেহজনক। একতলা উঁচু মাচার ওপর, নতুন কাঠ আর টিন দিয়ে গোল গোল বাড়ি আর বারান্দা তৈরি হয়েছে, এদেরই পুরোনো আবাসের 'স্পেসিফিকেসান' অনুসারে। এক একটা বাড়ি তৈরিতে খরচ হয়েছে ১৮ হাজার টাকা। মজবুত সিঁড়ি, ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। মজবুত কাঠের পাটাতন। বড় একটি শোবার ঘর। শোবার ঘরে উঁচু মঞ্চের ওপর মশারি ফেলা বিছানা। এরা যেখানে শোয় সেখানেই রাঁধতে ভালবাসে। কোনোদিন এই গরমে একটা অগ্নিকাণ্ড না হয়ে যায়। ঘরের সামনেই চারদিক খোলা প্রশস্ত বারান্দা। সবচেয়ে বড় কৌতুক—এই নতুন নতুন বাড়ি এদের পছন্দ নয়। নতুন বাড়ির পাশে পাশে এরা একটি করে নিজেদের মত ঝুপড়ি তৈরি করে নিয়েছে। আগুন জ্বালার জন্যে আধুনিক দেশলাই বা লাইটার এদের অপছন্দ। তাই নিজেদের রাবণের চিতা জ্বালাই আছে। শুকনো কাঠের গুঁড়িতে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। মাঝে মাঝে পালা করে এসে ফুঁ দিয়ে উসকে দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের লোকগণনা বলছে—মাত্র ১১২ জন ওঙ্গিজ স্ত্রী-পুরুষ এই জাতির অবশিষ্ট প্রতিনিধি। ১৯৩১ সালে সংখ্যা

ছিল ২৫০। দ্রুত এদের সংখ্যা কমে আসছে। এদের মারছে সিফিলিসে নয়। এরা মরছে ম্যালেরিয়ায়, পেটের অসুখে, বুকের রোগে। যদিও প্রোটিন ছাড়া কিছুই খায় না তবুও ক্ষয়রোগ ছড়াচ্ছে। নারীরা অজ্ঞাত কারণে বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।

বিপুলবাবুর সঙ্গে বেশ মনের মিল হয়ে গেল। এঁর পূর্বপুরুষ দীর্ঘকাল আন্দামানে বসবাস করছেন। বিপুলবাবু শৈশব থেকে এই দ্বীপ দেখছেন। এখন তহসীলদার। তহসীলদারের কাজটা কী। সব জমিই তো সরকারের! মনে হয় খাজনা আদায় করেন। কিন্তু কার কাছে। ওঙ্গিজরা নিশ্চয়ই খাজনা দেয় না; এরা টাকার নাম শোনেনি, ব্যবহারও জানে না। সিকি দিলে কপালে টিপ পরে বসে থাকবে। টাকা দিলে খাঁড়ির জলে চাকতির মত ছুঁড়ে দিয়ে শিশুর মত হাসবে।

হাসপাতালের ঘরগুলো তেমন পরিষ্কার নয়। তবে একেবারে টিপটপ, পরিষ্কার ধবধবে সাদা ইউনিফর্ম পরিহিতা কেরালার তরুণী নার্স। কলকাতার হাসপাতালেও এমন সুন্দর, নিখুঁত, নিভাঁজ পোশাক পরিহিতা সিস্টার কদাচিৎ দেখা যায়। এ যেন হাসপাতাল-হাসপাতাল খেলা। রুগীরা উলঙ্গ। মাটি মেখে বেপরোয়া ঘুরছে। মেয়েদের কোমরে ঘুনসির মত ঘাসের থোকা বাঁধা। সেইটুকুই যা লজ্জার অবরোধ। এদিকে আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। আইস ব্যাগ আছে, আইস নেই। ফিডিং কাপ আছে, শুয়ে শুয়ে ফলের রস খাবার লোক নেই। তবু সাহস বলব সেই কেরলী সেবিকার। ষোড়শী। কোন্ সাহসে পড়ে আছেন এই 'নোম্যাডিক আইল্যাণ্ডে'। এঁদের বলা চলে নিবেদিতা।

আর একজন নিবেদিতা—ডক্টর সন্তোষকুমারের স্ত্রী, শ্রীমতী সুধা সন্তোষকুমারী। পৃথিবীতে খুব কম মানুষেরই বরাতে এমন স্ত্রী জোটে! কেরালার মহিলাদের মধ্যে এমনিই একটা বাঙালীসুলভ কমনীয়তা, মাধুর্য আছে, সেইটাই আরো পরিশীলিত ও রুচিসম্পন্ন হয়েছে শিক্ষার গুণে। ভদ্রমহিলা বোটানিস্ট। স্বামীর কাজে সাহায্য করছেন। এই নির্জন জঙ্গলে পড়ে আছেন বলে কোনো দুঃখ নেই। আমার বউ হলে তালাক দিয়ে সরে পড়ত। যেখানে কিচ্ছু নেই, একমাত্র প্রকৃতি আছে, প্রাণী আছে প্রাথমিক পর্যায়ের, আর আছে উচ্ছ্বসিত সমুদ্র, সেখানে একজন তরুণী মহিলা কিভাবে সমস্ত স্বাদ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে পড়ে আছে। অনেক বোটানিস্ট দেখেছি, এমন প্রকৃতিপ্রেমী বোটানিস্ট খুব কম দেখেছি।

চালচলনে পশ্চিমী উগ্রতা নেই। অথচ কেমন একটা জড়তা মুক্ত, ঝকঝকে ব্যক্তিত্ব। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি। হসপিটাল ব্লক পেছনে ফেলে এসেছি। দুদিকে দু সার বাড়ি। মাঝখানে খোলা সবুজ জমি। ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যেই ওঙ্গিজ ভাষা খানিকটা

আয়ত্ত করে ফেলেছেন। আর সবচেয়ে যেটা অদ্ভুত মনে হল—একসময়কার দুর্দান্ত, হিংস্র একটি জাতের মানুষকে কিভাবে আপন করে নিয়েছেন।

চি রো। ভদ্রমহিলা সুরেলা গলায় চিৎকার করে উঠলেন। ডানদিকে একটা বাড়ির সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে এক ওঙ্গিজ মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলো। কোলে একটা নবজাতক। ছেলে কোলে মা গজেন্দ্র গমনে এগিয়ে এল। কোমরের তলায় ঘাসের ঘুনসি দুলছে। সুধা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই কলোনির প্রথম মা। এই প্রথম একজন ওঙ্গি রমণী হাসপাতালে, শিক্ষিত ডাক্তার ও নার্সের তত্ত্বাবধানে মা হলেন গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি। মৃত্যু আর জন্ম, সংখ্যাকে স্থির রেখেছে। একটি শিশু যেমন জন্মেছে, ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ তেমনি মারা গেছে। মার কোলে শিশুটিকে অবাক চোখে দেখছিলুম! এই প্রথম, আবিষ্কারই বলা চলে—শিশু ওঙ্গি সভ্য মানুষের শিশুর মতই দেখতে মনে হল। কোনো পার্থক্য নেই। শৈশবে মানুষ একাকার।

চি রো বলে একজন ওঙ্গি পুরুষ চিৎকার করতেই মহিলাটি হেলেদুলে চলে গেল। সুধাকে জিগ্যেস করলুম, চিরা চিরো, এই দুটো শব্দই তখন থেকে শুনছি, মানেটা কী মশাই। ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, চিরা মানে এদিকে এসো। চিরো হল আদেশ—এদিকে এসো। উলঙ্গ মানুষটি তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। সুধা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে সুধার দিকে তাকালুম। কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন—প্রেম। এরা ভীষণ প্রেমিক। কথায় কথায়, সময়ে অসময়ে প্রেম এদের উথলে ওঠে। সুধার চুলে ভারি একটা মিষ্টি গন্ধ! আমার নিজের প্রেমই ভেতরে আঁকুপাঁকু করে উঠছিল। ঈশ্বর বিপদ থেকে বাঁচাও! সুধা বললেন, চলুন ওদের একটা ঘর দেখাই। দুজনে সিঁড়ি ভেঙে নবনির্মিত একটি হৌজখাসের দোতলায় উঠলুম। ঘরের দরজা বন্ধ। সুধা বারকতক ঝাঁকানি মারলেন। কোনো ফল হল না। বারকতক ধাক্কা মারলেন। সমস্ত বাড়িটা ঝরঝর করে কেঁপে উঠল। সব সুদ্ধ ভেঙে পড়বে না তো! ছেড়ে দিন। আসুন তো দুজনে মিলে ঠেলি। সুধা ঘেমে গেছেন।

আওর থোড়া হেঁইও! মারো ঠেলা হেঁইও। ঘাসবিচালি হেঁইও।

যে কাজের যে মন্ত্র। দরজার ওপাশে অজস্র টুকরো টাকরা জিনিস পড়ার শব্দ হল। দরজাটা খুলে গেল। সারা ঘরে নানা জিনিস ছড়িয়ে পড়েছে। কৌটো, পাথরের টুকরো, ঝুড়ি। ঢুকতেই বাঁ পাশে মশারি ফেলা উঁচু বিছানা। মশারির ভেতরে একটা বাটি। কিছু ভুক্তাবশেষ লেগে আছে। একটা হলদে সায়া। একটা শাড়ি লুটোপুটি খাচ্ছে। এরপর ওঙ্গিজদের ঘরের দরজা সম্বন্ধে কিছু লিখতে বললে লিখব—এরা এমনভাবে

দরজা বন্ধ করে যায় যাকে আমরা ব্যারিকেড বলতে পারি। দরজা বন্ধ করার পর নিজেরাই আর খুলতে পারে না। বাইরে রাত কাটায়।

সায়া, ব্লাউজ, শাড়ি সবই এদের দেওয়া হয়েছিল, কখনো ইচ্ছে হলে ক্ষণিকের জন্যে পরে, তা না হলে টান মেরে একপাশে ফেলে রেখে যায়। মশারির ভেতর থেকে বাটিটা বের করে এনে ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞের মত সুধা বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। একটু যেন চিন্তিত। নিজের মনেই বললেন, আবার শুরু করেছে। ওঁর চিন্তা দেখে আমিও যেন চিন্তিত হয়ে পড়লুম।

—কি শুরু করেছে।

—ডায়োস্কোরিয়া খেতে শুরু করেছে!

—কি সর্বনাশ! মনে হল কি বোকা আমি! ডায়োস্কোরিয়া জিনিসটা কি? তাই তো জানি না!

ডায়োস্কোরিয়া এক ধরনের গাছের শিকড়। ৭৫ ধরনের গাছ আছে। শিকড় ফোটালে বা বাটলে স্টার্চের মত এক রকম জিনিস বেরোয়—ওঙ্গিজদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য।

—আহা থাক না। শিশুদের খাদ্যই তো বলবর্ধক শটি ফুড!

—বলবর্ধক নয়, বল ক্ষয়কারী। এই নিয়েই তো আমার রিসার্চ। ডায়োস্কোরিয়া থেকেই হয়তো বন্ধ্যাত্ব আসছে। কিছু পণ্ডিতের অন্তত সেই রকমই ধারণা।

—বলেন কি! তাহলে ওই শিকড় অবিলম্বে শহরে কিছু পাঠান। ফ্যামিলি প্ল্যানিংটা এবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক অন্য ভাবে।

এইবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যা এই মহিলার সামনে না ঘটলেই ভাল হত। এই ঘরের মালিকানী হঠাৎ এসে হাজির হল। হলদে সায়া পরে। বেশ দেখাচ্ছে! গুরু নিতম্বে হলুদ সায়া। সরকারের বেশ রুচি আছে। মহিলার কোনও দিকে কোনো দৃকপাত নেই! সড়াক করে সায়াটা খুলে ফেলে এক লাথি মেরে কোণের দিকে ফেলে দিয়ে রানীর মত বেরিয়ে গেল।

সুধা বললেন—এই হল এদের রোগ। জামাকাপড় সহ্য করতে পারে না। এই পরছে এই খুলে ফেলছে। যে কথাটা বলতে পারলুম না, সভ্যতার শ্লেষ্মায় গলা চেপে ধরল—এখানে সকলেই যদি বিবস্ত্র হয়ে থাকতুম তাহলে কেমন হত! ঢোকার মুখের সাইন বোর্ডে লেখা হোক—এইখানে প্যান্ট জামা খুলিয়া অঙ্গে এক টুকরা সুতা না রাখিয়া নিশ্চিন্ত আরামে আদমের উদ্যানে প্রবেশ করুন। এখনও এখানে সেই আপেলটি ফলেনি—যাহা লইয়া শয়তান তাহার শয়তানির খেলা খেলিতে পারে।

গরম ক্রমশই বাড়ছে। ওঙ্গিজরা তবু মাটি মেখে ঘুরছে। আমরা মরছি জামাকাপড় পরে ঘেমে। সুধার ব্লাউজ ঘামে ভিজে গেছে। একটু হাওয়া নেই। সমুদ্রের হাওয়া বড় বড় গাছ ভেদ করে ঢুকতেই পারছে না। স্কুলের হল ঘরে এসে বসেছি। এখানে সবই কাঠের। ছাদটা খালি টিনের। প্রশস্ত ঘর। বেশ বড় একটা স্থায়ী মঞ্চ। ছোটো ছোটো বেন্‌চি, টেবিল। কয়েকটা বড় চেয়ার সামনের সারিতে। এখানে পরিচয় হল আর এক তরুণীর সঙ্গে। ডক্টর গোপাল সিংয়ের মেয়ে। এই স্কুলের শিক্ষিকা। ব্ল্যাক বোর্ডে দেখলুম সংখ্যা শেখাবার চেষ্টা হয়েছিল। টেবিলে এক একজন ছাত্রের জন্যে একসেট করে বই, স্লেট, পেনসিল। শিক্ষার মাধ্যম অবশ্যই হিন্দি। হিন্দি সর্বভারতীয় ভাষা। হিন্দি ছাড়া আগামী ভারতে আর কোন্ ভাষা থাকবে! ডাঃ সিংএর মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হল। মেয়েটি পোশাকে ইওরোপীয়, ব্যবহারে ভারতীয়। বেশ একটু লাজুক। এঁর কাছে কেই বা পড়ে! কিই বা পড়ে! ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধি আর আই কিউ নিয়ে কথা হল। হতে পারে আদিমানব, সভ্যতা থেকে অনেক দূরে, কিন্তু বুদ্ধির মাপে এরা আমাদের চেয়ে কম যায় না। এক একজন প্রকৃতই বুদ্ধিমান। হয়ত কোনো জিনিস ধরতে বা বুঝতে একটু দেরি হয় তবে নিরেট নয়। শ্রীমতী সিং সংখ্যা লিখতে শিখিয়েছেন, অক্ষর পরিচয় শুরু করেছেন।

কোনো কোনো স্লেটে নিজেদের জীবনের ছবি—শিকার, মাছধরা, পশু, মানুষ, আমাদের শিশুদের চেয়েও ভাল এঁকেছে। একটা স্লেটে বেশ বড় বড় গোঁফওলা একজন কাউকে আঁকার চেষ্টা হয়েছে। পড়া-শোনার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। ইচ্ছে হল পড়। না হল যা খুশি কর। কটাই বা শিশু। তবু চেষ্টা করে দেখা। বছর দশেক পরে হঠাৎ যদি বলতে পারে—আরে পটাক দে।

এই ডাক্তার দম্পতি, এঁরা মনে হয় কন্ব মুনির আশ্রমে ছিলেন। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। দুজনে বীণা নিয়ে বসেছেন মঞ্চে। শ্রোতা আমরা, শ্রোতা ওঙ্গিজরা। মহিলারা আসেনি। এসেছে শুধু পুরুষরা। এই ভীষণ অরণ্যে, চারপাশে উত্তাল সমুদ্র, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর গাছের প্রহরা, গাছ কাটার শব্দ, কিছু মানুষের আদিম চিৎকার চিরো, চিরো, তার মাঝে দুই শিল্পীর নিপুণ দ্বৈত বাজনা—শ্রী, মল্লার, দেশ, টোড়ী,

খাম্বাজ একটু দক্ষিণী ঢঙে। প্রকৃত শিল্পী। তা না হলে এই ধরনের শ্রোতাদের সামনে কেউ এত তন্ময় হয়ে বীণার মত দুরূহ একটি বাদ্যযন্ত্র এমন সুন্দর করে বাজাতে পারে না।

বাজনার পর নাচের প্রোগ্রাম। বেন্‌চি সরিয়ে 'ড্যানসিং ফ্লোর' তৈরি হল। এবারের শিল্পী ওঙ্গিজরা। ভক্তোয়ার সিং বললেন—যান আপনারাও ওদের সঙ্গে নাচুন। আমাদের দলে এসব ব্যাপারে অগ্রণী লালাজী। লালাজী এগিয়ে গেলেন, গেলেন বরজিন্দর, গেলেন ডাঃ কুমার। এ নাচ মোটেই সহজ নয়। শরীরে তাকত থাকা চাই। হার্টের টিউনিং-এ কোনো গোলমাল থাকলেও চলবে না। তারপর থাকা চাই ট্রেনিং। কাঁধ ধরাধরি করে লাফিয়ে লাকিয়ে গোল হয়ে ঘোরা। বার কতক হুপ হাপ করে লাফিয়েই আমাদের হয়ে গেল। প্রাণ যায়। আসরে নামলেন ভক্তোয়ার সিং। সেই বিখ্যাত নর্তক যিনি ইতিমধ্যেই জারোয়াদের সঙ্গে ডেথ ড্যানস করে রাষ্ট্রপতির পদক পেয়েছেন। তবে কিনা সব শিল্পীই বয়সের ভারে প্রতিভা হারিয়ে ফেলেন। সিংজী হুপ করে একবার লাফিয়েই বুঝে গেলেন—দিন শেষ। ভুঁড়িটা ধড়াস করে চিবুক পর্যন্ত লাফিয়ে উঠেই শান্ত আর হতে চায় না, থলথল টলমল। ঢেউ দিল, ঢেউ দিল রে।

নাচ শেষ। শুরু হল নোনতা বিস্কুট বিতরণ। ভক্তোয়ারজী দু টিন বিস্কুট এনেছেন। আনারস এনেছেন। আরো সব নানা জিনিস এনেছেন। হাতে হাতে বড় একটা টিন শেষ। আর এক টিন মজুত রইল। তোমরা পরে খাবে। এখন আর খাই খাই কোরো না। তাম্বোলেটা একটু হ্যাংলো হয়েছে ইদানীং।

তাম্বোলে যে সে মানুষ নয়। চিফ কমিশনারের উপদেষ্টা কমিটির একজন সভ্য। পোর্টব্লেয়ারে মিটিং করতে যায় বাঘা বাঘা অফিসারের সঙ্গে। চেঁচামেচি করে। দাবি দাওয়া সম্পর্কে সচেতন। বেশ ডাঁটও আছে। আমার হাত থেকে ফাইবার টিপ কলমটা কেড়ে নিয়ে খসখস করে এক ছত্র কবিতা লিখে ফেলল। কী লিখল সেই জানে। আর জানেন ভাষাবিদ্‌রা।

ডাক্তার সন্তোষকুমার এদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু তথ্য দিলেন। 'এ' ভিটামিনের ঘাটতিতে সকলেই ভুগছে। নিয়মিত ইঞ্জেকসান চলছে। ওয়ার্মসের জন্যে অ্যানিমিয়া। টি বি আছে। চারজনকে পোর্টব্লেয়ারে চিকিৎসার জন্যে পাঠান হয়েছে। এই হাসপাতালে এক্সরে প্ল্যাণ্ট দু-এক মাসের মধ্যেই বসবে। কিছু ভি ডি কেস ছিল। এখন নেই। হাসপাতালে ডাক্তার ছাড়া, একজন স্টাফ নার্স আছেন, ওয়ার্ডবয়, অ্যাটেনড্যাণ্ট, একজন সিনিয়ার মেল নার্স ও হেলপার আছেন। সকলেই

আন্দামান আদিম জনজাতি বিকাশ সমিতির কর্মী। আউটডোরে গড়ে রোজ দশজনের চিকিৎসা হয়। প্রধান রোগ ম্যালেরিয়া, শরীরের ব্যথা, পেটের ব্যথা।
ওঙ্গিজদের মধ্যে পুরুষ আর মহিলার সংখ্যা প্রায় সমান সমান—৩৮ জন পুরুষ, ৩৬ জন মহিলা। মহিলা নিয়ে কাজিয়া তাজিয়ার সম্ভাবনা নেই। রাজা হল ওই তাম্বোলে, রাজা তাম্বোলে। দ্বিতীয় রাজা, দু নম্বর রাজা নাবি কুট্টি! তাম্বোলে বেশ পয়সা চিনেছে। পয়সার ব্যবহার জানে। শিখে গেছে, ফেল কড়ি মাখো তেল।

যে পথে এসেছিলুম সেই পথেই ফিরে চলেছি। বিপুলবাবু সুন্দর একটা গাছের ডাল উপহার দিলেন। বকর সাহেব বললেন, প্যাডক প্যাডক করে মাথা খারাপ করে দিয়েছিলেন, ওই নিন প্যাডক। কলকাতায় গিয়ে একটা হাতল লাগিয়ে পালিশ করিয়ে নেবেন। সুধা বললেন, সাবধান! ওই কাঠের টুকরো একটু ভিজে গেলেই অ্যায়সা রঙ ছাড়তে আরম্ভ করবে, জামাকাপড় সব লাল হয়ে, লালবাবাজী হয়ে যাবেন। তবু তো তোমায় ছাড়ব না। তুমি যে আমার সেই প্যাডক!
ডক্টর গোপাল সিংয়ের বাড়িতে এসে হাজির হলুম। সমুদ্রের তীরে। আয়তনে ফলাও। চৌকো বসার ঘর, একদিকে প্যানট্রি, অন্যদিকে শোবার ঘর। সংসারে বোধ হয় দুটি প্রাণী—পিতা আর কন্যা। এইবার হবে চা-পর্ব। বিপুলবাবু এইখানে এক তাড়া নোট পেলেন। গুনে গুনে পকেটে পুরলেন। এটা কিসের পাওনা মশাই। হাসলেন। মুখ খুললেন না। ট্রেড সিক্রেট ফাঁস হল না। বেশী কৌতূহল ঠিক নয়। এখানকার জঙ্গলে দামী দামী কাঠের ছড়াছড়ি। বাদাম, আটশো থেকে হাজার টাকা কিউবিক মিটার। প্যাডক, মার্বেল দু হাজার টাকা কিউবিক মিটার। সেইসব জঙ্গল কি ইজারা দেওয়া হয়েছে! প্যারিশিয়া গাছের সঙ্গে দেশলাইয়ের সম্পর্ক। পোর্টব্লেয়ারে উইমকোর বড় কারখানা। সেই প্যারিশিয়া জঙ্গলের ইজারার টাকা নাকি!
সকলেই প্রাণ ভরে জল খাচ্ছেন। জল সম্পর্কে আমার আতঙ্কটা প্রকাশ করতেই হল। ডক্টর সিং বললেন কোনো ভয় নেই। এখানে এত পেটের অসুখ, আমরা জলে ক্লোরিন মেশাতে শুরু করেছি, নির্ভয়ে খান। বকরসাহেবকে অনেকক্ষণ দেখছিলুম না। ঘর্মাক্ত হয়ে এলেন। কোথায় ছিলেন মশাই! রহস্যের হাসি হাসলেন। ব্যাপার কী! পুরো ব্যাপারটাই কি রহস্য উপন্যাস হয়ে গেল নাকি! বকরসাহেব রহস্য উন্মোচন করলেন। গিয়েছিলুম চাল যোগাড় করতে। কোথায়! অরণ্যের উলটপিঠে কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে নাকি! কোনো ঝকঝকে শহর, ধুলো ধোঁয়া মটর?

না, তা নেই। এখানেই আছে ওঙ্গিজ মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ। সেইখান থেকেই সংগৃহীত, দশ পনের কিলো চাল। চাল রহস্যের পেছনে আর এক রহস্য। আগের বারে যিনি আমাদের মধ্য আন্দামান ঘোরাবার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, এবারে তিনি আমাদের দলে নেই ; কিন্তু কথা ছিল পোর্ট থেকে জাহাজ ছাড়ার আগে রসদটা তিনি বোঝাই করে দেবেন। দিয়েছেনও, তবে আমাদের গৌ, গাবৌ, গাব ভেবে চাল যা দিয়েছেন, তা খেতে হলে প্রকৃতই হাম্বা হাম্বা করে ডাকতে হবে। আমাদের বাঁচাতে বকর সাহেবের এই শাস্তি।

সমুদ্রের তীরে এসে চক্ষু স্থির! জোয়ার এসেছে। সাইনবোর্ডের তলা অবধি জলে জলাকার। থই থই। আমার ভেতরের শিশুটা ভীষণ উৎফুল্ল। কী মজা! জল হয়তো আরো উঠবে, আরো উঠবে ওপরে। সাইনবোর্ডের তলা দিয়ে ফুঁসে ফুঁসে চলে আসবে। ফিরে যাবার সময় বালি সরে সরে যাবে, ঝিনুক, প্রবাল, কড়ি ছটফট করতে থাকবে। কী আনন্দ, ছাপা বুশ শার্ট পরা ওঙ্গিজ যুবকটির। মাছ ধরেছে একগাদা। দু হাত মেলে দেখাচ্ছে, খলখল করে হাসছে। তীর মেরে মাছ শিকার দেখা হল না!

ছটফটে বোটটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, ডিগবাজি খেয়ে প্রায় মাছের মতই পাটাতনে গিয়ে পড়লুম। গন্তব্য—ঠিক উল্টোদিকের স্থলভাগ। ৪৫ একর জমিতে ওঙ্গিজদের কৃষিকর্ম শেখানো হচ্ছে। তীরেই একটা পাতা ছাওয়া ঘর, হাওয়ায় কাঁপছে, এগিয়ে আসা সমুদ্রের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে। মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে কেউ যদি এখানে আমাকে অন্তর্জলীর জন্যে ফেলে দিয়ে যেত! চোখে নেমে আসছে মৃত্যুর ঘোর। মাথার কাছে যমরাজের প্রহরীর মত বিশাল বিশাল গাছ। পায়ের দিক থেকে সরীসৃপের মত একটু একটু করে উঠে আসছে মৃত্যু সাগর।

কে কোন্ দিকে গেছে জানি না, সুধা আমার সঙ্গী। বেলাভূমির অবস্থা কাপড়ের সরু পাড়ের মত। সমুদ্র ভরাট হয়ে উঠছে, পূর্ণতা আসছে। কোনরকমে জল বাঁচিয়ে, শিকড়ের খোঁচা বাঁচিয়ে সমুদ্রের পাশে পাশে সুধার পেছনে পেছনে হেঁটে চলেছি। মাঝে মাঝে অবাক অবাক জিনিস পড়ে থাকতে দেখছি—অস্থি, চুনের মত সাদা নরকপাল, পশুর ওপরের পাটির দাঁত, লম্বা চুলের গুচ্ছ, রবারের চটি, পলিথিন কারবয়। সত্যিই, আমরা কি মৃত্যুর সীমানা দিয়ে হাঁটছি! ছায়ার খুব আনন্দ! দশ-বারো সের ঝিনুক কুড়িয়েছেন, আমার রুমালটা ধার দিতে হল।

২৩০০ নারকেল গাছ লাগান হয়েছে। ৫০০ পেঁপে। ৫০টা কমলালেবু। ৪১০টা

কলাগাছ। ১০টা কাঁঠাল। আখ লেগেছে। আনারস, লবঙ্গ উঠছে। ওঙ্গিজরা চাষ করে কিনা জানি না। কেন করবে? জীবনধারণের সবই তো বিনা পরিশ্রমে আসছে। ওরা তো সুসভ্য, মধ্যবিত্ত বাঙালী নয়, ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে ডিসপেপটিক হয়ে যাবে! কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে চুলোচুলি করবে। যা করার কৃষি বিভাগের কর্মীরাই হয়তো করেছেন!

ভক্তোয়ার সিং এবার প্রায় ধমকেই উঠলেন। আর দেরি করলে সমুদ্রের যা অবস্থা জাহাজে ফেরা যাবে না। তোমরা সমুদ্রকে চেন না, জেণ্টেলমেন। তখন কিন্তু বুঝবে ঠেলা। সুধা তখন কালকের গল্প বললেন: স্বামী স্ত্রী দুজনে সমুদ্রের তীর ধরে ডায়াস্কোরিয়ার খোঁজে বহু দূর চলে গিয়েছিলেন। অনেকটা নেশায় নেশায়। আরও একটু এগিয়ে দেখি, আরও একটু এগিয়ে দেখি। যখন খেয়াল হল ফিরতে হবে, তখন বেলাভূমি মুছে গেছে। জল ক্রমশই বাড়ছে। একদিকে অরণ্য গভীর অন্যদিকে স্ফীত সমুদ্র। পাতাজল, হাঁটুজল, বুকজল। দুজনেই গাছে উঠে বসে রইলেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জল যখন নেমে গেল, তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

ঘাড় মাথা নেড়ে, দাঁতে দাঁত চেপে বলতে ইচ্ছে করে—উঃ কী জীবন!

ভক্তোয়ার সিংএর বকুনি খেয়ে আমরা সকলে লক্ষ্মী ছেলের মত সেই টলটলে বোটে, ঢলঢলে যৌবন নিয়ে, লটপটে প্যাণ্ট জলে ভিজিয়ে, জুতোয় সেরখানেক বালি ঢুকিয়ে আর একটু ওজনদার হয়ে উঠে পড়লুম। আর, কি আশ্চর্য! সুধাও আমাদের সঙ্গে চলেছেন জাহাজে। আমাদের পার্টিতে এখন তিনজন মহিলা। অলোক সমুদ্রের জলে ভেসে আসা একটা ধনুক পেয়েছে।

সমুদ্র আরো ভয়ঙ্কর। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে ভরাডুবি হল বুঝি! মাঝে মাঝে ঢেউ এমন লাফিয়ে উঠছে, জামা, চুল, চশমা সব ভিজে যাচ্ছে। প্রদ্যোতবাবু বিপদে পড়েছেন দুটো দামী ক্যামেরা নিয়ে। নোনা জল ঢুকে গেলেই হয়ে গেল! দোল খেতে খেতে, জল খেতে খেতে, প্রায় মরতে মরতে জাহাজে এসে উঠলুম। সবচেয়ে বড় শাস্তি বোধ হয়, জাহাজে ওঠা, জাহাজ থেকে বোটে নামা, বোট থেকে তীরে নামা, তীর থেকে বোটে ওঠা, বোট থেকে জাহাজে চড়া। বেশি না, মাসখানেক, কাউকে অনবরতই যদি এই রকম করানো হয়, হয় সে খুনী হয়ে উঠবে, না হয় সাধু।

জাহাজে উঠতেই বকর সাহেব বললেন, একদম সময় নেই, পনের মিনিটের মধ্যে খাওয়া সেরে নিন। জাহাজ ছাড়বে। জাহাজ চলতে শুরু করলে, আর খেতে পারবেন না। কোনো রকমে খাওয়া শেষ হল। খাওয়ার তেমন জুত নেই। আর

কত খাওয়াবেন আন্দামান সরকার !

তিন মহিলার মজলিস বসেছে। সেই মজলিসে আমি প্রধান অতিথি। আলোচনার বিষয় দর্শন আর কাব্য। ডাঙ্গায় থাকার সময়েই কিভাবে যেন জন্মান্তরের কথা উঠেছিল। তারই জের চলেছে। আজকালকার মহিলাদের সঙ্গে কঠিন কঠিন বিষয়ের আলোচনা করে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। যেমন ভাল শ্রোতা, তেমনি ভাল বক্তা। তর্কের জালও বেশ ভাল বুনতে পারেন। মনে হয় আর কিছুকাল অপেক্ষা করতে পারলে, খনা, মৈত্রেয়ী, গার্গী এঁরা সব আবার জন্মাবেন। পিঠে বালিশ লাগিয়ে একদিকে ছায়া, আর একদিকে সুধা। তৃতীয় মহিলা অন্য একটি বিছানায় সম্পূর্ণ শুয়ে। মাঝে একটি চেয়ারে আমি।

সুধা যোগে বিশ্বাসী। ধ্যানের কথা হচ্ছে! কিভাবে মনটাকে ভাইটাল থেকে চেতনার স্তরে, কনসাসনেসের স্তরে তোলা যায়। কিভাবে মনটাকে সম্পূর্ণ শূন্য করে ফেলা যায়। বাইরের চেতনা আর ভেতরের সত্তার মাঝখানের পর্দাটা কিভাবে ছিঁড়ে ফেলা যায়।

সুধা আমাদের সঙ্গে হাটবে অবধি যাবেন। হাটবেতে সুধার ভাই একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার। হাটবে ঘণ্টা তিনেকের পথ। সমুদ্র ভীষণ অশান্ত, কিন্তু এই প্রথম সেই মজার মাছ দেখলুম—ফ্লাইং ফিশ। হঠাৎ জল থেকে লাফিয়ে উঠেই একেবারে নিখুঁত একটি পাখির মত, তা প্রায় হাত তিনেক উঁচু দিয়ে উড়তে উড়তে অনেক দূর গিয়ে আবার জলে ঢুকে যাচ্ছে। উত্তর সমুদ্রে ফ্লাইং ফিশ দেখিনি, যত দক্ষিণে এগোচ্ছি সমুদ্র ততই নতুন খেলা দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে দুটো মাছে প্রতিযোগিতা! কে কত দূরে যেতে পারে।

দুপুর তিনটে নাগাদ হাটবের বিশাল জেটিতে জাহাজ লাগল। এখানেও সেই একই সমস্যা। অবতরণের বিপজ্জনক পদ্ধতি। নিচের ডেক থেকে রেলিং টপকে হাত পাঁচেক নিচের একটা শালের বিমে পা রেখে তারপর খোদ জেটিতে উঠতে হবে। দু তিনজন লশকর জাহাজটাকে টেনে ধরে রেখেছেন। রাখলে কি হবে! যেই পা বাড়াতে যাচ্ছি, হেরেরেরে, মাঝের ফাঁকটা বেড়ে যাচ্ছে। একপা ডেকে, একপা শূন্যে। জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা ধরে গেল। এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না, জলে পড়ে, জাহাজ আর জেটির মাঝখানে স্যাণ্ডউইচ হয়ে যাওয়াই ভাল!

এখানে সমুদ্রটাকে মানুষ বেশ কাবু করে ফেলেছে। সাত বছর ধরে চেষ্টা করে পাঁচ কোটি টাকা খরচ করে একটা দুর্ধর্ষ ব্রেকার তৈরি করা হয়েছে। সমুদ্রকে এইভাবে

ভাঙার ফলেই হাটবের জেটিটা দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ ভিড়তে পারছে। তা না হলে ঢেউ চাবকে শেষ করে দিত।

হাটবে একটা বিশাল জায়গা। অর্থনীতির স্বর্ণভূমি। লোকসংখ্যায়, কৃষি উৎপাদনে, ভূমি উর্বরতায়, অরণ্য সম্পদে এই অংশ সমস্ত প্রকার দৃষ্টি ও সুযোগ সুবিধের দাবি জানাতে পারে। ৫ কোটি টাকা খরচ করে এই ব্রেকারের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। তীরভূমি, ব্রেকার, জেটি একটি অসম্পূর্ণ চতুষ্কোণ তৈরি করেছে। সারি সারি গাড়ি ব্রেকারের ওপর দিয়ে একেবারে শেষ বিন্দুতে গিয়ে থামল। বিশাল একটা ক্রেন খোলা সমুদ্রের দিকে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। বলতে চাইছে, তুমিও আছ, আমিও আছি। দেখি ভাঙাচোরার খেলা কেমন জমে!

কোনদিন পয়সা হলে, এই হাটবে, এই ব্রেকারকে লোকেশান করে একটা বিয়োগান্ত ছায়াছবি তুলবো। পান্থপাদপের মত দুদিকে দুসার আলোকস্তম্ভ। মাথার ওপর বড় বড় কাঁচের ডোম পরানো। পৃথিবীর যত পাথর ছিল, সাদা, কালো, যত সিমেণ্ট ছিল, সব এনে ফেলা হয়েছে চপল সমুদ্রকে একটু শান্ত করার জন্যে। দু পাশে সারি সারি সাজানো কিম্ভূত একধরনের চতুষ্পদ বিরাটাকার গোল গোল বস্তু। এর নাম নাকি টেট্রাপড। জলের ধাক্কা সামলাবার জন্যে এই ব্যবস্থা। অজস্র টেট্রাপড নিচে থেকে থাকে থাকে ওপরে উঠে এসে, দুপাশে সঙ্গীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মনে হল—সালভাদর ডালির জগতে বাস করছি। মারাত্মক লোকেশান। কি না করা যায় এখানে? প্রেম, আত্মহত্যা, খুন, সোর্ড ফাইট।

সবুজ অ্যালজী গুঁড়ি গুঁড়ি মিশে আছে জলে। মাছ খেলছে টেট্রাপডের ফাঁকে ফাঁকে। হাওয়া হয়তো উড়িয়ে নিয়ে যাবে। হয়েছে, উড়িয়ে নিয়ে যাবার ঘটনা ঘটেছে। বর্ষা যখন আসে, জল বয়ে যায় ব্রেকারের ওপর দিয়ে। দুঃসাহসী কেউ ওই মরসুমে এই ব্রেকারে দাঁড়ালেই কুঁচো কাগজের মতো উড়ে যাবে। একবার ইচ্ছে হয়েছিল, টেট্রাপডের হাতে পায়ে ভর রেখে, ছাগলের মত, একেবারে জলের কিনারায় নেমে যাই। নেমে যাবার অদ্ভুত একটা আকর্ষণ। শ্রী পণ্ডিত বললেন, নামতে হয়তো পারবেন, তবে শেষ অবতরণ। উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না।

সকলেই জাহাজে ফিরে গেলেন। আমরা কয়েকজন গেলুম ভেতরে, দ্বীপের জঠরে। বিপুলবাবু আছেন। নতুন পরিচয় শ্রীভড়। এখানকার পি ডব্লু ডির কর্মী। তিনি একটা বৃহৎ লরি এনেছেন। ড্রাইভারের পাশে অঢেল জায়গা। আমরা দুজনে পাশাপাশি বসেছি। সতের বছর চাকরি হল। জীবন কী আন্দামানেই কেটে যাবে!

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসন অন্যান্য প্রদেশের সরকারের কাছ থেকে লোক ধার করে আর কাজ চালাবেন না। নিজেরাই সব করবেন। ভড় হলেন ওড়িশা সরকারের কর্মচারী। হয়তো যাবার দিন আসন্ন!

টিম্বারের জন্যেই হাটবের এত খাতির! পোর্ট মেডো, হাটবে, এলফিন্‌স্টোন, মায়াবন্দর, পোর্ট কর্নওয়ালিস, হ্যাভলক—এদের দরজা গলে কাঠ বেরোয়। যাবে মাদ্রাজ, যাবে কলকাতা। মনমরা পিচের রাস্তা ধরে, কখনো সোজা, কখনো ঘোরা পথে, চলেছি তো, চলেইছি। এখানে সাজানোটা একটু উলটে গেছে। সামনে অরণ্য, পশ্চাৎপটে জনপদ। নেতাজীনগর, বিবেকানন্দনগর। মহাপুরুষদের নামে চিহ্নিত বাঙালী অঞ্চল।

গাড়ি থামল পথের ধারে। একটা শ্রীহীন বাড়ি, অর্ধ উলঙ্গ কিছু শ্রীহীন মানুষ। ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে বেশ অবাক হতে হল—ছাদহীন ঘরে, একটি খাট, বিছানা, খাটিয়া। কেউ কোথাও নেই। ঘর আছে, দরজা নেই। একটা শীর্ণ কুকুর রাজার মত এঘর থেকে ওঘরে চলে গেল! ঘরের মালিকদের পেলুম—পেছনের চষা জঙ্গলে। দুটি সবল প্রাণী! হাতে কোদাল। দেখে মনে হয়েছিল দুজন ডন কুইকজোট চাষ করতে নেমেছে। পায়ের কাছে কোদাল রেখে, দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে যেন ভেবে পাচ্ছে না। গায়ে ময়লা গেঞ্জি। খেঁটে ধুতি। বহুদিন যেন স্নান নেই। দূরে দূরে কিছু গাছপালা। প্রথম নমুনাই দুঃখজনক!

—ঘরদোরের এ অবস্থা কেন?

দু ভাই একমুখ হেসে এমনভাবে তাকাল, যেন ছাদহীন ঘরের মত এতবড় তামাসা আর কিছু হয় না।

—চাষবাসের অবস্থা কী?

দুজনেই প্রবল মাথা নাড়ল। যেন কোনো পাপকর্মের স্বীকারোক্তি চেয়েছি।

—চাষবাস হয়! ধান হয়! ফসল হয়! আমার প্রশ্ন।

খুব জোরে জোরে বললুম। জোরে বললে যদি উত্তর পাই! দু ভাই কোদালটার দিকে তাকিয়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নয়, ডাক্তারের জেরার উত্তরে কুলবধূর লজ্জা মেশানো গলায় বললে—একটু একটু হয়।

সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাই ছোট ভাইকে বললে—ভীষণ পোকা।

তারপর দু ভাই নিজেরাই নিবিষ্ট আলোচনায় মেতে গেল। আমরা যেন নেই। দুজনে নিজেদের আলোচনায় মাতোয়ারা।

—জল! জল পাবে কোথায়! জল কে দেবে দাদা!

—আরে জল না হয় আকাশ দেবে, পোকা মারবে কে, এ কি উকুন পেয়েছিস!
—পোকা বেশি শত্রু, না জল বেশি শত্রু!
দুজনেই চুপ। প্রশ্নটা খুব কূট-কচালে। দুজনেই তখন আবার আমাদের দিকে আগের মত উদাস মুখে তাকিয়ে রইল।
চলে আসতে আসতে বিপুলবাবু বললেন—প্রশ্ন করে কিছু পাবেন না মশাই।
—এই যে বললেন হাটবেতে খুব ভাল ধান হয়, কলা হয়, ফসল হয়।
—হয়ই তো!
—এরা তো কেমন হয়ে গেছে। অন্য কথা বলছে।
—আপনি নিজে ঘুরেই দেখুন না! কী ধারণা হয়, পরে আলোচনা করা যাবে।
বাঁপাশে উঁচু একটা টিলার মত জায়গায় না-তাল, না-খেজুর গোছের অদ্ভুত এক ধরনের গাছে থোকা থোকা লাল ফল। আলুবখরার মত কিংবা বড় বড় লাল সুপুরির মত দেখতে। একেই বলে রেড অয়েল পাম। পাট কিংবা আখের মতই অর্থকরী ফসল। পাম অয়েল এখন আদরের জিনিস। ভোজ্য তেল। বনস্পতি তৈরিতে লাগে। হাটবেতে ক্রমশই রেড অয়েল পামের চাষ বাড়ছে। বাড়লেই ভাল। চাষবাস ছাড়া এখানে দ্বিতীয় কি তৃতীয় কোন জীবিকার কথা ভাবা যায় না। যাঁকেই প্রশ্ন করেছি সকলেরই এককথা—ধান আর তেমন ভাল হচ্ছে না। জমির উর্বরতা ক্রমান্বয়ে চাষবাসের ফলে মরে আসছে। সারের ব্যবহার নেই। সেচ, মানুষের হাতে নেই ঈশ্বরের হাতে।
এইখানেই দেখলুম বীভৎস চর্মরোগ। হাতে পায়ে দগদগে একজিমা। বিদঘুটে একটা চিন্তা মাথায় এল, চর্মরোগ কেউ ইচ্ছে করে শরীরে এনে বসায় না। যেভাবেই হোক এসেছে। একজিমা সহজে সারতেও চায় না। এইসব শক্ত সমর্থ মানুষদের বিবাহিত জীবনও নিশ্চয় শেষ হয়ে যায়নি। এঁদের স্ত্রীদের কী ভীষণ শাস্তি!
সমগ্র লিটল আন্দামান একদিনে ঘোরা সম্ভব নয়। তবে ম্যাপ খুলে সহজেই এক চক্কর ঘুরে আসা যায়। একেবারে উত্তরে, সমুদ্র ঢুকে এসে তৈরি করেছে বোমিলা ক্রীক। তার একটু তলায় সমুদ্র দিয়েছে ডুগং ক্রীক। ১৯৬১ সালেও এই বিশাল দ্বীপে বসবাস করত মাত্র ১৯২ জন ওঙ্গি। তারা এখন উঠে এসেছে এই ডুগং ক্রীকের কলোনীতে। উত্তর পশ্চিমে আর একটি খাড়ি—জ্যাকসন ক্রীক। পূর্ব দক্ষিণ থেকে পূর্ব উত্তরের সমগ্র এলাকায় গড়ে উঠেছে—বাঙালী আর শ্রীলঙ্কার কিছু অধিবাসীদের কলোনী।
তিনটি গ্রাম পড়ে আছে ট্রাঙ্ক রোডের পাশে পাশে। ৮ কিলোমিটারের মাথায়

নেতাজীনগর, ১৭ কিলোমিটারে রামকৃষ্ণপুর, ২২ কিলোমিটারে বিবেকানন্দপুর। ২০ কিলোমিটারের মাথায় চতুর্থ আর একটি গ্রামের পত্তন করা হয়েছে। ৩৮৬টি পরিবার এইসব গ্রামে স্থান পেয়েছে। শ্রীলঙ্কার ২৮ জনকে এখানে বসাবার জন্যে জমি উদ্ধার করা হয়েছে। ট্র্যাকটারের সাহায্যে জমি চৌরস করার ফলে কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। খুব সাবধানে সমস্ত পরিকল্পনাটি রূপায়িত হচ্ছে। এ যে দ্বীপ! যে কোনো রকম হটকারিতার মূল্য গুঁড়ো গুঁড়ো, টুকরো টুকরো হয়ে দ্বীপখণ্ডটি জলে ধুয়ে যাবে। ৭৭ সালের খরিফ মরসুমে ১৫১৫ একর জমিতে চাষ হয়েছে। ১০৪৪ একর গেছে উচ্চফলনশীল ধানের চাষে। ১১৯০ মেট্রিক টনের মত ধান ফলবে। একর প্রতি ফলন ১০৯০ কেজি। আখের চাষ সফল হয়েছে। আদা, হলুদ, ডাল, তেলবীজ সবই ফলছে, আরো বেশি ফলতে পারে। মশলার চাষও ভাল হবে। চেষ্টা চলছে।

দুপুরের আকাশ আজ কিছু মেঘলা। সারাটা ট্রাঙ্ক রোডের দুধারেই মাঝে মাঝে দৈত্য 'গর্জন', বহু উঁচু থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে যেন দেখছে—মানুষ কি করছে! গর্জনের মত বিশাল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে হয়, তবে কাঁধে তো হাত রাখতে পারবো না! পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে, মাথা উঁচু করে সুখ দুঃখের কথা ছুঁড়ে দেওয়া চলে; কিন্তু সন্দেহ হয়, হৃদয় আছে তো।

একটা ভাঙা আটচালায় বসে, বিপুলবাবুকে বললুম—ধরুন যদি এই লিখি—ম্যালেরিয়ায় লিটল আন্দামান উজাড় হয়ে গেল। ধান ছাড়া হয়ত অন্য সব কিছুই হয়। ভাল রাস্তা আছে, কিন্তু ভাল ব্যবস্থা আছে কি!

কোনো দুঃখ নেই।
—ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে?
—তা একটু হবে বইকি।
শিকড় নামতে শুরু করেছে। খুব কষ্ট হল বাঙালীর অবস্থা দেখে। শ্রীলঙ্কার যুবকটি কেমন সুখী! বাঙালীদের মুখে শুধুই অভিযোগ, শুধুই কাঁদুনি। কেমন যেন একটা ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি ছড়িয়ে গেছে মনে মনে। বাঙালীর বড় দুর্দিন। মনে মরেই গেছে। এইবার বোধ হয় দৈহিক অবলুপ্তির কাল সমাসন্ন।

জলযানে নিমন্ত্রণ। এম ভি ডিগলিপুরের ক্যাপটেন, হাটবের জেটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের ডিনারে ডেকেছেন। ডিগলিপুর, আধুনিক জাপানী জাহাজ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বারসমুদ্রে তার সামুদ্রিক অহঙ্কার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডিগলিপুর মানুষ বহন করার জন্যে জাপানী ডকে জন্মায়নি, জন্ম কাঠ বইবার জন্যে। ছোট জাহাজের-আমরা যাব বড় জাহাজে খানা খেতে! খুব উৎসাহ আমাদের। বেশ চানটান করে আতরটাতর মেখে ফুলবাবু হবার খুব ইচ্ছে। স্যুটকেস পড়ে আছে পোর্ট-ব্লেয়ারের ট্যুরিস্ট লজে। মাঞ্জাটা তাহলে হয় কী করে! যা-হোক-মা-হোক হল একটা।
যে সব কর্মকর্তা আমাদের নিয়ে এসেছেন তাঁরা আগেভাগেই ফুলবাবু সেজে সরে পড়লেন। তর সইল না। ভালই হল। ঠাণ্ডা লড়াইটা ইতিমধ্যে বেশ জমে উঠেছে। বাক্যালাপ বন্ধ। আমরা যারা একপালকের পাখি, নড়বড়ে, একটা অপদার্থ বোটে গাদাই হয়ে ডিগলিপুরের দিকে ভেসে চলেছি। যত শব্দ তত বেগ নেই। আমি ঠিক করেছি একদম ভয় পাব না। সমুদ্র যতই থকথকে অন্ধকার হোক, ঢেউ যতই ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করুক, চারপাশের আলো প্রেতের মত জ্বলছে জ্বলুক, দূরে ব্রেকারটা যতই ভয় দেখাক, হাওয়া যতই হাড়ের ওপর হাত বুলোক, মৃতের আবার মৃত্যুভয় কিসের! বোটে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ভক্তোয়ার সিং-এর হাতে নিজের ডেডবডি সমর্পণ করে দিয়েছি—মনে করুন আমি একটা শব, একে বহন করার দায়িত্ব আপনার। সিংজী বলেছেন—ঠিক হ্যায়, মরেন তো আমার হাতেই মরবেন। ডিগলিপুর কত উঁচু—দোতলা, তিনতলা, চারতলা! হিসেবের বুদ্ধি লোপাট। জাপানী সিঁড়ি বেয়ে উঠছি তো উঠছিই। সিঁড়ি, জাপানীই হোক আর জার্মানীরই হোক স্বভাব যাবে কোথায়! নড়েচড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে—ফেলে দিলেও দিতে পারি। আমার সেই 'স্পিরিচ্যুয়াল ডায়েরী', যেটা দিয়ে দুপুরে, দুই ইন্টেলেকচ্যুয়াল মহিলাকে

কাত করে দিয়েছিলুম, তারই তারিখের পাতায়, জাহাজী কাণ্ডকারখানার কথা এইভাবে লিখেছিলুম—আড়াই কোটি টাকার জাহাজের ঠাণ্ডাঘরে আমরা হ্যাংলার দল। সকলেই ছয় তারা মার্কা খানা কামরায় সাজিয়েগুছিয়ে বসে পড়েছেন। আমি এক শিল্পীকে আবিষ্কার করেছি, যিনি ক্যাপটেনকে রোজ একটি করে তেলরঙের ছবি উপহার দিয়ে থাকেন। একটি ছবি বসার ঘরের কর্নার টেবিলে। শিল্পী আমার পাড়াতেই থাকেন। এতটা উজিয়ে এসে পরিচয়। জাহাজের একজন মেকানিক। অবসর সময়ে পোর্টহোল দিয়ে প্রকৃতি দেখে ছবি আঁকেন। শিল্পীর সঙ্গে শিল্পকথা বলে, খানা কামরায় একটি আসন সংগ্রহ করলুম। আমাদের মধ্যেই কে একজন তাঁর চোয়ারটাকে নিজের মনের মত জায়গায় সরাবার জন্যে প্রচণ্ড কসরত করছেন। স্টুয়ার্ড এসে খুব বিনীতভাবে বললেন—ভদ্রমহোদয় ওটা তো সরবে না। মেঝেতে ফিকস্‌ড করা আছে!

এতদিন পরে কাঙাল দেখেছে শাকের খেত। শুরুটা কি দিয়ে হবে! হুইস্কি, রাম, ভদকা, জিন, ব্র্যাণ্ডি! ক্যাপটেন একবার দেখা দিয়েই চলে গেছেন তাঁর ঘরে। সেখানে আমাদের অগ্রবর্তীরা ইতিমধ্যেই জলপথে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। টেন ডিগ্রি ক্রস করে, নানকৌড়ি ছাড়িয়ে ম্যালেশিয়ার কাছে 'গিয়ার'হীন জাহাজের মত ভাসছেন। যাঁদের কলজের জোর বেশি তাঁরা হুইস্কির রাস্তায় এগোতে শুরু করেছেন। মেয়েদের জন্যে পাইনঅ্যাপল জুস এসেছে। আর আমার মত কয়েকজন নপুংসকের জন্যে—কি একটা নরম পানীয়। কুক বাঙালী, নাম—শ্রীনস্কর। তিনি তাঁর রান্নাঘর থেকে একের পর এক ছোটোখাটো কেরামতি পাঠাতে শুরু করেছেন—আনারসের টুকরোর ওপর কাঠি গাঁথা 'চিজ'। ছোট ছোট পাঁউরুটির টুকরোর ওপর একচিলতে সার্ডিন। পানীয় আর ফাউ-খাদ্য অনবরতই আসছে যাচ্ছে।

হঠাৎ লালাজী বললেন—হোয়্যার ইজ ক্যাপটেন! ক্যাপটেন কেন আমাদের কাছে নেই! দুই সাহসী অতিথি ক্যাপটেনকে টেনে নিয়ে এলেন ঘর থেকে। এত সুন্দর ক্যাপটেন হয়তো ছবিতে দেখেছি। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। ঘাড় অবধি কাঁচাপাকা চুল। নীল প্যাণ্ট। চারটে কলার লাগান দুধের মত সাদা শার্ট। পকেটের ওপর ক্যাপটেনের ব্যাজ। কাঁধের দুটো কলারে নোঙরের কাজ করা। চোস্ত ইংরিজী। সে যে রমণীমোহন। মুখে ঝিনুকের মত হাসি!

ক্যাপটেন ঘরে ঢুকেই বললেন—কি দুঃসাহস? আমার জাহাজেই আমাকে চ্যালেঞ্জ! মহিলারা, তোমাদের জন্যে আমার একটি মাত্র রাশিয়ান শ্যামপেনের বোতল খোলা হোক।

রাশিয়ান শ্যামপেনের বোতল খোলা শিখতে হলে রাশিয়ায় যেতে হবে। ক্যাপটেন হেরে গেলেন। ভীষণ স্বাস্থ্যবান চিফ ইঞ্জিনিয়ার পারলেন না। একে একে সব মহাবীর তাঁদের শক্তির পরীক্ষা দিলেন। ক্যাপটেন বললেন, শক্তিতে হবে না, প্রেম দিয়ে ওকে কব্জা করতে হবে। লেট মি ট্রাই এগেন।

ঘরের বাইরে গিয়ে কি একটা করলেন, প্রচণ্ড শব্দে বোতলস্থ পানীয় আকাশের দিকে হাত তিনেক লাফিয়ে উঠল। বিশেষ ধরনের গেলাসে চেপে শ্যামপেন এল মহিলাদের সামনে। না, না করে তাঁরা খেতে শুরু করলেন! বাকি বোতলটা একফাঁকে চোরাই রাস্তায় হুইস্কিখোরদের পেটে গিয়ে ঢুকলো।

শ্রীনস্কর বললেন, আপনি বাঙালী, আমার দেশের লোক, আপনাকে আমি দুটো আইসক্রীম খাইয়ে তবে ছাড়বো।

রাত বাড়ল। পেটে পেটে জল বাড়ল। কথার খই ফুটলো। মেয়েদের গাল লাল হল। হাসিতে হাসিতে হাসিতে হাসিতে সব দুঃখ বেবাক উড়ে গেল।

আমার শববাহক ভক্তোয়ার সিংকে আর বিশ্বাস করা চলে না। সকলেই প্রায় হামাগুড়ি দিচ্ছেন। এঁরা কি করে সোজা হয়ে টলমলে সিঁড়ি দিয়ে, সেই ততোধিক টলমলে বোটে গিয়ে নামবেন! নেপচুন সহায় হোন। রাত অনেক হল। জাহাজে বোধ হয় মধ্যরাত হয় না। ক্যাপটেন কফি না খাইয়ে ছাড়বেন না। ক্যাপটেনের খাস কামরাটি স্বপ্নপুরী। চতুর্দিকের দেয়ালে নগ্ন নারী মূর্তি। সারা ঘরে কত যে কায়দা! সেই শিল্পীর আঁকা খানকতক ল্যাণ্ডস্কেপ। ঘরের মধ্যে ঘর। বাথরুমের জাপানী কায়দা দেখে জল-বিয়োগ মাথায় উঠে গেল।

ডিগলিপুরের সেই ক্যাপটেনের সঙ্গে কোনদিন আর কোনো বন্দরে হয়তো দেখা হবে না! মবি ডিকের গ্রেগরী পেককে মনে পড়লে ক্যাপটেনকেও মনে পড়ে যাবে। মধ্যরাতের কিছু পরেই, কাঠ বোঝাই ডিগলিপুর মাদ্রাজের দিকে পাড়ি দেবে। আমরাও তখন ১০ ডিগ্রিতে ওলটপালট হতে হতে নিকোবারের দিকে এগোতে থাকব।

শুতে যাবার আগে বকর সাহেব বললেন, আজ রাতে বুঝবেন সমুদ্র কাকে বলে! সারা জাহাজে আমিই বোধ হয় একমাত্র বোঝার লোক, বাকি সকলের তো বোঝার ওপর শাকের আঁটি! জাহাজের ইঞ্জিন রোষে গর্জন করছে। জল কেটে কেটে তছনছ করছে! এই মধ্যরাত। সারা পৃথিবীর অর্ধেকটাই এখন সুপ্ত! কোথাও হয়তো ভোর হচ্ছে। ঠিক সেই সময় কিসের দুরভিসন্ধিতে জনা-পনের মানুষ নিয়ে ছোট্ট একটি জলযান, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কত গোপন কথা চুরমার করে দিয়ে ছুটছে। এ

রাত হাঙরের রাত, ঝিনুকের রাত, রঙীন মাছের রাত, স্বাতী নক্ষত্র থেকে মুক্তো ঝরার রাত।

বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে ভাবছি—কেউ কোথাও নেই, মাইলের পর মাইল অজানা সমুদ্র। কোনো চৌকিদার হেঁকে যাবে না, কোই হ্যায়। কোনো গাছে শব্দ করে বাতাস জাগবে না, জাগাবে না। কোনো পাখি ভুল করে হঠাৎ জেগে উঠবে না। ঘুম আসছে না। উপায় নেই যে জানলা খুলে দেখব—পরিষ্কার পথ ল্যাম্পপোস্টের আলোয় নিজেকে প্রসারিত করে রেখেছে। শেষ রাতের একলা পথিক আলোছায়া ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসছে। এম ভি ডিগলিপুরের ক্যাপটেনের মুখ রাতজাগা চোখে ভাসছে—ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্ররেখা আই টেল ইউ, ওয়ার্স্ট, ইট ইজ ওয়ার্স্ট, ইট ইজ এ হেল। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীঘোষ, সস্ত্রীক। শ্যামবাজারের ছেলে। আমাদের ক্যাপটেন, ওয়াণ্ডারফুল মানুষ, তবে মাথায় একটু ছিট আছে। শিল্পী শ্রীচট্টোপাধ্যায়, ফ্রান্সের রঙ দিয়ে, সুইডেনের কাগজে পোর্টহোল দিয়ে দেখা জগতের ছবি আঁকেন। সেই ছবি ঝোলে ক্যাপটেনের ঘরে নগ্নিকাদের পাশে। শ্রী পণ্ডিত, ছায়াকে লক্ষ্য করে, দু লাইন কবিতা লিখেছেন—ছায়া যখন খুব ঝিনুক কুড়োচ্ছেন তন্ময় হয়ে। আপনে যো সিপিঁয়া আজ উঠা লিয়া / উ সব রাখ দে / ফির কাল উ সব চুন কর / বঢ়িয়া সুন্দর সব রাখ দে / ঝুটা ফির সব ফেক দে। এই যে জীবন, জীবনের সব মুহূর্ত, বেলাভূমি থেকে ছড়িয়ে থাকা ঝিনুকের মত ছায়ার আগ্রহে আজ তুলে রাখি, অবসর মত সবচেয়ে সুন্দরগুলোকে সঞ্চয়ে রেখে বাকি সব উড়িয়ে দি!

বরজিন্দর ভীষণ ঘুমোচ্ছে চিৎ হয়ে। বুকের ওপর দুটো হাত ভাঁজ করা। এবার জাহাজের রোলিং ছ্যাবলা মেয়ের হাসির মত নয়, যেদিকে কাত হচ্ছে সেদিকে বেশ কিছুক্ষণ থেকে আবার ১৮০ ডিগ্রিতে অন্যদিকে পাশ ফিরছে। শুয়ে শুয়ে লক্ষ করছি—বরজিন্দর প্রথমবার বিছানা থেকে ছিটকে পড়ে, আঁরে তেঁড়দেনি বলে ধুলোটুলো ঝেড়ে তৎক্ষণাৎ বিছানায় গিয়ে উঠলেন। দ্বিতীয়বার যখন পড়লেন, তখন উঠেই বিছানাটাকে 'দো লাথ' মেরে পায়ের দিকে মাথা, মাথার দিকে পা করে শুলেন। তৃতীয়বার যখন পড়লেন তখন আর উঠলেন না, জিতা রহো বেটা বলে ফ্লোরেতেই পড়ে রইলেন। নেশার ঘোরে বিছানাটাকে কুস্তিগীর ভেবেছেন!

ঘুম যখন কিছুতেই আসবে না প্রতিজ্ঞা করেছে, তখন আমি আজ ওপরের ডেকে যাবো। তারও ওপরের ডেকে যাবো, ক্যাপটেনের ঘরে যাবো, মধ্যরাতের ভীষণ সমুদ্রের সঙ্গে আজ বোঝাপড়া হবে। বেশ লাগছে হাঁটতে। ফ্লোটিলার ওপর হাঁটছি। সিঁড়ির রেলিং জাপটেসাপটে, রিং মাস্টারের মত ঠেলে উঠেছি। খাবার ঘরে দুর্ধর্ষ

ঐকতান—সমবেত নাসিকাগর্জন! জাহাজের কিছু কর্মীর গভীর ঘুম। ক্যাম্প খাটে ভক্তোয়ার সিং। বাঁদিকের প্যাসেজ পেরোলেই লোয়ার ডেক। লোয়ার ডেক থেকে আপার ডেকের সিঁড়ি। ক্যাপটেনের ঘর। স্টিয়ারিং ধরে অন্ধকারে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। আড়াল থেকে কিছুক্ষণ দেখলুম! কে বলে মানুষ ক্ষুদ্র! এই তো কেমন বিশালের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে! এই মানুষটার জীবন দর্শনের সঙ্গে নিজের জীবন দর্শন যদি মেলাতে পারতুম! মধ্য রাতে এই মানুষটির ভাবনার সঙ্গে যদি আমার ভাবনা মেলাতে পারতুম! এই কি সেই 'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগ আণ্ডার দি সি'র সাবমেরিনের ক্যাপটেন! কাচের জানলায় ঘোর আকাশের পর্দা। সামনে সমুদ্রপথ। দূরে ঢেউয়ের মাথায় কে হঠাৎ গলানো পেতল ঢেলে দিল। কী ওটা! ক্যাপটেন এতই তন্ময় হয়েছিলেন, প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন। এ কি ঘুমোন নি! না ঘুমোইনি। এমন একটা বিশ্বজোড়া আয়োজনে কেউ কি ঘুমিয়ে কাটাতে পারে! নিদ নাহি আঁখিপাতে। তুমিও একাকী আমিও একাকী। দূরে, বহু দূরে কে যে ওই সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে!

দুটো কারণে হতে পারে। হয় মাছ-চোরদের ট্রলার, না হয় দূরপাল্লার কোনো জাহাজের সার্চলাইট! আড়াআড়ি পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে। ক্যাপটেন আপনার বাঁশিটা একবার বাজাবেন—ভোঁ ভোঁ করে। সেটা কি ঠিক হবে! অকারণে তুমি আমি বাজাতে পারি বাঁশি। জাহাজ বাজায় প্রয়োজনে।

ক্যাপটেনকে ছেড়ে, রেলিং ধরে ধরে, ঝুলে থাকা বোটের তলা দিয়ে, ডেকে পৌঁছলুম। দুদিকে দুটো লাইফ বোট, অন্ধকারে ফিসফিস করে বলছে—সঞ্জীব, জীবনটাকে কোলে করে, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে বস। অন্ধকারে তাকিয়ে দেখ মৃত্যুর কি বৃহৎ আয়োজন! স্থলের জীবন জলে বাঁচে না। যা হচ্ছে তা জোর করে। ওই দেখ আকাশে মেঘ লেপে দিয়েছি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ করাত দিয়ে আকাশ চিরে দেবে। শক্ত করে ধরে বস। জীবন এখন টেবিল টেনিসের বল। সাবধান! লাফাতে লাফাতে বাইরে চলে যেও না।

হঠাৎ সমস্ত দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন করে, স্তম্ভের মত কি একটা অন্ধকার বস্তু সোজা আকাশের দিকে উঠে সড়াক করে প্রায় আকাশের চাঁদোয়ায় গিয়ে ঠেকেছে। এ জিনিস আমি কখনও দেখিনি। মাথাটা যেন সহস্র শীর্ষ নাগের মত—হেলছে দুলছে। পাকিয়ে যাচ্ছে ডানদিকে, বাঁদিকে। একেবারে খোলা ডেকে, কলকাতা শহরের একটি ভীরু প্রাণী, সামনে অজানা বিভীষিকা। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। নাভির কাছটা বলছে—পালাও পালাও। শরীর হারিয়ে ফেলেছে পালাবার শক্তি। প্রায় হামাগুড়ি

দিয়ে ক্যাপটেনের কাছে পালিয়ে এলুম। প্রশ্ন করতে হল না, আমাকে দেখেই বললেন, বুঝেছি, ভয় পেয়েছেন। যা দেখলেন, ওকে বলে জলস্তম্ভ। ভয়ের কিছু নেই, ওটা যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে, তেড়ে আসবে না। হঠাৎ একসময় ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে।

সূর্য উঠলে, পৃথিবীকে পরিচিত বলেই মনে হয়। রাতের সমস্ত অভিজ্ঞতা যেন স্বপ্ন! জাহাজ থেমে পড়েছে। জলের রঙ ফিকে সবুজ। সামনে সারি সারি নারকেল গাছ! বিচালি রঙের তটভূমি খুব হাল্কা চালে জলে এসে নেমেছে। দুপাশে বাঁশের পা-লাগানো লম্বা লম্বা 'ক্যানো' ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা ভাসমান জেটিতে আর একটা ছোট জাহাজ লেগে আছে। বস্তা বস্তা সিমেণ্ট নামছে, বাতাসে সাদা সাদা গুঁড়ো ভাসছে। এই সেই নিকোবার। গাছের ছায়া গাঢ় হয়ে আছে জায়গায় জায়গায়। তীরের দিকে কিছু নিকোবারিজ প্রচুর জল ছিটিয়ে, চিৎকার করে, স্নান আর সাঁতার দুটোই সেরে নিচ্ছে। এ প্রভাত যেন জ্বর ছেড়ে যাবার প্রভাত! মিষ্টি ডাবের জলের মত বাতাস কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তটভূমিতে অবতরণের পদ্ধতিটা এখানে আরও সাংঘাতিক! প্রথমে বোটে করে ভাসমান জেটিতে, জেটি থেকে ডোঙ্গায়। ডোঙ্গা থেকে তীরে। ডোঙ্গা বস্তুটি বাইরে থেকে দেখতে ভারি শিল্পসম্মত। ভেতরটা কচ্ছপের খোলের মত খাঁজ কাটা। সরু সরু কাঠ দিয়ে খোপ খোপ করা। একটা খোপে কোনো রকমে একটা পা রাখা যায়। তীরে নামার সময় একটু অসাবধান হলেই পা থেকে নিউকাট জুতো খোলার মত অবস্থা হতে পারে। পাটিটা আধখোলা হয়ে পায়েই জড়িয়ে রইল। পদাতিক হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ল। ক্যানোটা অবশ্য জুতোর মত মাথা টপকে সামনে ছিটকে পড়বে না।

ভাবতেই অবাক লাগে, দিনেমাররা কেমন করে এমন একটা অসাধারণ সুন্দর জায়গাকে অস্বাস্থ্যকর বলে ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। 'ফেয়ারী বিচ'। চাঁদের আলোর রাতে চার্চের ঘড়িতে যেই দুটো বাজে, হুস হুস করে পরীরা উড়ে এসে স্নান করে এলো চুলে বসে থাকে আকাশের শেষ তারাটার জন্যে!

নিকোবারের ইতিহাস অতীতের অনেক দূর পথ হেঁটে এসেছে। দক্ষিণ ভারতের চোলরাজারা মালাককা যাবার পথে নিকোবারে একটু দম নিয়ে যেতেন। ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের তাঞ্জোর লিপিতে নিকোবারের উল্লেখ আছে—নককাভরম, উলঙ্গদের দেশ। মিশনারীদের কাছে এই দ্বীপের মানুষ সব কিছুর জন্যে ঋণী। সভ্যতার চারা এঁরাই

প্রথম বহন করে এনেছিলেন। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে এসেছিলেন জেসুইট মিশনারীরা। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন। বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না। ১৭৫৬ সালে এলেন দিনেমাররা। উদ্দেশ্য কলোনি স্থাপন। ধর্মপ্রচারের আপ্রাণ চেষ্টা চলল। এঁরাও সুবিধে করতে পারলেন না। ১৮৪৭ সালে সব ছেড়েছুড়ে সরে পড়লেন। কারণ হিসেবে দেখালেন—অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ১৮৬৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজরা দ্বীপের দখল নিলেন।

ইংরেজদের উদ্দেশ্য, ধর্মপ্রচার ছিল না। সেই এক উদ্দেশ্য, আর একটি অপরাধী শিবির স্থাপন করা। নানকৌড়িতে জেলখানা খোলা হল! অবশ্য সেই জেলখানা গুটিয়ে নিতে হল—১৮৮৮ সালে। আন্দামানের মত নিকোবারের জন্যে ঢালাও কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ইচ্ছে ইংরেজদের ছিল না। পোর্টব্লেয়ারে চিফ কমিশনার বসে থেকে একজন এজেন্ট মারফত নিকোবার শাসন করতেন।

নিকোবার সমষ্টিতে ৬২টি দ্বীপ। মাত্র ১২টি দ্বীপ অধ্যুষিত—কার, কাচাল, কম্মোর্তা, ট্রিঙ্কেট, নানকৌড়ি, পোল্লোমিল্লো, লিট্‌ল নিকোবার, কোণ্ডুল, গ্রেট নিকোবার। ১৮৯৫ সালে এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হলেন একজন ভারতীয় মিশনারী ভেদাপপন সলোমান। এনার চেষ্টাতেই খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব সমগ্র নিকোবারে ছড়িয়ে পড়ল।

সারি সারি গাড়ি ছুটছে আমাদের নিয়ে। সব শেষের জিপে আমার স্থান। রোনুক সাহেব নিজে চালাচ্ছেন। ক্ষমতায় বোধ হয় ক্যাট্‌ল ডেভালাপমেণ্ট অফিসার। বিদেশ ঘুরে এসেছেন। লেখাপড়া কলকাতার কলেজে। কোথায় যে এসেছি! বিদেশটিদেশ হবে বোধ হয়। মসৃণ পিচের রাস্তা, ঝকঝকে, তকতকে! ঝাড়া, মোছা, ছবির মত গ্রাম দুপাশে। গোল মরাইয়ের মত বাড়ি, মেপে মেপে সাজানো, মাঝখানে পরিষ্কার খোলা জায়গা। ঝাঁক ঝাঁক বেঁটে বেঁটে নারকেল গাছ। কলকাতা করপোরেশনের কোনো অফিসার যদি একবার এসে জেনে যেতেন কিভাবে একটা জনবসতিকে এমন পরিষ্কার তকতকে রাখা যায়! এ কি স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, ডেভনশায়ার, মাদ্রিদ, টোকিও, ইয়োকোহামা।

কার নিকোবারের জনসংখ্যা কিছু কম নয়। ১২৯ বর্গ কিলোমিটার সমতল জায়গায় লোকসংখ্যা '৭১ সালের গণনায়—১৩৫০৪। সরকারী মতে, জনসংখ্যা এখন এমন একটা পর্যায়ে এসেছে, কিছু মানুষকে হয়তো নতুন কোনো দ্বীপে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জমির ওপর চাপ পড়ছে। অর্থনীতি যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

পথে যেতে যেতে চারিদিকে প্রাচুর্যের ছাপ। বেশ বড়লোকের দেশ। বড় লোক বলি কেন! বরং বলি বড় মেয়েমানুষের দেশ। প্রমীলাদের দেশ। রংবেরং-এর ছাপা স্কার্ট, ব্লাউজ। গোল, নিটোল কবজিতে ঘড়ি। সাইকেলের পর সাইকেল। মহিলা আরোহী। কখন একলা, কখন দুজন। কাঁধের ওপর বাঁশ ফেলে, দুজনে মিলে বয়ে নিয়ে চলেছে পাতায় মোড়া শূকর কিংবা জলপাত্র অথবা খাবার ভর্তি ডেকচি। স্কুটার আছে, মোটর সাইকেল আছে। নারী স্বাধীনতার দেশ। পুরুষরা সব দৈত্যের মত হলেও, মেয়েদের পদানত। চেহারা দেখে মনে হয়, মিশেল জাতি। মঙ্গোলীয়ান! নাকি মালেশিয়ান! কিংবা শ্যাম দেশের অপভ্রংশ। সব মহিলাই বোধ হয় একটু গুমোরে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেই চান না। দাঁড়ালেও মুখে হাসি নেই। অথচ বিবাহিত জীবনে এঁরা ভীষণ সুখী। দাম্পত্য কলহ নেই। বিবাহবিচ্ছেদ নেই। বহু বিবাহের চল নেই। বিধবা বিবাহে কোনো আপত্তি নেই। বিয়ের আগে ছেলে আর মেয়েদের মেলামেশা প্রচলিত প্রথা। ইচ্ছে মত ছেলে আর মেয়ে নির্বাচনের অবাধ অধিকার। প্রেমঘটিত দাঙ্গাহাঙ্গামা নেই। সিটি মারা নেই। উড়ো চিঠি নেই। গলায় দড়ি নেই। জলে ডোবা নেই। আর এক বিলেত। তফাত, সেখানে শান্তি নেই, এখানে অগাধ শান্তি!

মাথায় ক্র্যাশ হেলমেট পরা একজন স্বাস্থ্যবান মোটরসাইক্লিস্ট কখনো আমাদের সামনে কখনো পেছনে, কখনো পাশে। ব্যাপারটা কী! আমাদের বডিগার্ড নাকি! বকর সাহেব একটু অন্যরকম সন্দেহ করলেন—বোধ হয় আমরা নজরবন্দী! কার নজরবন্দী! এটা কি ০০৭-এর দেশ! ঠিক তা নয়, তবে এখানে এক ধরনের, একটি গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বোধ হয় চলছে। কেউ যদি কোন বেফাঁস কথা বলে সত্য ফাঁস করে দেয়, খুব খারাপ হয়ে যাবে! সাংবাদিকদের বিশ্বাস কী! উভয় পক্ষকেই একটু নজরে রাখা ভাল! সংবাদদাতা, সংবাদগ্রহিতা দুপক্ষই কড়া নজরে!

প্রতিটি গ্রামের বাইরে একটি করে কাঠের বোর্ড—গ্রামের নাম, সেই গ্রামের ক্যাপটেনের নাম লেখা। ১৫টি গ্রাম নিয়ে কার নিকোবার—মুস, কিনমাই, স্মললাপাটি, বিগলাপাটি, তাপোইমিং, চুকচুকিয়া, কিন্যুকা, তামালু, পের্কা, মেলাককা, কাকানা, কিমুস, টিটপ, সওয়াই। ফিতের মত গোল রাস্তা দ্বীপটাকে টুপির মত বেড় দিয়ে আছে। মাত্র এক বছরের অধিকারের সময় জাপানীরা এই অবাক রাস্তাটি তৈরি করেছিল।

রোনুক সাহেব হঠাৎ গাড়ি থামালেন। নেমে আসুন—নিকোবারিজদের একটা বাড়ি দেখাই। যৌথ পরিবারের কথা আমরা ভাবতে পারি না, এঁরা যৌথ গ্রাম তৈরি করে

বসে আছেন। একতা শব্দটা এঁদের অভিধানেই মানায়। সৌহার্দ্য শব্দের মানে এঁরাই খুঁজে পেয়েছেন। পরিষ্কার চত্বরে গোল করে সাজানো বাড়ি, বাগিচা। মিলন মন্দির। খেলার মাঠ। যেখানে সেখানে বসার জন্যে বাঁশের মঞ্চ, এমনকি শোবার ব্যবস্থা। কোনো পাহারা নেই, প্রহরী নেই। কুকুররাও অতিথিবৎসল। ন্যাজ নাড়ে, ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে না।

প্রায় একতলা উঁচু কাঠের খুঁটির ওপর, উপুড় করা নারকেলের মালার মত, গোলার্ধ কাঠ ও বাঁশের বাড়ি। মই বেয়ে ওপরে উঠে যাও। বাড়ি তৈরির কায়দাটা এতই বৈজ্ঞানিক, সর্বসময় চারপাশের হাওয়া হুহু করে ঢুকছে। পাতলা শীতল নীল অন্ধকারে, মেঝেতে বিছানো মাদুর। বাঁশের আসবাবপত্র, খাট, আলনা। পরিষ্কার ঝলমলে পরিধেয় পাট করে সাজানো। একেই বোধহয় বলে—হোম, হোম, সুইট হোম। গৃহে কোনও গৃহিণী পেলুম না কিন্তু সর্বত্র তাঁর হাতের স্পর্শ।

গ্রামীণ জীবনের সর্বত্র যে বড় হাতের স্পর্শ, সেই হাতের অধিকারী—বিশপ রিচার্ডসন। নিকোবার মানেই বিশপ রিচার্ডসন, বিশপ মানেই নিকোবার। খ্রীষ্টধর্মের সুসভ্যকরণ-প্রভাবে ফেলে, এই সব সুঠাম, কর্মঠ স্ত্রী-পুরুষকে জীবনের বিশেষ একটা স্তরে তুলে, দ্বীপান্তরে এক সভ্যতার জন্ম দিয়েছেন বিশপ রিচার্ডসন।

আমাদের ভ্রমণসূচীতে বিশপের সঙ্গে সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা ছিল। দুর্ভাগ্য আমাদের, বিশপ কাছালে গেছেন। কবে ফিরবেন বলা যাচ্ছে না। বিশপ না থাকুন। চার্চের সামনে দাঁড়িয়েছি আমরা! বিশাল ক্রুশ ঠেলে উঠেছে আকাশের নীলে। ব্রোঞ্জ রঙের ছাদ। সামনে উঁচু বেদীতে বিশপের ব্রোঞ্জমূর্তি। মৃত্যুর আগেই মূর্তি। চিরনিদ্রার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। মূর্তির তলাতেই সমাধি। আবলুস কাঠের ঝকঝকে কফিনে, দুধের মত সাদা সাটিনের শয্যা।

নিকোবারিজদের জীবনে জন্মের চেয়ে মৃত্যু বেশি মহান। আসার পথ নরকের পথ, যাবার পথ আলোকিত পথ। জন্মের প্রক্রিয়াটা মানুষের আকাঙ্ক্ষায়, ভোগলালসায় নোংরা। কিন্তু মৃত্যু! সমুখে শান্তি পারাবার—সূর্য ডুবছে অস্তপারাবারে, একটি তারা পশ্চিম আকাশে জলজ্বলে, বন্দরে ঢেউ স্তব্ধ, শান্ত, নিঃশব্দে, ছায়াগভীর অন্ধকারের দিকে চলেছে দিনশেষের শেষ খেয়া।

নিকোবারিজদের আচার, বিচার, রীতিনীতি, জীবনের তিনটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে—জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু। সমস্ত উৎসবই এই তিনকে ঘিরে। জন্ম, অপরিস্রুত প্রক্রিয়া। আবাদির বাইরে গিয়ে মা হয়ে ফিরতে হবে। প্রতিটি গ্রামেই সুশিক্ষিতা ধাত্রী আছেন। জন্মের সময় কোনও উৎসব হয় না। খ্রীষ্টান পরিবারে উৎসব হবে জাতকের

'ব্যাপটাইজমেন্টের' দিনে। চৌরাতে অখ্রীষ্টান পরিবারের সংখ্যা বেশী, সেখানে, দু'তিন বছর বয়সে শিশু যখন হাঁটতে শেখে তখন ঘটা করে নামকরণ অনুষ্ঠান হয়। ডাইনী ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়। মুরগির রক্তের সঙ্গে গাছের পাতা চটকে তৈরি হয় প্রলেপ। গ্রামে যিনি সৎ চরিত্রের জন্যে সুখ্যাত তিনি এসে শিশুর সর্বাঙ্গে ওই প্রলেপটি মাখিয়ে দেন। স্থানীয় বিশ্বাস, এর ফলে শিশুটি সৎপথে চলতে শিখবে। বিবাহে তো কোনো ঝঞ্ঝাটই নেই। যৌন স্বাধীনতার দেশ। খোলাখুলি মেলামেশা। যার যাকে মনে ধরে। চার্চে চলে যাও! বিয়ে করে এস। তবে মনে রেখো, তোমার জীবনের সব কিছু মৃত্যুর পদতলে। হঠাৎ বলবে, ওঠো এব্রাহিম, জীবন-নাটকের এই অঙ্ক শেষ। চল যাই পরবর্তী পরিচ্ছেদে।

মিশরের মানুষদের মত নিকোবারিজরাও মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাসী। মৃত্যুর পর, মৃতের সঙ্গে কবরে, কাপড়, অলঙ্কার প্রভৃতি দেওয়া হয়। খাদ্য দেওয়া হয়। আত্মারও খাদ্যের প্রয়োজন হতে পারে। সাতদিন পরে প্রথম সমাধি থেকে মৃতদেহ উত্তোলন করে আবার সমাহিত করা হয় দ্বিতীয় সমাধিতে। এই অনুষ্ঠানের পর সমুদ্রস্নানের প্রথা প্রচলিত আছে। সমুদ্রের ধারে পাশাপাশি—মৃত্যু ঘর ও গ্রামের সাধারণ সমাধি। একদিকে সমুদ্রের অনাহত ধ্রুপদ আর একদিকে সমাহিত জীবন, সারি সারি সাদা সাদা ক্রশ।

আসল মানুষটিকে দেখার সৌভাগ্য হল না। মূর্তির দিকেই তাকিয়ে থাকি। বেঁটেখাটো, শক্ত চেহারার বিশপ রিচার্ডসন। হাতে দণ্ড। মাথায় হোলি ক্রাউন। বিশপ নিজে নিকোবারিজ। জন্ম সাল ঠিক জানা যায়নি। দেখা যাচ্ছে—১৯০৬ সালে রিচার্ডসন ম্যাণ্ডালয়ের মিশনারী স্কুলে পড়ছেন। ছ' বছর পরে দেশে ফিরছেন শিক্ষক হয়ে। রিচার্ডসনের পরবর্তী আত্মপ্রকাশ, বিশপ হিসেবে। চরিত্রে, শিক্ষাসংস্কারে, বিস্তারে, দৃঢ়তায়, আদর্শের অনুসরণে, বিশপ রিচার্ডসন, নিকোবারের বিদ্যাসাগর। রেভারেণ্ড জর্জ হোয়াইটহেডের সাহায্যে লিখলেন—নিকোবারিজ প্রাইমার (প্রথম ভাগ)। লিখলেন দি বুক অব কমান প্রেয়ার। তারপরই স্থানীয় নিকোবারিজ ভাষায় অনুবাদ করলেন নিউ টেসটামেণ্ট। বিশপের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল, জাপানী অধিকারের সময়। অনমনীয় দৃঢ়তার জন্যে শ্রদ্ধার আসন পাকা হয়ে গেল। পোর্টব্লেয়ারের মতই নিকোবারও নিমেষে জাপানীদের দখলে চলে গেল। একটা গুলিও খরচ করতে হল না। কারনিকোবারে তখন খ্রীষ্টানের সংখ্যা ৫০০। জাপানীদের সবচেয়ে বেশী রাগ খ্রীষ্টানদের ওপর। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ১০৪ জনকে হত্যা করা হল। বিশপের পরিবারের সকলকেই প্রায় হত্যা করল। বিশপকে দু দুবার প্রাণদণ্ড

দেওয়া হল। প্রথমবার বেঁচে গেলেন—নিকোবারের সমস্ত অধিবাসী একযোগে জাপানীদের হুঁশিয়ার করে দিল—বিশপের প্রাণদণ্ড মানেই সারা দ্বীপ বিদ্রোহে ভেঙে পড়বে। মৃত্যু ভয়ে কেউ ভীত নয়। দ্বিতীয়বার বেঁচে গেলেন—হঠাৎ যুদ্ধ থেমে গেল। জাপানীরা পরাজিতের গ্লানি নিয়ে পালাতে শুরু করল। জাপানী আমলে বিশপের ভূমিকা ছিল—'ব্রিজ অন দি রিভার কোয়াইয়ের' ডেভিড নিভেনের মত। অত্যাচার, লাঞ্ছনা, মৃত্যু ভয়, সব কিছু উপেক্ষা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। বিশপের ব্যক্তিত্বে, চারিত্রিক গুণে সকলেই মুগ্ধ। জাপানীরা চলে যাবার পর, খ্রীষ্টধর্মের বন্যা বয়ে গেল। সমস্ত গ্রামের মানুষ বিশপকে পিতা বলে মেনে নিয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে গেল। শুধু ধর্ম নয়, শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি সব কিছুর মূলেই এই বিশপ।

এই স্বপ্নময় পরী-দ্বীপে চার্চটাও যেন স্বপ্নের। সিমেণ্ট, কংক্রিটের ছড়াছড়ি নেই। কাঠেরই বেশি ব্যবহার! সবুজ লন পেরিয়ে চার্চের প্রবেশমুখে ঢুকতে গেলেই চোখে পড়বে, প্রস্তর ফলক :

সেণ্ট টমাসই এই দ্বীপের খ্রীষ্টানদের তৈরি প্রথম চার্চ। ১৯৩৩ সালে তৈরি। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে জাপানী অধিকারের সময় এই চার্চ আংশিকভাবে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। ৪৫ সালে সংস্কার সাধন করা হয়। বর্তমান চার্চ ১৯৫৪ সালে নির্মিত। পরিসরে বড় হয়েছে এবং এই দ্বীপে আগত প্রথম দুই ভারতীয় মিশনারী—মিঃ ভি সোলোমন এবং মিসেস আরবু সোলোমনের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। ১৮৯৬ সালের ১৫ মার্চ ভি সোলোমন এই দ্বীপে এসেছিলেন। কয়েক বছর পরেই এসে যোগ দিলেন মিসেস্ আরবু সোলোমন শিক্ষয়িত্রী হিসেবে। ১৯০৯ সালে রেঙ্গুনে মিঃ সোলোমন দেহ রাখলেন। শ্রীমতী সোলোমন আমৃত্যু দ্বীপশিখাটি জ্বালিয়ে রাখলেন। ১৯২১ সালে পোর্টব্লেয়ারে তাঁর মৃত্যু হল। 'হোয়াট থিংস ওরের গেন টু মি। দিজ হ্যাভ আই কাউণ্টেড লস ফর ক্রাইস্ট।' মে দেয়ার সোলস রেস্ট ইন পিস।

অতীত কিছুক্ষণ ধরে রেখেই বাঁদিকে ঠেলে দেবে চার্চের ভেতর। প্রশস্ত হল ঘর। সামনেই বিশাল বেদী। কাঠের ওপর খোদাই করা যীশু। ঢোকার মুখ থেকেই মেঝেটা ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে গেছে। জলাধারে পবিত্র জল। জল ছিটোবার জন্যে একটি সুদৃশ্য তাম্রখণ্ড।

বিশপ রিচার্ডসন অনূদিত একটি নিকোবারিজ বাইবেল সংগ্রহের ইচ্ছে ছিল। এদিকে ওদিকে সকলকেই ইচ্ছেটা জানিয়ে রেখেছিলুম। যথাসময়ে রেকসিন বাঁধাই মোটা একটি 'নিউ টেস্টামেণ্ট' হাতে এসে গেল। ডেপুটি কমিশনার শ্রীসনৎ কল বাইবেলটা

হাত থেকে নিয়ে প্রথম পাতায় লিখে দিলেন—প্রেজেণ্টেড অন বিহাফ অব দি পিপল অব নিকোবার। নিকোবারিজ প্রাইমার এক কপি সংগ্রহ হল আমার জন্যে। যদি কোনদিন নিকোবারিজ ভাষা শিখতে পারি, তাহলে টেস্টামেণ্টটা গড়গড় করে পড়ব। ভাষাটি কোন্ গোষ্ঠীর! মনখমের! জানি না, ভাষাবিদ্‌রা বলতে পারবেন।
সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি পত্রিকা—'প্রয়াস' উপহার পেয়েছিলুম। এখন যত পাতা ওল্টাচ্ছি, অবাক হয়ে যাচ্ছি। একাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা অবাক করে দেবার মত কবিতা লিখেছে! জে কার্টিস লিখেছে—'মাই স্কুল'। একটি ছাত্রের সারাদিন—অল চিলড্রেন টু স্কুল অ্যাট এইট। সকাল আটটায় বইয়ের ভারি বোঝা নিয়ে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে। শর্টহ্যাণ্ডও পাঠ্যতালিকার ভেতরে পড়ে। প্রথমেই প্রার্থনা। তারপর হাজিরা। তারপরই ছেলেটি লিখছে—ডিয়ার ব্রাদার, ডোণ্ট ফরগেট টু উইশ ইওর স্যার অর মাদাম, আইদার সে 'গুড মর্নিং স্যার' অর 'গুড মর্নিং মাদাম'।
বিরতির সময় ছেলেরা কাছের যে কানো হোটেলে খেতে যায়।
মনে পড়ছে, রোন্নুক সাহেব মাঝে মাঝেই গাড়ি থামিয়ে দেখাচ্ছিলেন—কমিউনিটি ক্যান্টিন। বিদেশী সরাইখানার মত। কাঠের লম্বা ঘর। পরিচ্ছন্ন খাবার ব্যবস্থা। সস্তা দাম। খেয়ে এসেই আবার স্কুল! তিনটের সময় ছুটি। ছুটির পর বাড়ি। বাড়ি থেকে সোজা খেলার মাঠে। ছেলেটি লিখছে—দি সিসটেম অব এডুকেশন ইজ চেঞ্জড / দি ওলড প্যাটার্ন ইনটু দি নিউ / দি এলডার্স ওয়্যার লাকি অ্যাণ্ড ফ্রি / বিকজ-দে ওয়্যার নট ইন দি টেন প্লাস টু প্লাস থ্রী। এর পর সে লিখছে—স্টুডেণ্টস মে কাম স্টুডেণ্টস মে গো / বাট দি স্কুল উইল রিমেন ফর এভার।
গ্যাব্রিয়েল স্টিফেন লিখছে—দিস ন্যাটিভ ল্যাণ্ড অব মাইন। তার কিশোর দৃষ্টিতে এই মনোরম দ্বীপটিকে দেখা যাক: ও! সি ইজ এ ফ্রেশ এণ্ড ফেয়ার ল্যাণ্ড / দি কোকোনাটস আর স্ট্যাণ্ডিং অন হার ল্যাপস / অ্যাণ্ড দি সি সারাউণ্ডিং হার / অ্যাণ্ড অলওয়েজ সিং দ্যাট ইট ইজ ফেয়ার অ্যাণ্ড রেয়ার। হার নেটিভস আর ব্রেভ অ্যাণ্ড ক্লেভার / হার ওমেনস হার্টস নেভার ওয়েভার / আই উড ফ্রিলি ডাই টু সেভ হার / অ্যাণ্ড থিঙ্ক মাই লট ডিভাইন। সি ইজ নট এ ডাল অ্যাণ্ড কোল্ড ল্যাণ্ড / নো! সি ইজ এ ওয়ার্ম অ্যাণ্ড বোল্ড ল্যাণ্ড / ও সি ইজ এ ট্রু অ্যাণ্ড ওল্ড ল্যাণ্ড / দিস নেটিভ ল্যাণ্ড অব মাইন। একচুলও বাড়িয়ে লেখেনি। এই নিকোবারের বর্ণনার জন্যে কোনো বিশেষণই যথেষ্ট নয়।
সময়ও আমাদের সমানে তাড়া করছে। কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। একটি বেলা আমাদের সম্বল। তারপরই আমাদের ফিরে যেতে হবে। খবর পাওয়া

গেল, আজ একটা কি উৎসব আছে। সমুদ্রে 'ক্যানো রেস' হচ্ছে। চলো চলো! কলের গাড়িতে কতক্ষণ আর যেতে লাগবে। বাঁদিকের যে কোনও একটা লম্বা ধরে কিছুক্ষণ এগোলেই সমুদ্র।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমুদ্র-সৈকত নিকোবারেই। হালকা হলুদ রঙের মিহি দানা বালি। যেন রসে ফেলার আগে ভাজা মিহিদানা। পাশ থেকে থাকে থাকে বেরিয়ে এসেছে নানা রঙের কোরাল। সৃষ্টির নিজস্ব স্টুডিওর সর্বময় শিল্পনির্দেশকের নিজের হাতের কাজ। সামনে, দক্ষিণে, বামে যেদিকেই তাকাও অপার সমুদ্র, বেলাভূমির দৌড়। সবুজ স্বচ্ছ জল, ফুটস্‌ফুটস্‌ করে ফেনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। হাওয়ায় ভাসছে ফেনার ছেঁড়া ছেঁড়া অংশ। বালি নয় তো যেন কাঁচের দানা! ঝলমল করছে সূর্য। এত আলো, চোখ ছোটো হয়ে আসে। এত হাওয়া মনে হয় বাকি জীবনের জন্যে সবটাই ফুসফুসে হ্যাংলার মত ভরে রাখি। এক একবার ঢেউ ভাঙছে, পায়ের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে বহুবর্ণের জ্যান্ত ঝিনুক, মরা ঝিনুকের খোল। সাদা নিটোল কড়ি। মাছ ধরার জাল, হাওয়ায় গোল ফানুসের মত উড়ছে বাঁশের মাথা থেকে। কলকাতায় প্রকৃতির দুর্ভিক্ষে যাঁরা ভুগছেন তাঁদের পক্ষে একবারে এতটা বড়ই গুরুপাক!

বাঁদিকে সমুদ্রের তীরে কাঠের একটা বড় দোতলা বাড়ি। নিচে একটা লম্বা হল ঘর, ওপরে লম্বা হল ঘর। নিকোবারিজদের ধর্মশালা। দোতলায় ওঠার জন্যে বাইরে থেকে লোহার মই লাগানো। ধর্মশালা ভীমদেহী পুরুষ আর কিন্নরীতে পরিপূর্ণ। মেয়েদের মাথার পাশে ফুলের বাহার, গলায় ফুলের মালা। কেমন সাজিয়েছে! ভালবেসে ফেলতে ইচ্ছে করে। এখানে রোজই উৎসব! কেন হবে না! অভাবে উৎসব হয় না। উৎসব প্রাচুর্যের প্রেমিকা।

ধর্মশালার রকে পা ঝুলিয়ে বসে, একের পর এক ডাবের জল আর শাঁস খেতে খেতে প্রাতরাশ হয়ে গেল। সামুদ্রিক পীড়ার জন্যে সকালে এক কাপ চা ছাড়া পেটে আর কিছু ঢোকেনি। বাহারী স্কার্ট আর লুঙ্গি চারপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মসৃণ বাহু, সুগঠিত শরীর, গুরু নিতম্ব!

আসছে আসছে। হই হই করে আমরা জলের দিকে দৌড়োলুম। ডানদিক থেকে আসছে একটা ক্যানো। সরু, ছিপছিপে, লিকলিকে। দুদিকে দু সার দাঁড়ী। মাঝে উড়ছে পতাকা, ফুলের মালা। সামনে মুখের দিকে রানীর মত বসে আছে এক তরুণী। ফুলের অলঙ্কার সারা দেহে। বিজয়ী দল আসছে। কী ভীষণ গতিবেগ! সাঁ করে একেবারে তীরে বালির ওপর নৌকোর সামনের দিকটা উঠে পড়ল। প্রতিযোগীরা হই হই করে নেমে পড়লেন। রানীকে ঘিরে ধেই ধেই নৃত্য। ঢেউয়ের

ধাক্কায় একজন আছাড় খেলেন। দুদিকে দুটো মোটা বাঁশ চালিয়ে সেই ভীমাকৃতি পুরুষের দল নৌকোটাকে অনায়াসে কাঁধে তুলে নিয়ে ডাঙ্গায় গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্যে রেখে দিলেন। কী শক্তি!

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বালির ওপর—'কিনরেপা'। কী সুন্দর শব্দ—'কিনরেপা'! মানে কুস্তি। জলের সঙ্গে এতক্ষণ কুস্তি লড়েছ! এতেই তোমাদের শক্তির পরীক্ষা শেষ হয়নি। এইবার দৈত্যে দৈত্যে লড়াই। নিমেষে এক এক রাউণ্ড শেষ। প্রচণ্ড গতি। ধরেই প্যাঁচ মেরে ফেলে দাও। ক্রস লীর দৈত্য সংস্করণ। প্রবীণ লড়ছেন নবীনের সঙ্গে। হারছেন তবু কাঁদছেন না। একটু সময় লাগছে পতনের পর উঠে দাঁড়াতে। নবীন বিজয়ী সাহায্য করছেন প্রবীণ পরাজিতকে উঠে দাঁড়াতে, দাঁড়িয়েই আলিঙ্গন—সাবাস বেটা! দুই যুবকে বেধেছে জোর লড়াই। কেউ কাউকে ফেলতে পারছেন না। হঠাৎ প্রচণ্ড প্যাঁচে একজন ছিটকে পড়লেন। পড়েই, শরীরটা বাঁ পাশে মুচড়ে স্থির হয়ে গেল। এ কি মৃত্যু নাকি! সকলে ঝুঁকে পড়লেন স্থির দেহটার ওপর। কোনো চিৎকার নেই, ছোটাছুটি নেই। অসম্ভব সংযত সকলে। দুজন অভিজ্ঞ মানুষ সেই সংজ্ঞাহীন শরীরটার ওপর বিভিন্ন রকমের দৈহিক টোটকা প্রয়োগ করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে চোখ খুলে গেল। শরীরটা নড়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল। সব ঠিক আছে। মুখটা ঈষৎ লাল। একটু ক্লান্ত। দুজনের কাঁধে দু হাত রেখে, ধীরে ধীরে ছায়ার দিকে হেঁটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আবার 'কিনরেপা'। জোড়ায় জোড়ায় প্রতিযোগীরা আসছে। সামান্য একটু জাপটাজাপটি, প্যাঁচ মারামারি পতন।

লোহার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলুম। বিশাল লম্বা ঘর। সবশেষে আর একটি ছোট ঘর। বোধ হয় স্টোর রুম। মেয়েরা ভাগে ভাগে খাবার সাজাচ্ছেন। কলাপাতায় মোড়া চাকাচাকা, দাগাদাগা, সাদা সাদা শূকরের মাংস, আধমালা নারকেল, সুন্দর করে কলার পেটোয় গুছোনো। মাঝখানে একটা করে কাঠি গোঁজা। কাঠির মাথায় ফুলের বাহার। পানীয়, কলসি কলসি তাড়ি। খাদ্যের পরিমাণ ও রকম দেখে বুঝলুম—স্বাস্থ্যের উৎসটা কোথায়! উৎস—মুক্ত জীবনে, খাদ্যে, জীবন-যাত্রার সারল্যে। বরজিন্দর মাটিতে পা মুড়ে বসে, দু হাত পেতে, ঢকঢক করে একপেট তাড়ি খেয়ে নিল। দৃশ্যটা ওমর খৈয়ামের মলাটের মত, ভর পেয়ালা সাকী, সাকী! কেমন করে বিশ্বাস করি—১৮৫৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ইংলিশম্যানে নিকোবার সম্পর্কে স্টিমার টেনেসেরিম-এর ক্যাপটেন ডাইসির রিপোর্ট! তিনি লিখেছেন, বহু ইংরেজ জাহাজের নাবিক নিকোবারে ঠেক খেয়ে, অধিবাসীদের হাতে

নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। একজন ইংরেজ রমণীকে শিশুসন্তান সহ হত্যা করা হয়েছে! ইতিহাস কত কি বলে! বর্তমানের সঙ্গে অনেক কিছুই মেলে না। এই যে, একেবারে শেষ গ্রামটিতে, ট্যুরিস্ট লজের দিকে যেতে যেতে আমরা মহিলা সমিতি, সরকারী কুটির শিল্পকেন্দ্র, সমবায় বিপণীতে যে সব নিকোবারিজ যুবক-যুবতীদের কাজ করতে দেখলাম, তারা শিক্ষিত, নম্র, সভ্য ভদ্র, অসম্ভব কর্মঠ। ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের কাউণ্টারে যে মেয়েটি ছাপা ভয়েলের শাড়ি, সিন্‌থেটিক শাড়ি বিক্রি করছে তাকে যখন বললুম—সুন্দর, সুন্দর প্রিণ্টের মাঝখানে তোমাকে আরো সুন্দর আরও স্মার্ট দেখাচ্ছে কিন্তু তুমি কি রাঁধতে জানো। মেয়েটি মুখ নিচু করে এমনভাবে হাসল, যে কোনো বাঙালী মহিলাও ঠিক এইভাবেই হাসত। মুখ তুলে মৃদু স্বরে বলল—আমার মা বলেন, তুমি কথায় যত পারদর্শী রান্নায় ততটা নও। তোমার রান্না আমাদের কান্না। হই হই করে দুজনে হেসে উঠলুম। এব্রাহিম আলি হুসেন, এই দ্বীপের একজন নিকোবারিজ কর্তাব্যক্তি, ওপাশের কাউণ্টার থেকে এপাশের কাউণ্টারে এসে অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন—হোয়াট ইজ দি জোক! শ্রীপণ্ডিত স্ত্রীর জন্যে একটা শাড়ি কিনলেন। কলকাতা থেকে যে সব জিনিস আসে, অর্থাৎ আন্দামানের বাইরে থেকে যা চালান আসে, বিক্রির সময় সেই সব জিনিসের ওপর ২৫ শতাংশ বাড়তি মূল্য ধরা হয়। শ্রীপণ্ডিত যে শাড়ি ১০০ টাকায় কিনলেন, কলকাতায় তার দাম ৭৫ টাকা। পোর্টব্লেয়ার থেকে যে সব জিনিস আসে এখানে তার দাম ৯·৩৮ শতাংশ বেশি।

এখানে সব কিছু চলে সমবায় প্রথায়। জমি গ্রামের। গ্রাম ক্যাপটেনের। ১৫টি গ্রামে, ১৫ জন ক্যাপটেন, তার ওপর ভাইস-ক্যাপটেন সবার ওপর চিফ ক্যাপটেন। গ্রামের জমি, ক্যাপটেন পরিবারের আয়তন অনুসারে চাষের জন্যে বিলি করে দেন। সমস্ত নিকোবারিজই সমবায়ের সভ্য। ১৫টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির মাথার ওপর একটি কেন্দ্রীয় সমিতি।

সেই কেন্দ্রীয় সমিতির ক্যালেণ্ডার, গুদাম ঘরের দেয়ালে হাওয়ায় উড়ছে—বড় বড় করে লেখা—এলেন হিনেনগো লিমিটেড, চুকচুচা, কারনিকোবার। চোরের মন সেই বোঁচকার দিকে। লালাজী কানে কানে বললেন—আকুজির গন্ধ পাঁউ। পাঁউ তো পাঁউ! এখন এক কাপ চা পেয়েছি তাই খাঁউ। এমন একটা অদ্ভুত দ্বীপে, এমন সব অসাধারণ মানব-মানবীদের সঙ্গে মিশতে মিশতে কেবল গ্যাঁড়াকলের কথা আর ভাবতে ইচ্ছে করে না। লেখা মানেই কি শকুনের দৃষ্টিতে ভাগাড় দেখা! আমি এখন নাইটিংগেল—নীল আকাশে চাঁদপানা মুখ ছাড়া আর কিছু দেখবো না। হাটাও

আকুজি, সরকারী স্ট্যাটিসটিকস ! দাও, দাও, দাও, আমায় দেখতে দাও। দুজন নিকোবারিজ মহিলা, নারকেলপাতা চাপা দিয়ে ভারে করে জল বয়ে নিয়ে চলেছে। আমি বোঝাতে পারব না, মাত্র তিনটি উপাদান, একসঙ্গে মিলে মিশে নিমেষে মনের মধ্যে কি করে দিলে ! রোদে চারপাশ ঝলসে যাচ্ছে, সেই ঝলসানো রোদে আকণ্ঠ তৃষ্ণা, দুজন কমনীয় রমণীর কাঁধে সবুজ নারকেলপাতা চাপা জল, ছিলিক, ছিলিক করে ছিটকে পড়ছে, কখন তৃষ্ণার্ত রাস্তায়, কখন স্কার্টের পেছনে।

এই সবই থেকে গেল যেখানে যেমন ছিল। মুস, চুকচুচা—ছবির মত সমস্ত গ্রামের শেষে, সমুদ্রের কিনারায় সেই রেস্ট হাউস। যে রেস্ট হাউসের বসার ঘরের জানলায় সমুদ্র আর ঢেউয়ের পর্দা। যার শোবার ঘরের জানলায় সমুদ্র। যার পেছনের বারান্দায় সবুজ, সবুজ, অনন্ত বিস্তৃত সবুজের উদ্বেল উচ্ছ্বাস। যার পাশের কাঠের গেট খুললেই কোরালের ধাপ, ভিজে বেলাভূমি, প্রেতের বিচ্ছিন্ন আঙুলের মত কোরালের টুকরো, কোনোটা মৃত্যুর চেয়েও শুভ্র, কোনোটা রূপসীর ওষ্ঠের মত লাল, কোনোটা জীবনের চেয়েও দগ্ধ। রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে প্রবাল তৈরি করেছে বহু বর্ণের তটভূমি। সমুদ্র সেই ঠোঁটে চুমু খেতে খেতে দক্ষিণে চলেছে, চলেছে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর নানকৌড়ির দুটি প্রবেশ পথ পেরিয়ে, গ্রেট নিকোবারের খবর নিয়ে, পিগম্যালিয়ান পয়েন্টে দাঁড়িয়ে, ভারতের শেষ ভূখণ্ডকে বিদায় জানিয়ে, চলে গেছে নতুন স্থলভাগে, নতুন সভ্যতা সংস্কৃতির বীজ বুনতে।